অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

ভোম্বলদা সমগ্র

(প্রথম)

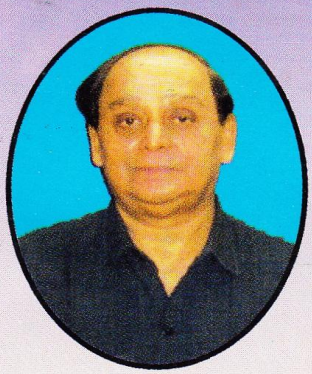

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী একজন সুপ্রতিষ্ঠিত নেতাজি - গবেষক। নেতাজি অনুরাগী অলোককৃষ্ণ স্বদেশী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠেছেন। নেতাজি বিষয়ে বহু তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করে তিনি নেতাজি - গবেষক হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। অলোককৃষ্ণ শুধু নেতাজি - গবেষকই নন, একজন প্রতিষ্ঠিত প্রতিভাবান লেখকও। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। অলোককৃষ্ণের বহু লেখা পাঠ্যপুস্তকে গৃহীত হয়েছে। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থই 'বেস্ট সেলার' - এর মর্যাদা লাভ করেছে। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ধর্মের বুজরুকির বিরুদ্ধে অলোককৃষ্ণ রচনা করেছেন কয়েকখানি চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ। আগুনঝরা ভাষায় তিনি ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন সেই সব গ্রন্থে।

শিশু - কিশোর সাহিত্যেও অলোককৃষ্ণ খুবই জনপ্রিয়। তাঁর ভোম্বলদা চরিত্র যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভোম্বলদাকে নিয়ে তিনি বহু গল্প লিখেছেন এবং এখনও লিখে চলেছেন। ভোম্বলদা এক অদ্ভুত চরিত্রের যুবক। সেই অদ্ভুত যুবকের চরিত্র অঙ্কনে লেখকের মুন্সিয়ানা অনবদ্য। ভোম্বলদা সমগ্র (প্রথম) শিশু - কিশোর সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন।

ভোম্বলদা সমগ্র

(প্রথম)

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

এস. আর. পাবলিকেশন
৭বি, একডালিয়া প্লেস
কলকাতা—৭০০ ০১৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জন্মাষ্টমী, ১৪১১

প্রকাশক ঃ শিপ্রা চক্রবর্তী

মুদ্রন ঃ
জগদ্ধাত্রী প্রেস
১৪৬/১, বাগমারি রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৬৭

Bhombalda Samagra

© দেবায়নী ও ঋত্বিকা

লেজার সেটিং ঃ
জে. প্রিন্টার্স
১৬/১৭, কলেজ স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০১২

পরিবেশনায়

দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০৭৩

নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০৭৩

আদি নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০৭৩

বুক ফ্রেন্ড
৮/১ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০৭৩

বুক সাপ্লাই এজেন্সি
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০৭৩

পঁয়ষট্টি টাকা

Rupees Sixty Five Only

উৎসর্গ

আমার নাতি-নাতনি
সায়ন, অভিষেক, দেবায়নী,
পূজা ও ঋত্বিকাকে

bengaliboi.com

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তীর গ্রন্থ

সুভাষ সমগ্র (জীবন ও রহস্য)
ভোম্বলদা সমগ্র (প্রথম)
শৌলমারির সাধু কি নেতাজি? (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
চরম মুহূর্তে নেতাজি
সুভাষ ও এমিলি (বিবাহ-রহস্য)
শ্রুতিনাট্যে নেতাজিজীবন-রহস্য
শতরূপে সুভাষ
রেনকোজির ভস্ম-রহস্য
ধর্মের নামে
ধর্মের ভয়ে (গল্প)
কলির কেষ্ট (গল্প)
প্রধানমন্ত্রী-রহস্য
ভোম্বলদার কাণ্ডকারখানা (কিশোর গল্প)
ভোম্বলদার কারসাজি (কিশোর গল্প)
ভোম্বলদার কেরামতি (কিশোর গল্প)
গোয়েন্দা ভোম্বলদা (কিশোর গোয়েন্দা গল্প)
ভূতের রাজা দিল সাজা (ভূতের গল্প)
প্রেম শেখো প্রেম করো (প্রেমের গল্প)

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত গ্রন্থ

পঞ্চপাণ্ডব	সমাজ সংস্কারক রামমোহন	সহস্রাব্দের সেরা গোয়েন্দা গল্প
মণিমাণিক	শতাব্দীর সেরা কিশোর গল্প	ছুটির আনন্দে
ছুটির আকাশ	শতাব্দীর সেরা কল্পবিজ্ঞানের গল্প	মণিকাঞ্চন
ছুটির রোদ্দুর	বিশ্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা রহস্য	ভয়ঙ্কর সব ভূতের গল্প
চাঁদের হাট	ভয়ঙ্কর সব ভয়ের গল্প	বিশ্বসেরা ভূতের গল্প
তাজা প্রেমের গল্প	সহস্রাব্দের সেরা হাসির গল্প	সহস্রাব্দের সেরা গল্প
অদ্ভুত যত ভূত	সহস্রাব্দের সেরা ভূতের গল্প	হাঁড়ি ভর্তি ভূত

উপহার

bengaliboi.com

ভোম্বলদা ও তাঁর সঙ্গীসাথী

আমার কথা

গল্প-কবিতা লিখলেও নেতাজি-গবেষক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে আমার প্রথম আবির্ভাব। নেতাজির রহস্যময় অন্তর্ধান নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই রহস্য-উন্মোচনে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে আমিও একজন। নেতাজি জীবন-কাহিনি পড়তে পড়তে অবাক হয়েছি। মহাসমুদ্রের মতো বিশাল এই জীবন-কাহিনি বিস্ময়ে হতবাক করেছে আমাকে। তাই নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য ছাড়াও নেতাজির জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়েও আমি অনেক লিখেছি। কিশোর-কিশোরীদের সেই সব লেখা দারুণ আকর্ষণ করেছে। তাদের কাছ থেকে অনেক চিঠি পেয়েছি। অনেকে আবার ফোনও করেছে আমাকে। তারাই আমাকে ছোটোদের জন্যে লিখতে অনুরোধ করে। সত্যিই তো আজকের ছোটোরাই ভবিষ্যতে দেশের কর্ণধার হবে। তাই আমি শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা শুরু করি। অচিরেই টের পেলাম 'ভোম্বলদা' তাদের ভালো লেগেছে। 'ভোম্বলদা' এখন খুবই জনপ্রিয়।

'ভোম্বলদার কাণ্ডকারখানা', 'ভোম্বলদার কারসাজি', 'ভোম্বলদার কেরামতি' এবং আরও কিছু নতুন গল্প নিয়ে 'ভোম্বলদা সমগ্র (প্রথম)' প্রকাশিত হল।

পরিশেষে বলি এখন হাসির গল্প প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। অদ্ভুত চরিত্রের ভোম্বলদার গল্পে অনাবিল হাসি আছে প্রচুর। আর আছে তার সঙ্গীসাথীদের নানা কার্যকলাপ। তোমরা ছোটোরাও ভোম্বলদা ও তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে মেতে ওঠো।

বিনীত

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

মঙ্গলম
৭বি, একডালিয়া প্লেস
কলকাতা-৭০০ ০১৯

সূচিপত্র

গল্প	পৃষ্ঠা
ভোম্বলদার ভেড়ি দর্শন	৯
ভোম্বলদা ও নিধন রায়	৩৪
সাঁঝের রস	৪৩
ভোম্বলদার ভূত দর্শন	৫২
গোয়েন্দা ভোম্বলদা	৬০
ভেড়িতে শিকার	৭৩
ময়নার বাঘ	৮৬
রূপকথা হলেও সত্যি	৯৪
ভণ্ডুলদার কীর্তি	১০৬
মাছ-চুরির রহস্য	১১৩
শঠে শাঠ্যং	১২৪
রূপকথার মতো	১৪৫
ভরতপুরে গোয়েন্দাগিরি	১৫২
ভোম্বলদার পুরস্কার	১৬৪
রাক্ষস আছে	১৭৫
ছোটোমামার কাণ্ড	১৯০
হ্যাটট্রিক	২০০
কঞ্চিবাবু	২১৩
চাকভাঙা মধু ও ভোম্বলদা	২৩৩
সাহেব হওয়ার শখ	২৪০
ওয়ান-ওয়ে টেলিফোন	২৫৪
ছোটকার কেরামতি	২৫৯
ত্রিকালদর্শী কাকাতুয়া	২৭০
ভক্তিই শক্তি	২৭৯
ভেড়িতে ভয়ানক কাণ্ড	২৮৩
গুলতির অদ্ভুত গুলি	৩১১

ভোম্বলদার ভেড়ি দর্শন

—কী রে হুলো! একটা ভারী থাবা এসে পড়ল আমার ডান কাঁধের উপর। আচমকা আধমনি থাবার ভারে আমি প্রায় চিৎপটাং হওয়ার উপক্রম।

গলার আওয়াজ শুনে বুঝলাম লোকটি কে হতে পারে। তাই পিছন ফিরে বললাম— এভাবে পথের মধ্যে এটা কি ঠিক হল? যদি মুখ থুবড়ে পড়তাম!

—আহা, ফুলের ঘায়ে মুর্চ্ছা যায়!

—এটা কি তোমার ফুলের ঘায়ের নমুনা?

—নয় তো কী? এই রকম খ্যাংড়াকাঠির মাথায় আলুর দম মার্কা চেহারা হলে এই অবস্থাই হয়।

হতে পারে আমার চেহারা রোগা। দেহের তুলনায় মাথাটাও একটু বড়ো। তাই বলে বাসস্ট্যান্ডে এত লোকের সামনে কেউ কাউকে এভাবে বলে! আড়চোখে তখন অনেকেই তাকাচ্ছে আমার দিকে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে আমার মুখ। তাই কিছুটা ঝাঁঝালো সুরেই বললাম—সবার তো আর তোমার মতন ষণ্ডামার্কা চেহারা হয় না।

—কেন হয় না? চেষ্টা করলেই হয়। চেহারা হল মানুষের আসল সম্পদ। কী বুঝলি?

অযথা আর কথা বাড়ালাম না। কেননা, এই মূর্তিমানের এক গাঁট্টায় মুখের মিষ্টিও যে খাট্টা হয়ে যায় তা তো আমার অজানা নয়। তাই বললাম—যা বোঝবার ঠিকই বুঝেছি। এখন কী বলছ, বলো?

—তোর ভেড়িতে আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল না?

—ছিল।

—তবে আমার চোখে ধুলো দিয়ে কেটে পড়ছিলে কেন চাঁদু?

—বা রে, কেটে পড়লাম কোথায়?

—দিব্যি ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিস। ভেড়ি যাওয়ার জন্যে বাসস্ট্যান্ডে এসেও দাঁড়িয়েছিস। তারপরও বলছিস কেটে পড়লাম কোথায়! ভাগ্যিস, তোর বাড়িতে গেছিলাম। তা না হলে তো জানতেই পারতাম না।

—আরে বাবা, ভেড়ি যাওয়া কি পালিয়ে যাচ্ছে?

—পালিয়ে যাক আর না যাক, আমি আজই যাব।

—এই কোটালে তোমার অসুবিধে হবে, ভোম্বলদা।

—কেন?

—এটা একে অমাবস্যার কোটাল, তার উপর আকাশের ভাবগতিকও ভালো না। অন্ধকারে তোমার খুবই অসুবিধে হবে। তা ছাড়া বৃষ্টি হলে এঁটেল মাটিতে এক পা-ও চলতে পারবে না।

—রাখ তোর অন্ধকার আর এঁটেল মাটি। ওসব আমাকে দেখাসনি হুলো। হাজারিবাগ আর জলদাপাড়া জঙ্গলের ওই অন্ধকারে একা-একা ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। আর এঁটেল মাটি! সেবার বর্ষাকালে বৃষ্টির মধ্যে তিন-চার মাইল এঁটেল মাটির উপর দিয়ে হেঁটে বাঁওড়ে মাছ ধরতে গেছিলাম। সেকী সাঙ্ঘাতিক বাঁওড়! ইংরেজরা পর্যন্ত তার তল খুঁজে পায়নি। আর সেই বাঁওড়েই আমরা দু-তিনজন মাছ ধরার পর সাঁতার কেটেছি। এর নাম অসীমপুরের বাঁওড়—দেখা যায় না যার একূল—ওকূল।

মনে মনে বললাম এই শুরু হল গুল। মুখে সারল্যের ভাব ফুটিয়ে বললাম— আমার আর কী! তোমার অসুবিধে না হলেই হল।

—আমার অসুবিধে! মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব এনে ভোম্বলদা বলল, সাহসীদের কখনও কোনো ব্যাপারে অসুবিধে হয় না। যত অসুবিধে হয় ভীতুদের। কী বুঝলি?

যা বোঝবার মনে-মনে ঠিকই বুঝেছি। মুখে প্রকাশ না-করাটাই

বুদ্ধিমানের কাজ। ফলেন পরিচিয়তে। তাই বললাম—তোমার অসুবিধে না হলেই ভালো।

—তাহলে শুভস্য শীঘ্রম্। বাসে ওঠা যাক। আর দেরি করে লাভ নেই।

—সেকী! তুমি বাড়িতে বলে আসবে না?

—তুই কি আমাকে অত কাঁচা ভেবেছিস? মাসিমার মুখে তোর ভেড়ি যাওয়ার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে বাড়িতে বলে এসেছি। তোর সাথে যাচ্ছি শুনে মা কোনো আপত্তি করেননি। ব্যস, তারপর এক দৌড়ে সোজা বাসস্টপেজে।

—তো চলো।

গোলপার্ক থেকে ভোম্বলদাকে নিয়ে বাসে চাপলাম।

গামা পালোয়ানের মতো চেহারা ভোম্বলদার। দেহে দৈত্যের শক্তি। কুস্তি চ্যাম্পিয়ন। তার উপর ক্যারাটে আর বক্সিং-এ রীতিমতো পারদর্শী। সেই সঙ্গে আবার স্ট্রিট ফাইটার হিসেবেও খ্যাতি কম নয়। এ হেন ভোম্বলদা যখন আমাদের সঙ্গে থাকে তখন আমাদের বুকের পাটা বেড়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করি। তাই ভোম্বলদার অনেক অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করি। হজম করি অনেক গুলপট্টিও।

বাসে উঠে ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—মাছ ঠিকমতো ধরা পড়বে তো রে হুলো?

—তা কী করে বলব? তোমাকে তো বহু বার বলেছি, শুধু বাগদা কেন যে কোনো জাতের চিংড়ির ধরা পড়াটা নির্ভর করে গোনের উপর। অর্থাৎ জোয়ার-ভাটার জোরের উপর। চাপা গোন হলে বড়ো একটা ধরা পড়ে না। মানে জোয়ারের জোর কম হলে কম ধরা পড়ে।

—সেকী রে! মাছ না পেলে যাওয়াটাই তো একেবারে বেকার হয়ে

যাবে।

—আরে বাবা, কম হোক আর বেশি হোক, কিছু-না-কিছু তো ধরা পড়বেই। তবে পুবে হলে বলা মুশকিল। তা ছাড়া পুবে আর চাপা গোন একসাথে হলে একেবারে সর্বনাশ।

—চাপা গোন মানে তো বুঝলাম জোয়ারের জোর কম। কিন্তু পুবে আবার কী?

—পুবে মানে পুব দিকের বাতাস। পুব দিক থেকে জোর হাওয়া হলে মাছ বড়ো একটা ধরা পড়ে না। তাই পুবে আর চাপা গোন একসাথে হলে মাছ যে কী পরিমাণ ধরা পড়বে সে তো বুঝতেই পারছ।

—বলিস কীরে!

—ঘাবড়াচ্ছ কেন? যৎসামান্য ধরা পড়লেও তুমি পাবে।

—যৎসামান্য মানে কী? কেজি পাঁচেক বাগদা আর আট-দশ কেজি পোনা মাছ পাব তো?

—একবারে অত মাছ কী করে দেব ভোম্বলদা? লোকাল পার্টনার এই নিয়ে কথা তুলবে।

—রাখ তোর লোকাল পার্টনার। দশ লাখ টাকার ভেড়িতে দশ হাজার টাকা দিয়ে আবার পার্টনার! ওসব ফালতু পার্টনার নিস কেন?

—লোকাল পার্টনার না নিলে কলকাতা থেকে ওই অঞ্চলে গিয়ে কাউকে আর ভেড়ি করতে হবে না।

—কেন?

—চুরি-ডাকাতির ঠেলায় ভেড়ি করা তো দূরের কথা, প্রাণ নিয়ে পালানোর পথ পাবে না।

—এই ব্যাপার?

—তবে আর বলছি কেন? সাধে কি আর কেউ ওরকম পার্টনার নেয়!

—বুঝেছি। চল একবার তোর ভেড়িতে। ওই হাজারি পার্টনারের লাখের হাঁক ছাড়া বের করছি।

—দোহাই তোমার ভোম্বলদা, দয়া করে ওই কম্মটি কোরো না। এখানে যা খুশি বলো। ওখানে গিয়ে কিন্তু এ-ব্যাপারে স্পীকটি নট। তাহলে কিন্তু আমার ব্যবসার একেবারে দফারফা।

—ঠিক আছে। তোর ব্যবসার কোনো ক্ষতি করতে চাই না। তবে মাছ কিন্তু আমার চাই। আঃ, বাগদার মালাইকারি... সত্যি কী জিনিস! উস্-উস্ করে জিভে জল টানল ভোম্বলদা। সাধে কি আর বিদেশিরা এত টাকা ব্যয় করে বাগদার পিছনে!

হঠাৎ বাস কন্ডাক্টরের চিৎকার—শ্যামবাজার...শ্যামবাজার।

বাস এসে পৌঁছল শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে। সেখান থেকে একটু এগিয়ে তিরানব্বই নম্বর বাসে চেপে সোজা খড়িবাড়ি পৌঁছলাম।

বাগদার বাজার হিসেবে খড়িবাড়ি বিখ্যাত। এখানে অনেক ভেড়ির মাছ আসে। আসে আমার ভেড়ির মাছও। তাই আড়তে কিছু কাজের কথা সেরেই পা বাড়ালাম ভেড়ির দিকে।

খড়িবাড়ির পুব দিকে আমার ভেড়ি। ওখান থেকে হাঁটাপথ ছাড়া ভেড়িতে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাই হেঁটে চলেছি আমি আর ভোম্বলদা।

তখনও দিনের আলো ফুরিয়ে যায়নি। সূর্য লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে। তাই আবছা অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে গোটা অঞ্চলটা। মেঘের ছায়ায় ভেড়ির জল হয়ে উঠেছে মিসকালো। বাতাসের ধাক্কায় সেই জল লাফাতে লাফাতে এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ের গায়ে।

ভেড়ির পাড়। বড়জোর পাঁচ-ছ ফুট চওড়া হবে। পাড়ের দুদিকেই ভেড়ি। সেই পাড়ের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি আর ভোম্বলদা।

একে সরু পাড়, তার উপর আবার পাগলা হাওয়ার মাতামাতি। তাই টাল খেতে খেতে গজগতিতে চলেছে ভোম্বলদা।

—ধ্যাত্তোর, এই ভাবে হাঁটা যায় নাকি! এতক্ষণে নিজের অক্ষমতার কিছুটা স্বীকারোক্তি। কিন্তু দমবার পাত্র ভোম্বলদা নয়। তাই বলল, এটা কি একটা হাঁটার রাস্তা! রাস্তার মতন রাস্তা হলে হাঁটা কাকে বলে দেখিয়ে দিতুম।

মনে মনে হাসলাম এবং মনে মনেই বললাম—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। মুখেন মারিতং জগৎ। পাকা পথ হলে যেন হাঁটা প্রতিযোগিতায় অলিম্পিক থেকে সোনা জয় করে ফিরতে। মুখে অবশ্য বললাম, ভেড়ির রাস্তা তো পিচের হয় না। এই রকমই হয়।

—চুপ কর বলছি। দাঁত খিঁচিয়ে উঠল ভোম্বলদা, এটা কি একটা রাস্তা? এবড়ো-খেবড়ো মাটির সরু পাড়। তা ছাড়া...

কথাটা শেষ হতে-না-হতেই ভোম্বলদা একটা রাম টাল খেয়ে জলে পড়ার উপক্রম।

—সাবধান। জলে পড়লে আর রক্ষে নেই। মজা করার জন্যে বললাম।

—কেন? ভোম্বলদার গলার আওয়াজে ভয়ের আভাস। আমার কোতূহল আরও বেড়ে গেল। তাই বললাম—দুপাশেই অথৈ জল। তোমার বাঁওড়-টাওড় এর কাছে শিশু।

—বলিস কী রে! তাহলে কী হবে? ভোম্বলদার গলায় তখন সাবু-খাওয়া আওয়াজ।

—হবে আবার কী! দেখেশুনে চলো।

—তোর ভেড়ি আর কত দূর, হুলো?

—মাইলখানেক তো বটেই।

—এখনও এক মাইল! হতাশার সুর বেজে উঠল ভোম্বলদার কণ্ঠে।

—একটু পা চালিয়ে চলো। এক মাইল পথ যেতে আর কতক্ষণ!

পা ঠিকই চালিয়েছিল ভোম্বলদা। তবে সেই পা চালানোর গুণে কুড়ি মিনিটের জায়গায় দুঘণ্টা কুড়ি মিনিট লেগেছিল ভেড়িতে পৌঁছতে।

ভেড়িতে পৌঁছে গোইয়ের পাড়ে মাচায় বসলাম আমি আর ভোম্বলদা। গোই হচ্ছে নদী থেকে ভেড়ি পর্যন্ত একটা ছোটো খাল। এই খাল দিয়েই জোয়ার-ভাটার জল ওঠানামা করে। আর এখানেই মাছ ধরা পড়ে।

অন্ধকারে বসে আছি আমি আর ভোম্বলদা। সাঁই সাঁই শব্দে বাতাস ছুটছে। গোই দিয়ে ভেড়িতে তর তর করে জোয়ারের জল ঢুকছে। ভেড়ির কালো জলে ছলছল আওয়াজে তড়পা (ঢেউ) চলেছে। ছলাৎ ছলাৎ করে পাড়ে সেই ঢেউ ভাঙ্গছে। গোইয়ের পাশে আলাঘরের এক কোণে একটা হ্যারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে। আলাঘর মানে থাকার ঘর। এই ঘরের পাশেই বাগদা চিংড়ি ধরার ব্যবস্থা হয়।

—কেমন লাগছে, ভোম্বলদা? বেশ একটা ছন্দোময় পরিবেশ না?

—খিদেয় আমার জান কয়লা। আর তুই দেখছিস ছন্দ! তোর লোকজন গেল কোথায়? ডাক তাদের। চা করুক।

সত্যিই তো লোকজন সব গেল কোথায়! মাচা থেকে হাঁক পাড়লাম—গজু।

আলাঘরের পেছনে পুকুর ধার থেকে সাড়া এল—যাই বাবু। সঙ্গে সঙ্গে গজুর আবির্ভাব।

গজু আমার ভেড়ির জিমনি। জিমনি মানে মৎস-বিশারদ। এই মৎস বিশারদের উপরই ভেড়ির লাভ-লোকসান নির্ভর করে। জল তোলা-নামানো, মাছ ধরা-ছাড়ার ব্যাপারে এই বিশেষজ্ঞই সবকিছু। এমনকী ভেড়ির কোথায় কেমন পাহারার দরকার তা-ও ঠিক করে দেয় এই জিমনি। এক কথায় ভেড়ির সব দায়িত্বই জিমনির উপর।

জিমনি গজু এসে সামনে দাঁড়াল। মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—বাবু এয়েছেন?

—এসে তো গেছি। সঙ্গে কাকে এনেছি, দেখেছ?

গজু ভোম্বলদার দিকে টর্চের আলো ফেলে বলল—ইনি সেই পালোয়ানবাবু, না?

—ঠিক ধরেছ। পালোয়ানবাবুর জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করো।

সঙ্গে সঙ্গে গজুর হাঁক—টাটু, আরে ও টাটু...

দেখতে দেখতে ওই অন্ধকারে টাটু ঘোড়ার মতোই ছুটতে ছুটতে টাটু এসে হাজির হল।

টাটু বছর বারো বয়েসের ছেলে। রান্নার লোকের হেল্পার। তা ছাড়া ভেড়ির সবারই ফাইফরমাশ খাটে। পাহারাও দেয় মাঝেমধ্যে। এখন ভেড়ির পাড়ে পাহারাই দিচ্ছিল।

গজু টাটুকে উনুনে আঁচ ধরিয়ে চা করতে বলে নিজে ঘরের কোণ থেকে হ্যারিকেনটা দরজার পাশে এনে রাখল। হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো আমাদের সামনের জায়গাটুকুর ঘুটঘুটে অন্ধকারকে কিছুটা ফিকে করে দিল।

হ্যারিকেন রেখে গজু আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর দিকে তাকিয়ে ভোম্বলদা বলল—মাছ ধরায় তোমার নাকি খুব হাতযশ?

গজু একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে আরও একটু এগিয়ে গেল ভোম্বলদার কাছে। ভোম্বলদা আবার বলল—দেখব আজ তোমার কেরামতি।

— তেষ্টার (চেষ্টার) ত্রুটি করবনি, বাবু। আধো-আধো ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল গজু।

ইতিমধ্যে টাটু চা-জলখাবার নিয়ে হাজির। ভোম্বলদা সেদিকে মন দিল।

গজু একটু থেমে ভোম্বলদার দিকে তাকিয়ে আবার বলল—

জানেন পালোয়ানবাবু, বাবুর মুখে তো সব সময়ই আপনার কথা। কী ক্ষ্যামতা আপনার! আমি আপনাকে দেখেই তা বুঝতে পেরেছি। আপনার মতন এমন সুন্দর চেহারা কটা মানুষের আছে? আজ পর্যন্ত আমার চোখে তো একজনও পড়েনি।

গজুর কথায় ভোম্বলদার বেশ একটু হাসি-হাসি খুশি-খুশি ভাব।

সত্যি গজুর কাছে ভোম্বলদার কথা আমি অনেক বলেছি। ভেড়িতে ওর সঙ্গেই থাকতে হয় আমাকে বেশিরভাগ সময়। কেননা, আলাঘরের সামনেই গোই। গোইয়ে পাতা বিত্তির মাছ গজুই ঝেড়ে রাখে এবং পাহারাও দেয় সারা রাত। আর আমি মাচায় বসে ঘুম না-আসা পর্যন্ত ওর সাথেই গল্প করি। ভোম্বলদাকে নিয়েই আমার গল্প হয় বেশি। কারণ, গজুর গল্পের সঙ্গে ভোম্বলদার গল্পের ভীষণ মিল। তফাত শুধু ভোম্বলদা নিজের কথাই বলে বেশি। আর গজুর গল্পে থাকে অন্য লোকের প্রাধান্য। এ ছাড়া দুজনের প্রায় সব গল্পেরই মূল হচ্ছে গুল। তাই গজুর গল্প শুনতে শুনতে ভোম্বলদার কথাই মনে পড়াটা স্বাভাবিক।

এদিকে তখন আকাশের গায়ে রাশি রাশি জলভরা মেঘ আর ঘন ঘন আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ-চমক। গোটা আকাশে যেন সাপ ছুটছে কিলবিলিয়ে। অন্ধকার রাত যত এগোচ্ছে একটা থমথমে ভাবও তত বাড়ছে।

হঠাৎ ভোম্বলদা বলে উঠল—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এটা তো দেখছি একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গা। কেমন যেন একটা ভূতুড়ে-ভূতুড়ে ভাব।

—কথাটা মিথ্যে বলেননি, পালোয়ানবাবু। গজুর মন্তব্য।

—তবে আমি ওসব পরোয়া করি না। ভূত-টুত সব বাজে কথা। ভূত বলে কিছু নেই। ভোম্বলদা বেশ মেজাজে কথাগুলো বলল।

—তা হতে পারে। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ তো আর অত শত

বুঝি না। তবে ব্যাপারটা হল—ইয়ে, মানে ওই জায়গাটায় কিছু গোলমাল আছে।

—কোন জায়গাটায়?

—ওই যে পুকুরের পাশে নাবাল (গভীর জলের জায়গা) দেখছেন—ওইখানটায়।

—কেন, কী আছে ওখানে?

—লোকে বলে ওখানে নাকি অপদেবতা আছে। মাঝেমধ্যেই সে জল তোলপাড় করে। সেকী আওয়াজ! এই কদিন ধরে প্রায়ই আমি শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কাছে গেলে কিছুই দেখতে পাই না।

—তুমি একা-একাই ওখানে যাও?

—হ্যাঁ, বাবু।

—ভয় করে না?

—আমি আবার ওসবের মন্তর-টন্তর একটু-আধটু জানি। তা ছাড়া ভয় মনে করলেই ভয়।

—যা বলেছ! একখানা কথার মতন কথা। ভয় আবার কী! ভয় মনে করলেই ভয়। এই আমাকে দেখছ... এই আমি দুনিয়ায় ভয়-ডর কাকে বলে জানি না। আর ভূত-টুত...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই বিরাট একটা আওয়াজ এল সেই নাবালের দিক থেকে।

—বাবা গো... বলে সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলদা দুহাতে প্রাণপণে জাপটে ধরল আমাকে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। গজুও বেশ চমকে উঠল। টাটু ভোম্বলদার চিৎকারে ঘর থেকে ছুটে এসে এই দৃশ্য দেখে হেসে গড়াগড়ি।

আমি ভোম্বলদাকে বললাম—কী করছ? ছেড়ে দাও। দম বন্ধ হয়ে যাবে যে।

কে কার কথা শোনে! উল্টে ভোম্বলদা আমাকে আরও জোরে

জাপটে ধরে বলল—হুলো রে, তোর মনে কি এই ছিলো রে! আমি আর মাচায়-টাচায় থাকব না। আমাকে ঘরে নিয়ে চল।

রাতে সেই যে ভোম্বলদা ঘরে ঢুকল, শুধু খেয়ে মুখ ধোয়ার সময়টুকু ছাড়া, সারা রাত আর একবারের জন্যেও ঘর থেকে বেরোয়নি। এমনকী বিত্তি থেকে বাগদা চিংড়ি ঝাড়ার সময়ও না।

তবে ওই রাতেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। চারা ছাড়া শোলমাছ নিজের বাচ্চাদের কাছে অন্য মাছের আগমনে নাবালের সেই একই জায়গা থেকে জল তোলপাড় করে ভীষণ জোরে আবার লাফিয়ে উঠল। ঘরের মধ্যে হঠাৎ ধপাস করে খাট থেকে পড়ার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গেই গোঙানির আওয়াজ। হ্যারিকেনের পলতে বাড়িয়ে দেখি ভোম্বলদা মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে।

পরের দিন। বেলা তখন সাতটা-সাড়ে সাতটা। সারা রাত জেগে ভেড়ি পাহারার লোকেরা যে যার টং-এ ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে জিমনিও রান্নাঘরে। মাছ নিয়ে বাজারে গেছে ভেড়ির ম্যানেজার আর পাচক। ভোম্বলদা আর টাটু গল্প করছে। সকালের মিষ্টি হাওয়ায় ভেড়ির পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। তখনও জোয়ার চলছে। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটা বড় ঘোগ। ঘোগ মানে গর্ত। এই গর্তই ভেড়ির বড়ো শত্রু। ঘোগ দিয়েই ভেড়ি থেকে মাছ বেরিয়ে যায়। তাই আলাঘরে এসে টাটুকে ঘোগ মারতে পাঠালাম। টাটু হিসেল (ঘোগ মারার যন্ত্র) নিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি ভোম্বলদার মুখে বর্ষার মেঘ।

—কী ব্যাপার, ভোম্বলদা? তোমার ভালো লাগছে না তো? আমি আগেই বলেছিলাম এই কোটালে তোমার অসুবিধে হবে।

ভোম্বলদা কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে জ্বলন্ত গলায় বলল—নিকুচি করি তোর কোটালের। তুই ভেবেছিস কী মনে?

—কেন? কী করলাম আবার?

—কী করিসনি, বল? জানিস, মিথ্যে কথা শুনলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়।

মনে মনে হাসলাম। ভূতের মুখে রাম নাম। গুলসম্রাটের কিনা মিথ্যে কথায় মাথা গরম হয়। মুখে অবশ্য ভ্যাবাচ্যাকা ভাব ফুটিয়ে বললাম—আহা, ব্যাপারটা কী খুলে বলো না।

—আমার সঙ্গে চালাকি! ভোম্বলদার গলার স্বর তখন সপ্তমে।

—কে করল চালাকি?

—তুই।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুই। আমাকে কী মনে করিস তুই? তুই আমাকে যা খুশি তাই বোঝাবি? ভেড়ির এই হাঁটু জলের কাছে বাঁওড় হল শিশু?

বুঝলাম সত্যি কথাটা টাটুর মুখ থেকেই বেরিয়ে পড়েছে। কেননা, ঘুম থেকে উঠে এখন পর্যন্ত টাটু ছাড়া আর কারও সঙ্গে কোনো কথাই হয়নি ভোম্বলদার। ভেড়ি যে মোটেই গভীর হয় না, সে কথা টাটুই বলেছে। তাই আর কোনোরকম উল্টোপাল্টা বোঝানোর চেষ্টা না-করে মুখে হাসি-হাসি ভাব এনে বললাম—এই কথা! তুমি ঠাট্টাও বোঝ না, ভোম্বলদা।

—আমার সাথে ঠাট্টা! এক গাঁট্টায় তোর ঠাট্টা একেবারে ভোকাট্টা করে দেব। সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করতে লাগল ভোম্বলদা।

ভাগ্যিস, কাছেপিঠে কেউ ছিল না। থাকলে তো লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতাম না। আমারই ভেড়িতে বসে আমাকেই এই ধরনের কথা!

চিরকালই ভোম্বলদার আক্কেলের অভাব। মনে হয় দেহের শক্তি বেশি হলে মস্তিষ্কের শক্তি কমে যায়। তাই কে জানে দুম করে আবার একটা কিছু বলে ফেলবে কি না! আর ভেড়ির লোকজনের সামনে ওই ধরনের উল্টোপাল্টা কিছু একটা বলা মানেই আমার মান-সম্মানের

বারোটা বেজে যাওয়া—মানে প্রেসটিজ পাংচার।

কাজেই বেগতিক দেখে আমি একেবারে কেঁচো হয়ে গেলাম। অত্যন্ত নরম সুরে বললাম—আর কখনও তোমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করব না।

ভোম্বলদা আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন তার দৃষ্টিবাণ আমাকে বিদ্ধ করে ফেলে আর কি!

সকালে চায়ের আসরে ভেড়ির সবাই এসে জড়ো হয়েছে ভোম্বলদার কাছে। জড়ো হয়েছে আশপাশের ভেড়ির লোকজনও। সবাই ভোম্বলদার দশাসই চেহারার তারিফ করছে। সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলদার গল্পের গোরুও গাছে চড়ছে। জিমনি গজুও আবার হাত মিলিয়েছে ভোম্বলদার সঙ্গে। একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ। সেকী গুলের ফোয়ারা!

শুরু করল ভোম্বলদা—মাছের জায়গায় যখন এসেছি তখন মাছের কথাই বলি। কী বলো, গজু?

—নিচ্চয়। ভেড়িতে তো মাছের কথাই শোনা দরকার।

—তবে শোনো। অনেকদিন আগের কথা। ভিক্টোরিয়ার পুকুরে মাছ ধরার জন্যে টিকিট দিচ্ছে শুনে আমিও টিকিট কিনে ফেললাম। টিকিট কাটার পর জানলাম পুকুরে নাকি বেশ বড়ো বড়ো অনেক মাছ আছে। অত বড়ো মাছ তো আর হাতছিপে ধরা যায় না। দরকার হুইলের। আমার কাছে হুইল-টুইল নেই। দেখেশুনে কেনারও সময় হাতে নেই। তা ছাড়া আমি হুইলে মাছ ধরতেও জানি না। মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, টাকাটাই বুঝি জলে গেল। কিন্তু না, টাকাটা জলে যায়নি। সুদে-আসলে উসুল করেছিলাম।

—কী রকম, কী রকম? প্রায় ডজন দুয়েক উৎসুক কণ্ঠের প্রশ্ন।

—সেই কথাই তো বলছি। পরের দিন সকালে চান-টান সেরে

মাত্র একটা হাতছিপ নিয়ে চলে এলাম ভিক্টোরিয়ার পুকুরে। এসে দেখি প্রচুর লোক। মাছ ধরার জন্যে পুকুরের চারপাশে বসে গেছে সবাই। আমিও বসে পড়লাম একটা জায়গায়। সবারই হাতে হুইল। ছিপ শুধু আমার একার। ওখানে আমার ওই হাতছিপ দেখে সবাই অবাক। কারও কারও মুখে আবার মুচকি হাসি। আমার পাশের ভদ্দরলোক ঠাট্টা করে বললেন—দাদা, এখানে ট্যাংরা-পুঁটি নেই—আছে বড়ো বড়ো সব রুই-কাতলা।

সত্যিই তো, হাতছিপে কি আর বড়ো মাছ ধরা যায়! তাই বললাম—আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু কী আর করি বলুন। হুইলে মাছ ধরতে জানি না। ঝোঁকের মাথায় টিকিট কেটে ফেলেছি। বাড়িতে একটা ছিপ ছিল। তাই নিয়ে এলাম ছোট পোনা-টোনা যদি এক-আধটা ধরতে পারি।

ভদ্দরলোক আর কোনো কথা বললেন না। মনে হল আমার কথাটা শুনে উনি বুঝলেন ঠাট্টা করাটা ওনার ঠিক হয়নি। সবাই কিছু-না-কিছু মাছ ধরেছে। ধরতে পারিনি শুধু আমি। তবে কেজি দুয়েকের চেয়ে বেশি বড়ো কোনো মাছই ধরা পড়েনি।

বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। মনমরা হয়ে বসে আছি। ভাবলাম আর বসে থেকে লাভ কী! এমন সময় ঘটল এক ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে রটনা। হই-হই কাণ্ড। রই-রই ব্যাপার। বহু লোক জড়ো হয়ে গেল আমার চারপাশে। ভোম্বলদা থামল।

সবার বিস্মিত চোখ তখন ভোম্বলদার দিকে। কয়েকজনের মুখ থেকে আবার বেরিয়ে পড়ল—ঘটনাটা কী?

—ওস্তাদের মার শেষ রাতে। কথাটা বলে একটু হাসল ভোম্বলদা।

—তার মানে? জিজ্ঞেস করল কেউ কেউ।

—মানে? জলের উপর ছিপের একটা বাড়ি। ব্যস, তাতেই কাজ হয়ে গেল।

রহস্যটা জানার জন্যে সবাই তখন উৎসুক। হিরো-হিরো ভাব দেখিয়ে বেশ মেজাজে বলে চলল ভোম্বলদা—আমি তখন উঠি-উঠি করছি। ছিপের সুতো গুটিয়ে ফেলেছি। রেগেমেগে জলের উপর জোরে মারলাম ছিপের বাড়ি। বাড়ি মারতেই দেখি প্রকাণ্ড একটা রুইমাছ লাফিয়ে পড়ল ডাঙ্গায়—এক্কেবারে আমার সামনে। সাথে সাথে আমিও দুহাতে চেপে ধরলাম মাছটাকে। দেখতে দেখতে লোক জমে গেল আমার চারপাশে। হুইল-টুইল নিয়ে যারা বসেছিল তাদের মুখ চুন। আর আমি...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই গজু জিজ্ঞেস করল—মাছটার ওজন কত ছিল, পালোয়ানবাবু?

—পুরো বিশ কেজি।

—তাহলে আমিও একটা বিরাট মাছ ধরার কথা বলি। সেবার আমি ছিলাম বসিরহাট অঞ্চলের এক ভেড়িতে। বিরাট ভেড়ি। প্রচুর মাছ। বেশ বড়ো বড়ো মাছও হয় ওই ভেড়িতে। বাবুরা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। মাঝেমধ্যেই তেনাদের আমি বেশ বড়ো বড়ো মাছ ধরে দিতাম। বাবুরা খুশি হয়ে বকশিস দিতেন। একবার আশ্বিন মাসের গোড়ায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাবুরা এলেন ভেড়িতে। বললেন—গজু, বেশ বড়ো একটা মাছ ধরে দাও তো। মোটা বকশিস পাবে। সামনে পুজো। আমিও তাই আদাজল খেয়ে নেগে পড়লাম। কিন্তু দেড়-দু কেজির উপর কোনো মাছই পাই না। বলতে গেলে প্রায় সব সময় খ্যাপলা জাল হাতে নিয়ে ভেড়ির পাড়ে ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বড় মাছ ধরা পড়ল না। বাবুরা যেদিন বাড়ি ফিরবেন সেদিন খালি হাতে চুপচাপ ভেড়ির পাড়ে বসে আছি। হঠাৎ দেখি সামনের বড়ো বড়ো ঘাসগুলো খুব জোরে নড়ছে। একদৃষ্টে আমি তখন তাকিয়ে আছি ওই ঘাসের দিকে। তারপর...কী বলব পালোয়ানবাবু, আমি এক্কেবারে চমকে গেলাম।

—কেন, কেন? ভয় আর বিস্ময়ের ব্লেন্ড করা গলায় জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

—ঘাস ঠেলে কী যেন একটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চোখ দুটো বেশ বড়ো বড়ো করে বলল গজু।

—কী, কী এগিয়ে এল? ভোম্বলদার গলায় প্রায় আওয়াজ নেই বললেই চলে।

—সেই কথাই তো বলছি, পালোয়ানবাবু। পেরথমে ভেবেছিলাম, অপদেব্‌তা-টেব্‌তা কিছু হবে। তবে আমার কাছে সুবিধে হবে নি। আমি ওসবের মন্তর-টন্তর জানি। সবে মন্তর পড়তে শুরু করেছি, দেখি বিরাট একটা ভেটকি মাছ। কী করি! জাল-টাল কিছুই হাতে নেই। ধরি কী করে! গজু থামল।

—তো খালি হাতে ধরলে? যতখানি সম্ভব বিস্ময় ঢেলে জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

—তাহলে ভেবে দেখুন। গজু আবার থামল। মুখে হাসি-হাসি ভাব।

সবাই তখন সেই বিরাট ভেটকি ধরার কথা শোনার জন্যে ছটফট করছে। ভোম্বলদাও অস্থির হয়ে উঠেছে। গজুও ভোম্বলদার মতো হিরো-হিরো ভাব দেখিয়ে হঠাৎ বলে উঠল—এক লাফে মাছটাকে ঢোকালাম খাপে।

—খাপে! ভোম্বলদা ও বাকি সবাই হতভম্ব।

—হ্যাঁ, খাপে। মানে আমার বগলে। ভেড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়েই বাঁ-বগলে আটকে দিলাম মাছটাকে। জলে মাছের কী সাংঘাতিক শক্তি তা তো আপনারা সব্বাই জানেন। বাছাধনের সেকী ন্যাজের ঝাপটা! আরে বাবা, আমার নামও গজানন জিমনি।

—বগলে করে মাছটাকে ডাঙ্গায় তুলতে পারলে? জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

—কী যে বলেন, বাবু! গজুর মুখে মৃদু হাসি, মাছটাকে সোজা এনে ফেললাম আলাঘরের সামনে। বিরাট ভেটকি দেখে বাবুরা তো বেজায় খুশি। সাথে সাথে একশো টাকা বকশিস। মাছটা ওজন করে দেখলাম, পুরো চল্লিশ কেজি।

—মাত্র! আমি গজুর দিকে তাকালাম। গজু মাথা নিচু করল।

আমার কথাটা শেষ হতেই ভোম্বলদা শুরু করল—বছর তিনেক আগে কীভাবে গঙ্গার পাড়ে একডজন ইলিশমাছ ধরেছিলাম, জানো গজু?

সঙ্গে সঙ্গে গজু বলল—আগে আপনার কথা শেষ হোক পালোয়ানবাবু। তারপর ডাঙ্গায় কীভাবে আড়াই কেজি ওজনের একটা গলদা চিংড়ি ধরেছিলাম, সে কথা শোনাব।

ভোম্বলদা আর গজু—দুই রত্নকেই আমি ভলো করে চিনি।

গুলের ফোয়ারা যে পরিমাণ ছুটছে তাতে ওখানে আর বসে থাকা ঠিক নয় ভেবে ঘোগ দেখার অজুহাতে কেটে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে।

দুপরবেলা। স্নানের জন্যে আমরা সবাই উপস্থিত পুকুরঘাটে। আমাকে বা অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে টাটুর কাছ থেকেই পুকুরের গভীরতা জানতে চাইল ভোম্বলদা। টাটু এক লাফে পুকুরে নেমেই সাঁতরে মাঝখানটায় গিয়ে সোজা হাত দুটো উপরে তুলে ডুব দিয়ে বুঝিয়ে দিল পুকুর বেশ গভীর। ব্যস, তারপর থেকে আর পুকুরের ধারেকাছে নেই ভোম্বলদা। এমনকী শরীর খারাপের অজুহাতে স্নান পর্যন্ত করল না।

সকাল থেকেই আকাশ নীল। খটখটে রোদের দারুণ তেজ। তাই দুপুরে খেয়েদেয়ে রোদের তেজ একটু কমলেই আমাদের বেরিয়ে পড়ার কথা। কেজি দেড়েক বেশ বড়ো সাইজের বাগদা আর কেজি দুয়েক পোনামাছ ভোম্বলদার জন্যে রাখা আছে।

বাগদা দেখার পর থেকেই বেশ কয়েকবার নোলার জল টেনেছিল ভোম্বলদা। আর তখন থেকেই কলকাতা ফেরার জন্যে ছটফটানি।

দুপুরে খাওয়া শেষ হতে-না-হতেই ভোম্বলদা বলল—চল হুলো, এবার বাড়ি যাওয়া যাক। অযথা দেরি করে লাভ নেই। মাছগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে।

—জিইয়ে রাখা জ্যান্ত মাছ চট করে মরে নষ্ট হবে না, পালোয়ানবাবু। একটু বিশ্রাম নিয়ে রোদের তেজ পড়লে বেরোবেন। যা রোদ্দুর, এর মধ্যে বেরোনো যায়! আগবাড়িয়ে বলল গজু।

—রোদ্দুর! রোদ্দুর তো হয়েছে কী? রোদ্দুরে কি লোকে রাস্তায় বেরোয় না? ভোম্বলদার এক ধমকে গজুর পিলে চমকে গেল।

অবস্থা সামাল দিতে আমি বললাম—সত্যিই তো কাঠফাটা রোদে বেরোলে শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে যেতে হবে। কথাটা বলে ভয়ে ভয়ে ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকালাম।

—কথাটা একেবারে মিথ্যে বলিসনি, হুলো। হঠাৎ পেটে হাত দিয়ে বলল ভোম্বলদা।

আমি বিস্ময়ে প্রায় হতবাক। হঠাৎ ভোম্বলদার একী পরিবর্তন! পরিবর্তনের কারণ অবশ্য এক মুহূর্তেই পরিষ্কার। কথাটা বলেই ভোম্বলদা ঘর থেকে দৌড়ে একেবারে সোজা পায়খানায়।

বুঝলাম দুপুরে ওই পরিমাণ খাওয়ার পরিণাম। ভোম্বলদার খাওয়ার বহর দেখে ভেড়ির লোকজনের সামনে আমার একেবারে মাথা কাটা। ওকে কি খাওয়া বলে!

আমি আর ভোম্বলদাই প্রথমে খেতে বসেছিলাম। আমাদের খাওয়ার পরে বসবে ভেড়ির লোকজন।

মোট তিন কেজি মাংসের মধ্যে ভোম্বলদা একাই সাবাড় করল কেজি দুয়েক। বড়ো পার্শে ভাজা হয়েছিল গোটা কুড়ি। ডজনখানেক শেষ করল একা ভোম্বলদা। আর ওই অনুপাতেই খেয়েছিল ভাত-

ডাল-তরকারিও। ফিরে আবার রান্না বসাতে হয়েছিল বাকি সবার জন্যে।

যাক, সে কথা। একটু পরে ভোম্বলদা পেট হাল্কা করে এসে আমার পাশে বসল। গজুর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—গজু ঠিকই বলেছ। মাছ যখন একটু পরে নিয়ে গেলেও নষ্ট হবে না তখন অযথা এই কড়া রোদে বেরনো ঠিক নয়।

একটু পরে মেঘের চাপে বেলা আপনা-আপনি পড়ে গেল। দেখতে দেখতে বদলে গেল আকাশের চেহারা। গোটা তল্লাটের বুকে নেমে এল অন্ধকারের ছায়া। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। যে কোনো মুহূর্তে আকাশ ভেঙে হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামতে পারে।

হঠাৎ আবার ভোম্বলদার মত পাল্টে গেল। বাড়ি আসার জন্যে শুরু হল ছটফটানি। আমার দিকে চেয়ে বলল—এই ফাঁকে বেরিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কী বল, হুলো?

বললাম—ফাঁকটা দেখছ কোথায়? আকাশের যা চেহারা যখন-তখন বৃষ্টি হতে পারে।

বলতে বলতেই বৃষ্টি। সেকী প্রবল বর্ষণ! সেই সঙ্গে আবার বিদ্যুৎ-চমক আর বাজের গর্জন।

অবস্থা দেখে ভোম্বলদার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। হওয়ারই কথা। ভেড়িতে একটা বাগদাও খায়নি বেচারা। সব জমিয়ে রেখেছে রাতে কলকাতায় ফিরে মালাইকারি খাবে বলে। এই অবস্থায় কলকাতায় যাওয়া তো দূরের কথা, আলাঘর থেকে বাইরে পা ফেলা দায়।

এখন উপায়! আহা, এতো বড়ো সাইজের টাটকা বাগদার মালাইকারি! ভোম্বলদা আর থাকতে না পেরে গজুকে বলল—তুমি একটা উপায় বের কর গজু। কলকাতায় তো না গেলে নয়।

গজু বলল—দেখাই যাক না। একটু পরে বৃষ্টি তো থেমেও যেতে

পারে।

সত্যি কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি থেমে গেল।

ভোম্বলদা বলল—আর দেরি নয়, হুলো। এই বেলা চটপট বেরিয়ে পড়। বাজার থেকে আবার নারকেল-টারকেল নিতে হবে। তাড়াতাড়ি না-পৌঁছলে মুশকিল। বেশি রাত্তির হয়ে গেলে আজ আর হয়তো বাগদার মালাইকারি খাওয়াই হবে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এই বৃষ্টিভেজা কাঁচা রাস্তায় হাঁটতে পারবে তো ভোম্বলদা?

—না পারার কী আছে রে?

—অভ্যেস না থাকলে বৃষ্টিভেজা এঁটেল মাটিতে হাঁটা তো দূরের কথা, পা রাখাই দায়। যখন-তখন আছাড় খেতে হতে পারে।

—জ্ঞান দিতে হবে না। রাগ ও উপেক্ষার ব্লেন্ড করা আওয়াজে কথাগুলো বলল ভোম্বলদা।

বুঝলাম আমার কথা আর ভোম্বলদা বিশ্বাস করতে চায় না। তবুও আবার বললাম—আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না। সিরিয়াসলি বলছি।

—আবার কথা! বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে উঠল ভোম্বলদা।

—ঠিক আছে। আমার আর কী! চলো।

আমাদের যাত্রা হল শুরু। ভোম্বলদার হাতে মাছের ব্যাগ আর আমার হাতে জামা-কাপড়ের। জুতোও হাতে উঠেছে রওনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

ভেড়ির এবড়ো-খেবড়ো সরু পাড়ের কথা আগেই বলেছি। সেই পাড় ধরেই চলেছি আমরা দুজনে। সেকী অবস্থা! হাঁটু প্রমাণ কাদার মধ্যে পা টিপে টিপে এগোচ্ছি আমরা।

আমার ভেড়ির সীমানা সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় আবার বৃষ্টি। এবারের বর্ষণ আগের চেয়ে আরও তীব্র। বৃষ্টির তোড়ে কোনোকিছু দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশায় যেন চারদিক ঢেকে গেছে। এর

মধ্যে আবার পাগলা হাওয়ার মাতামাতি। উদ্দাম বাতাসের ঝাপটায় ছাতা পর্যন্ত খোলা গেল না। ভিজে আমরা দুজনেই একেবারে আমসত্ত্ব। ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপছি।

হঠাৎ চারদিক আলোকিত করে বাজ পড়ল গুড়ুম...সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলদাও দুড়ুম। সেকী রাম আছাড়! আহা, বলে সহানুভূতি জানাতেই ভোম্বলদা মুখপোড়া হনুমানের মতো দাঁত খিঁচিয়ে উঠল—চুপ কর।

সত্যি, কাদায় ভোম্বলদার যা রূপ খুলেছে তা বলার মতো নয়। মুখটা একেবারে হনুমানের মতোই দেখাচ্ছে।

ভোম্বলদার দিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলে রাখা দায়। সেকী অবস্থা! আমার পেটের ভেতর তখন হাসির সোডা-ওয়াটারের বোতল খোলা হয়েছে যেন।

কাদার মধ্য থেকে কোনোক্রমে উঠে পা বাড়াতে-না-বাড়াতেই আবার ভোম্বলদা আছাড় খেয়ে পড়ল। এবার সর্বাঙ্গে কাদা। কাদায় একেবারে ভূত হয়ে গেছে ভোম্বলদা। আমি আর কোনো কথাই বললাম না। কলির এই তো সবে সন্ধে। দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! অভ্যেস না থাকলে কাদার মধ্যে দিয়ে চলা যে কী মারাত্মক ব্যাপার সেটা এবার হাড়ে-হাড়ে টের পাবে বাছাধন।

টের পেল সঙ্গে সঙ্গেই। আবার পতন। এবারের আছাড়ে মাছের ব্যাগটাই প্রায় হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। আমি চট করে সেটা ধরে ফেললাম। ভোম্বলদা করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি চুপচাপ।

ভোম্বলদার চলার গতি প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু উত্থান আর পতন—পতন আর উত্থানের খেলা চলছে।

তবুও ভোম্বলদা হাসি-হাসি মুখ করে বলল—কষ্ট না করলে কি আর কেষ্ট মেলে রে?

হঠাৎ তখনই একটা দমকা হাওয়া ভোম্বলদাকে দিল ফেলে—একেবারে ভেড়ির মধ্যে।

—হুলো রে, বাঁচা—ডুবে গেলাম। ভোম্বলদার সেকী করুণ আর্তনাদ!

ভোম্বলদার দিকে তাকিয়ে অবাক। একী কাণ্ড! বলতে গেলে প্রায় হাঁটু জলেই ভোম্বলদা হাবুডুবু খাচ্ছে। অথৈ জলে সাঁতারুর মাত্র এইটুকু জলের মধ্যে এই অবস্থা!

এক লাফে আমি ভোম্বলদার হাত ধরলাম। কিন্তু ওই দেহ কি সহজে তোলা যায়!

কোনোক্রমে ভেড়ির পাড়ে উঠলাম দুজনে। ভোম্বলদার সারা গায়ে ঝাঁঝি-ভটকা। মুখে শ্যাওলা বোঝাই। মাছের ব্যাগটা হাতে থাকলেও প্রায় খালি। শুধু বাগদাই আছে ব্যাগে। তা-ও চার-পাঁচশো গ্রামের বেশি নয়।

মনমরা ভোম্বলদা বলে উঠল—কে জানে মাছের উপর কার চোখ পড়েছিল! কী নজর রে বাবা। উঃ, মালাইকারি খাওয়ার সখ একেবারে মিটিয়ে দিলে।

এমনি করে আছাড় খেতে খেতেই ভোম্বলদা একটু-একটু করে এগোচ্ছে। সেকী আছাড়ের বিচিত্র বহর! কোনও সময় চিৎ হয়ে—কোনও সময় কাৎ হয়ে—কখনও আবার উপুড় হয়ে। ক্যামেরায় ধরে রাখার মতোই দৃশ্য। আছাড় প্রতিযোগিতা হলে ভোম্বলদা যে ফার্স্ট হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হাফ-সেঞ্চুরি পর্যন্ত গুনতে পেরেছিলাম আমি। বাকিটা আর গুনতে পারিনি। তবে ভোম্বলদার শেষ আছাড়টার কথা জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারব না।

তখন আমরা প্রায় খড়িবাড়ির কাছাকাছি। রাস্তার বাঁ দিকে বিরাট লম্বা একটা গভীর পুকুর। তারই গা ঘেঁষে রাস্তা। রাস্তাটা যেমন পিচ্ছিল তেমন কাদায় ভরা। কোথাও খুব সরু, কোথাও আবার বেশ

চওড়া। তা ছাড়া পুকুরের পাড় বলেও কিছু নেই। মোদ্দা কথা, খুবই বিপজ্জনক রাস্তা। পড়লে আর রক্ষে নেই। সোজা পুকুরের মধ্যে। আর ভোম্বলদার সাঁতারের দৌড়ও তো ইতিমধ্যে দেখা হয়ে গেছে আমার। কাজেই আগে থাকতে বার বার সাবধান করছি ভোম্বলদাকে। এখন মনে হয় ভোম্বলদা আর আমাকে অবিশ্বাস করছে না। অত আছাড় খাওয়ার পর বাহাদুরি দেখানোর সখও বোধহয় আর নেই। তাই আমার বার বার সতর্কবাণীতেও দাঁত খিঁচিয়ে ওঠার পরিবর্তে হাসিমুখেই বলল—আর পড়ার চান্স কম। সেঞ্চুরি তো প্রায় হয়েই গেছে। এর মধ্যে কাদায় হাঁটা কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছি।

বিপদে পড়েই ভোম্বলদার এই স্বীকারোক্তি। বিপদ কাটলেই শুরু হবে গুল আর আস্ফালন।

আস্তে আস্তে সেই রাস্তা দিয়ে চলেছি আমি আর ভোম্বলদা। এবার সরু রাস্তাটা সামনে বেশ চওড়া হয়ে গেছে। কিন্তু চওড়া হলে কী হবে—সাংঘাতিক কাদা। তাই ভোম্বলদাকে বললাম—এই জায়গাটা খুবই মারাত্মক। ডানদিকে এগিয়ে গিয়ে সাবধানে চলো।

ভোম্বলদা পা টিপে-টিপে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মুখে আবার হাসি এনে বলল—ঠিক আছে। কোনো চিন্তা নেই। খড়িবাড়ি তো এসেই গেছি। আর ভাবনা কী! চল।

—কথাটা শেষ হতে না হতেই বল—মানে ফুটবল। মাটিতে পড়ে ফুটবলের মতো গড়িয়ে পুকুরের দিকে চলেছে ভোম্বলদা।

সর্বনাশ! এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার। পুকুরে পড়লে তো শেষ। তাই হাতের সবকিছু ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি ভোম্বলদার উপর। প্রাণপনে টেনে ধরলাম ওর কোমরের বেল্টটা। কিন্তু ধরলে কী হবে! ওই তিনমনি লাশ কি আমি সামলাতে পারি! ভোম্বলদা একই ভাবে গড়িয়ে চলেছে পুকুরের দিকে। আমি ভোম্বলদার বেল্ট ধরে আছি। আমরা দুজনে তখন গড়িয়ে চলেছি তো গড়িয়েই চলেছি। আশ্চর্য

একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। বাঁচাও...বাঁচাও... ডুবে গেলাম...বলে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

গড়াতে গড়াতে আমরা প্রায় পুকুরের জলে পড়ি-পড়ি করছি, এমন সময় পাড়ার লোকজন ছুটে এসে ঠ্যাং টেনে ধরল আমাদের দুজনের। আমাদের মুখ তখন পুকুরের জলের দিকে। ওরা টানছে ডাঙ্গার দিকে। একে পুকুরের দিকটা ঢালু, তার উপর ভোম্বলদার ওই বিরাট বপু। ওরা টানছে মাত্র তিনজনে। অত সহজে কি টেনে তোলা যায়! যেন টাগ্-অব-ওয়ার চলেছে। হঠাৎ ভোম্বলদার হাত গিয়ে পড়ল পুকুরের জলের উপর। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ওরা তিনজন। মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল আরও চার-পাঁচজন। ডাঙ্গার দিকে তখন লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের টেনে তুলতে সক্ষম হল ওরা। তুলতে গিয়ে ওদের অনেকেই বেশ কয়েকবার আছাড় খেল। সে এক দৃশ্য। দেখলে মনে হয় আমরা সবাই যেন কাদার মধ্যে মল্লযুদ্ধ করছিলাম।

জামা-টামা খুলে মুখ-হাত-পা ধোয়ার সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ভোম্বলদা বলে উঠল—আমার মাছের ব্যাগ?

সবিস্ময়ে সবাই দেখি প্লাস্টিক ব্যাগটা পুকুরে ভাসছে। বাগদার মালাইকারি বলে হায় হায় করে উঠল ভোম্বলদা।

খালি হাতে কলকাতায় ফিরে যে যার বাড়ি গেলাম। পুকুরপাড়ের টানাটানিতেই আমার সর্বাঙ্গে সেকী ব্যথা! ওরকম টানাটানি আর আছাড় খাওয়ার সেঞ্চুরি-করা ভোম্বলদার যে কী হাল হতে পারে সেটা আন্দাজ করেই পরের দিন সকালবেলায় ভোম্বলদার বাড়িতে গেলাম।

খাটে শুয়ে আছে ভোম্বলদা। শিয়রে বসে আছেন মাসিমা—অর্থাৎ ভোম্বলদার মা। পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে শুটকে আস্তে আস্তে ভোম্বলদার

সারা শরীরে হাত বোলাচ্ছে। ভোম্বলদা কাতরাচ্ছে। মেসোমশাই ওষুধ আনতে গেছেন। আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ভোম্বলদার দিকে।

হঠাৎ মাসিমা বললেন—কী বলব বাবা হলো, ছেলেটা এপাশ-ওপাশ করতে পারছে না। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন এক্সরে করাতেই হবে। হাড়-টাড় ভাঙ্গতেও পারে। ভাঙ্গার সম্ভাবনাই বেশি।

আমি বললাম—মাসিমা, এ-গোণে আমি ভোম্বলদাকে ভেড়িতে নিয়ে যেতে চাইনি। কিন্তু ভোম্বলদা আমার কথা শুনল না। তা ছাড়া ভোম্বলদা ভেজা এঁটেল মাটিতে হাঁটতে পারে না আর সাঁতারও জানে না। তবুও বাহাদুরি দেখাতে গেল। যা জানা নেই, কী দরকার তা নিয়ে বাহাদুরি করার! তবুও তো এ যাত্রায় অল্পের উপর দিয়ে গেছে। এর চাইতেও তো মারাত্মক কিছু ঘটতে পারত।

—কী বলব, বলো। মাসিমা বললেন, ভীষণ জেদি। তোমরা তো সবই জানো।

আমি বললাম—এবার ভুগছেটা কে? টের পাচ্ছে তো হাড়ে-হাড়ে।

পাশ ফিরতে গিয়ে উঃ..মারে-বাবারে মরে গেলাম রে বলে ককিয়ে উঠল ভোম্বলদা।

—এই কোটালে যেতে কত বারণ করলাম, শুনলে না তো! ভোম্বলদার চোখে চোখ রেখে বললাম।

আবার একটু নড়তে গিয়ে উঃ...বলে ভোম্বলদা বলল— কী বুঝলি?

—এখনও কি বোঝবার কিছু বাকি আছে? না-জেনে না-বুবে কেরামতি দেখাতে গেলে কী হয় তা তো ভালো করেই টের পেলে।

ভোম্বলদা ও নিধন রায়

বলতে গেলে আমরা সবাই এসে হাজির হয়েছি ক্লাবে। আসেনি শুধু একজন—ভোম্বল ঘোষ, মানে আমাদের বিখ্যাত ভোম্বলদা। চুপচাপ বসে আছি আমরা। ভোম্বলদা না এলে কি আর আড্ডা জমে! ভোম্বলদা মানে চমক-চটক-নাটক, ভোম্বলদা মানে সাড়ে ছ'ফুটের এক বিশাল জোয়ান, ভোম্বলদা মানে আমাদের শক্তি ও সাহস, ভোম্বলদা মানে গল্প-গুল-গুজবের ফোয়ারা। সেই ভোম্বলদাই আসেনি এখনও।

শীতকাল। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে গেল। শীতাতুর সন্ধ্যার হাল্কা কুয়াশা আর ধোঁয়াশার আস্তরণ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ত্রয়োদশীর চাঁদ দেখা দিল আকাশের গায়ে। আলো জ্বলে উঠল রাস্তায় রাস্তায়। কিন্তু কোথায় ভোম্বলদা, আর কোথায় কে! অথচ আজ নাকি ভোম্বলদা একটা দারুণ সারপ্রাইজ দেবে আমাদের সকলকে। তাই আমরা মনে মনে ছটফট করছি সেই সারপ্রাইজটার জন্যে।

আমাদের ক্লাবের নাম সেভেন-ইন-ওয়ান। ক্লাবের সম্পাদক ভোম্বল ঘোষ—আমাদের ভোম্বলদা। নামটা তারই দেওয়া। সত্যিই নামটা সার্থক। কেননা, সপ্তাহের সাত দিনে সাত রকমের প্রোগ্রাম হয় ক্লাবে। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত এক-একদিন এক-একরকম প্রোগ্রাম। কোনোদিন তাসখেলা, কোনোদিন ক্যারাম পেটানো, কোনোদিন আবার বিতর্ক-সভা... ইত্যাদি—ইত্যাদি। রবিবারটা সাহিত্যের আসর। আমরা কয়েকজন রবিবাসরের মেম্বার। ভোম্বলদা যেখানেই থাকুক না কেন, অন্য কোনোদিন ক্লাবে আসুক বা না-ই আসুক, শনি-রবি—এই দুদিন ক্লাবে আসবেই আসবে। শনিবারে থাকে নাটকের রিহার্সাল। আর রবিবারে হয় সাহিত্য-আলোচনা। এ দুটোতেই ভোম্বলদা অংশ গ্রহণ করে।

ইদানিং ভোম্বলদার সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ভীষণ বেড়ে গেছে। কবিতার বইও বেরিয়েছে তার। বিক্রি হোক আর না-ই হোক, কেউ কেউ নাকি প্রশংসা করেছে বইটির।

আমরা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করলেও এখনও কোনো বই বেরোয়নি আমাদের কারও। সেই দিক থেকে এগিয়ে আছে ভোম্বলদা। সুতরাং, ভোম্বলদাকে আর পায় কে!

ভুলো কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আমাদের কানে এল বাজখাঁই গলার আওয়াজ। ভুলোর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল।

—আরে শোন-শোন—হুলো, ভুলো, টুলো! পুরস্কার—পুরস্কার বলতে বলতে হাজির হল স্বয়ং ভোম্বলদা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কার পুরস্কার? কীসের পুরস্কার? কেন পুরস্কার?

—নাঃ, তোদের আর মানুষ করা গেল না।

—তুমি আগে মানুষ হও, তারপর আমাদের মানুষ কোরো। দুম করে বলে উঠল টুলো।

—চুপ কর। একদম ট্যা-ফো করবি না। ব্যাটা সংস্কৃত-মার্কা টোলের পণ্ডিত। সিংহের মতো গর্জে উঠল ভোম্বলদা।

সত্যি টুলো সাদাসিধে গোবেচারা। ওর আসল নাম তাপস ভট্টাচার্য। টুলো নামটা ভোম্বলদারই দেওয়া। লেখাপড়ায় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছেলে ও—দারুণ মেধাবী। সংস্কৃতে এম. এ.। এখনও দিনরাত বই-পত্তরের মধ্যেই ডুবে থাকে। সারা দুনিয়ার খবর রাখে। ভোম্বলদার গাঁট্টার ভয়ে আমরা অনেক সময় অনেক কথা বলতে না পারলেও টুলো কিন্তু ছাড়ে না। চ্যাটাংচ্যাটাং বুলি শুনিয়ে দেয় ভোম্বলদাকে। মুখে যতই লম্ফ-ঝম্ফ করুক না কেন ভোম্বলদা, টুলোকে গাঁট্টা-ফাট্টা মারতে সাহস করে না। কারণ, বিদ্যা-বুদ্ধি—এই দুয়ের জন্যেই টুলোর শরণাপন্ন হতে হয় ভোম্বলদাকে।

তাই টুলো আরেকখানা ছাড়ল—তুমি যা-ই বলো ভোম্বলদা, তোমার অবস্থা অনেকটা সেই সম্পাদকের মতন।

এবার ভোম্বলদা গাঁক-গাঁক করে উঠল না। বরং সম্পাদকের সঙ্গে তুলনা করায় বেজায় খুশি হল। মুখে হাসি-হাসি ভাব এনে বলল—কার কথা বলছিস, বল তো!

—কার কথা আবার বলব! ওই যে সেই— সেই সম্পাদক গো—যে কথা বলতে গিয়ে নিজে সেনটেন্স কমপ্লিট করে না, অপরের কথাও পুরো শোনে না।

—এ-কথার মানে? গম্ভীর মুখে ভোম্বলদার সিংহগর্জন।

—মানে? মানে তো জলবৎ তরলং। পুরস্কার—পুরস্কার করে চেঁচাচ্ছ—আসলে ব্যাপারটা খুলে না বললে বুঝব কী করে?

—ঠিক বলেছিস, টুলো। আরে, এই জন্যেই তো তোর কাছে বুদ্ধি নিতে যাই। বেশ খুশ-মেজাজে বলল ভোম্বলদা, আসল ব্যাপারটা কি জানিস, আমি আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম।

—কেন? কেন? আমরা তিনজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

—পুরস্কার মানে সাহিত্য-পুরস্কার। আমি একটা বড়ো পুরস্কার কমিটির মালিক থুড়ি সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ভদ্দরলোকের নাম—নিধন রায়। এখানে আসবেন তিনি। আসার টাইমও প্রায় হয়ে গেছে।

ভুলো বলল—তাতে কী হল?

—এটাও বুঝতে পারলি না?

আমরা সবাই একসঙ্গে বললাম—না।

হিরো-হিরো ভাব দেখিয়ে ভোম্বলদা বলে উঠল—আমি হয়তো আমার 'হোঁৎকার হোঁচট খেয়ে চলা' কাব্যগ্রন্থের জন্যে পুরস্কার পেতে পারি। সেরকম আভাস পেয়েছি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ রে।

—হিপ-হিপ-হুররে—ভোম্বলদা জিন্দাবাদ বলে আমরা চিৎকার করে উঠলাম।

ঠিক সেই সময় এসে উপস্থিত হলেন পুরস্কার কমিটির সেক্রেটারি নিধন রায়।

—আসুন স্যার, আসুন। ভোম্বলদার সেকী উষ্ণ অভ্যর্থনা! তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, পরিচয় করিয়ে দিই। এ হল হুলো—হলধর বোস, এ ভুলো—ভোলানাথ দত্ত আর এ হচ্ছে টুলো—তাপস ভট্টাচার্য। এরাই আমার সাহিত্যসাথী। আমাদের ক্লাবে আরও দু-একজন আছে। তারা এখনও পৌঁছয়নি। তারাও বেশ ভালো লেখে।

আমরাও সোনালি অভ্যর্থনা জানালাম নিধনবাবুকে।

—বাঃ, বেশ বেশ। বললেন নিধনবাবু, তা আপনাদের এত আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর চেঁচামেচি হচ্ছিল কীসের জন্যে?

কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে ভোম্বলদা বলে উঠল—আপনি আসবেন বলে স্যার।

—তা বেশ, তা বেশ। বলে নিধনবাবু বসলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ওয়ান-পাইস ফাদার-মাদার ভোম্বলদা পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করল। ভুলোর হাতে টাকাটা দিয়ে বলল—যা, গরম সিঙ্গারা আর মিস্টি নিয়ে আয়। পরে চা আনবি।

টুলো ফিসফিস করে আমাকে বলল—দেখলি কাণ্ডটা! পুরস্কারের কী মহিমা। মিচকে গোঁফঅলা ফিচকে চেহারার লোকটাকে কী খাতিরই না করছে ভোম্বলদা।

নিধনবাবু আমার আর টুলোর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন—অসাধারণ কবিতা লেখেন আপনাদের ভোম্বলদা। এ-দেশে এই লেখার দাম কেউ দেবে?

টুলো আমার মুখের দিকে তাকাল। আবার ফিসফিস করে বলল— কিস্তি মাৎ। ভোম্বলদার পুরস্কারপ্রাপ্তি আটকায় কে! নিধনবাবুর প্রশস্তিতে ভোম্বলদাও আহ্লাদে আটখানা হয়ে লজ্জাবতী লতার মতন কুঁকড়ে গেল।

এমন সময় খাবারের প্যাকেট হাতে নিয়ে ভুলো এসে মুখ ব্যাজার করে দাঁড়াল।

—কী হয়েছে রে ভুলো? বাজখাঁই গলার ভোম্বলদার কণ্ঠ থেকে যেন মধু ঝরে পড়ল।

আমতা-আমতা করে ভুলো বলল— মানে...মানে... গরম সিঙ্গারা পাইনি। তাই গরম মাংসের চপ...

খপ করে ঠোঙ্গাটা হাতে নিয়ে ভোম্বলদা বলল—ঠিকই তো করেছিস। মাংসের চপের মতন জিনিস আছে নাকি? কী বলেন, স্যার?

—ঠিক-ঠিক। চপ-কাটলেটই আমি বেশি পছন্দ করি। ওই সব সিঙ্গারা-টিঙ্গারা আমার চলে না।

—তা হলে কি একটা চিকেন কাটলেটও আনাব স্যার?

—তা আনাতে পারেন। চিকেন কবিরাজি পাওয়া যাবে এখানে?

—যাবে স্যার।

—তাহলে কাটলেটের সঙ্গে একটা কবিরাজিও আনান।

—একটা, না দুটো আনাব, স্যার?

—দুটো আনান। আসলে আমাকে তো প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকায় যেতে হয়। ওখানে তো আবার চপ-কাটলেট, মাংস-টাংস ছাড়া তেমন কোনো ভালো খাবারই মেলে না। তাই এই সব খাবারেই আমার রুচি বেশি।

—সেকী! অবাক হয়ে টুলো বলল, তবে যে শুনেছি ওখানে সবরকম খাবারই পাওয়া যায়। ফ্রায়েড খাবারই নাকি বেশি চলে না আজকাল।

—আঃ! টুলো, সব জিনিস তুই জানিস নাকি? ভোম্বলদা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তোর হল শোনা কথা। আর স্যারের তো নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাই না, স্যার?

নিধনবাবু বললেন—ঠিক-ঠিক।

ভোম্বলদা আধো-আধো বাধো-বাধো ভঙ্গিতে বলল—স্যার, কাজের কথায়...

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, কাজের কথায় আসছি। চপ খেতে খেতে বললেন নিধনবাবু।

—তাই ভালো, স্যার। আমি বললাম, আমরা আবার কবি ভীমচরণ আচারকে এখানে ইনভাইট করেছি। উনি তো খুবই নামি কবি। আপনার সাথেও নিশ্চয়ই ওনার আলাপ পরিচয় আছে।

—পরিচয় মানে! আচার আমার ছোটোবেলার বন্ধু। আমার হাত ধরেই তো ও সাহিত্য-জগতে এল।

ভুলো বলল—স্যার, উনি দারুণ লেখেন। সব নামি পত্রিকাতেই ওনার লেখা থাকে।

মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব এনে নিধনবাবু বললেন—নামি পত্রিকা! এদেশে আবার নামি পত্রিকা কোথায়? এখানকার কোনো পত্রিকাতেই আমি লেখা দিই না। আমার লেখা বেরোয় বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায়। এখানে আমার লেখার দাম দিতে পারবে? ভীমচরণই আমাকে কতবার লেখার জন্যে বলেছে—আমি লেখা দিইনি।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

ভোম্বলদা বলল—স্যার, কাজের কথায়...

—হ্যাঁ, কাজের কথায় আসছি। তবে একটা কথা শুনুন, এখানকার পত্রিকা যেমন পাবলিশার্সও তেমন।

ভুলো বলল—কেন, কী হল?

—সে আর কি বলব মশাই। আমি তো এখানকার কোনো কাগজে

লেখা দিই না, পাবলিশার্সদেরও বই দিই না। কিন্তু একজন পাবলিশার একেবারে নাছোড়বান্দা। আমার বই তিনি প্রকাশ করবেনই। তাই বাধ্য হয়ে একটা বই তাঁকে দিলাম। কিন্তু বই দিয়ে যে কী বিপদে পড়লাম তা বলে বোঝানো যাবে না।

আমি বললাম—কেন? টাকা-পয়সা দেয়নি?

—টাকা-পয়সার গুলি মারুন। আরে মশাই, ভদ্দরলোক বলেন কিনা এগারোশো বই ছাপাবেন। কথা শুনে তো আমি অবাক। বললাম, এগারোশো বই ছাপাবেন! আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমার কথা শুনে পাবলিশার কী বললেন, জানেন?

—কী বললেন?

—পাবলিশার বললেন, তবে কি পাঁচশো ছাপাব?

—আপনি কী বললেন?

—কী আর বলব! ভদ্দরলোকের কথা শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। বললাম, পাঁচশো—এগারোশো—কী যা-তা বলছেন! মনে রাখবেন এটা নিধন রায়ের বই। এগারো লাখ ছাপুন। ঝড়ের গতিতে সব বই বিক্রি হয়ে যাবে।

কথাটা শেষ হতে-না-হতেই টুলো এমন জোরে হেঁচে উঠল যে নিধনবাবুর হাত থেকে কাটলেটটাই পড়ে গেল। ভোম্বলদাও বিষম খেতে খেতে বলল—ঠিকই বলেছেন, স্যার। আপনার কলমের জোর...

—রকেটকেও হার মানায়। ফোড়ন কাটল টুলো।

ভোম্বলদা কটমট করে টুলোর দিকে তাকাল। কিন্তু যার জন্যে কটমট করে তাকানো সেই নিধনবাবু কিন্তু নির্বিকার চিত্তে বলে চলেছেন—সেবার আমি আমেরিকায় বসে একদিনে একশো কবিতা লিখে ফেললাম। একলাখ ডলার হাতে নিয়ে ছুটে এল পাবলিশার। তারপর...

নিধনবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই টুলো বলে উঠল—বরফ।

—বরফ! সেকী কথা! এই শীতে বরফ দিয়ে কী হবে? জিজ্ঞেস করলেন নিধনবাবু।

মনে হচ্ছে টুলোটার জন্যে আজ কপালে অনেক দুঃখ আছে। ভোম্বলদার পুরস্কারটা যদি ফসকে যায়, তা হলে আর আস্ত রাখবে না আমাদের কাউকে। তাই ব্যাপারটা সামাল দেওয়ার জন্যে বলে উঠলাম—বরফ না, বরফ না—হরফ।

—তার মানে? নিধনবাবুর মুখটা একটু গম্ভীর।

আমতা-আমতা করে বললাম—মানে... মানে... অক্ষর। এই যে আপনি আমেরিকায় বসে একদিনে একশো কবিতা লিখলেন, কত অক্ষরই না একদিনে লিখতে হল আপনাকে—তাই না স্যার?

—কম্পিউটারও হার মেনে যায়। টুলোর আবার বক্রোক্তি।

এবার কিন্তু নিধনবাবু হাসি-হাসি মুখ করে বললেন—ঠিক-ঠিক। আপনাদের টুলোবাবু বেশ বুদ্ধিমান।

আবার ভোম্বলদা বলল—স্যার, কাজের কথায়...

—হ্যাঁ, এবার কাজের কথায় আসছি। 'কবিরত্ন' পুরস্কার সম্বন্ধে আপনাদের কারও কি আইডিয়া আছে?

আমি বললাম—কিছুটা আছে। শুনেছি বেশ বড়ো পুরস্কার।

—বড়ো মানে কত বড়ো? জিজ্ঞেস করলেন নিধনবাবু।

কথাটার জবাব দিতে না পেরে সবাই আমরা চুপচাপ। নিধনবাবু বলে চললেন—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এটা।

ভুলো বলল— কেন স্যার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কারই তো...

—রাখুন আপনার জ্ঞানপীঠ, মহাপীঠ, তারাপীঠ। 'কবিরত্ন' পুরস্কারের ধারেকাছে কেউ নেই। বাইরের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকরা 'কবিরত্ন' পুরস্কার পাওয়ার জন্যে পাগল।

টুলো বলল—জ...জ... জল খাব।

ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল ক্লাবের সামনে। কবি ভীমচরণ আচার এসে গেছেন—কবি ভীমচরণ আচার এসে গেছেন বলে আমরা ট্যাক্সির দিকে ছুটে গেলাম। ট্যাক্সি থেকে নামলেন কবি ভীমচরণ আচার। টুলো-ভুলো-আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম। ক্লাবরুম থেকে নিধন রায়ও বেরিয়ে এলেন আমাদের সঙ্গে।

ভীমচরণ আচারকে নিয়ে আমরা ক্লাবরুমে ঢুকতেই ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—নিধনবাবু কোথায় গেলেন রে?

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে বললাম— জানি না।

ভীমচরণ আচার জিজ্ঞেস করলেন—নিধনবাবু কে?

টুলো বলল—কবি নিধন রায়।

—কবি নিধন রায়! কোনো নবীন কবি বুঝি?

—সেকী স্যার। উনি যে বললেন আপনি ওনার বাল্যবন্ধু।

ভীমচরণ আচার একটু হাসলেন।

টুলো বলল—ভোম্বলদা, এই তো সবে পুরস্কারের শুরু...

—গুরু। আমি বললাম, স্যার নিধন রায় ভোম্বলদারও গুরু।

ভুলো বলল—শুধু গুরু। গুরুর গুরু তস্য গুরু।

ভীমচরণ আচার ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন—কী ব্যাপার বলো তো?

—হায়, হায়—আমার অতগুলো টাকা বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ভোম্বলদা। তারপর সকরুণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী বুঝলি?

সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম—অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

কবি ভীমচরণ আচার ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভোম্বলদাকে নিধন করে এতক্ষণে হয়তো আর কাউকে নিধন করতে বসে গেছেন ইঙ্গ-বঙ্গবাবু স্যার নিধন রায়।

সাঁঝের রস

ভোম্বলদাকে নিয়ে হয়েছে যত মুশকিল। ভোম্বলদা নিজেই জানে না সে কী করে—কী বলে। প্রথমেই মারে গুল, ফলে একের পর এক ভুল, শেষ পর্যন্ত হারায় এ-কূল ও-কূল দুকূল। অর্থাৎ প্রথমে আত্মহারা, তারপরেই সর্বহারা। এটা আমরা সবাই বুঝে গেছি। কিন্তু ভোম্বলদা নিজেই হয়তো বোঝেনি।

ইদানীং ভোম্বলদার মুখে প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়, সাহিত্য-জগতে এসেছি—এখন আর সেই আগের মতো থাকলে চলবে না। মার্জিত হতে হবে।

অনেকে ভেবেছিল হয়তো ভোম্বলদার স্বভাব পালটালেও পালটাতে পারে। কিন্তু ওই ভাবাভাবি পর্যন্তই। একটা কথা আছে—স্বভাব যায় না মলে। ভোম্বলদার ক্ষেত্রে কথাটা ষোলোআনাই প্রযোজ্য। যতই সাহিত্য করুক আর যা-ই করুক, তার স্বভাব কোনোদিন পালটাবে বলে মনে হয় না। ভোম্বলদা যে-কে সেই।

এখনও তার খাই-খাই স্বভাব আগের মতোই আছে। এটা খাই, সেটা খাই লেগেই আছে। কোনো ভালো খাবারের নাম শুনলে তো আর কথাই নেই। ভোম্বলদার মাথাটাই তখন আর ঠিক থাকে না। আমাদের তিনজনকে—মানে ভুলো, টুলো আর আমাকে পাগল করে মারে। সব সময়ই কিন্তু গাঁটের কড়ি খসে আমাদের, বিনিময়ে কপালে যা জোটে তা আর বলে লাভ কি! তবুও আমরা সবাই ভোম্বলদার সঙ্গে থাকি। কারণ, যা দিনকাল পড়েছে তাতে ভোম্বলদার মতো সাড়ে ছ-ফুটের পালোয়ান একজন সঙ্গে থাকলে সহজে কেউ কিছু আবোল-তাবোল বলতে সাহস করে না। তাছাড়া সব ব্যাপারেই ভোম্বলদার দারুণ উৎসাহ। তাই ভোম্বলদার সব আবদারই মেনে নিই আমরা।

এবারও তাই হল। মেনে নিলাম ভোম্বলদার বায়না। এবারের

বায়নাটা একটু অন্য ধরনের। কার কাছে নাকি ভোম্বলদা শুনেছে, সাঁঝের রস দারুণ খেতে। ব্যস, আর যায় কোথায়! সাঁঝের রস খেতেই হবে। চলো এবার সাঁঝের রস খেতে। খোঁজ করো কোথায় ভালো রস পাওয়া যায়!

বহু খোঁজাখুঁজির পর যে জায়গাটার সন্ধান পাওয়া গেল সেটা আসলে ভুলোরই মামাবাড়ি—হুগলি জেলার তারাহাট গ্রাম। জয়রামবাটি থেকে মাইল চারেক দূরে।

হ্যাঁ, একটা কথা বলা হয়নি। ভোম্বলদাকে চেনে বা ভোম্বলদার নাম শুনেছে, অথচ ভোম্বলদার কীর্তি-কলাপ জানে না, এমন লোক ভূ-ভারতে নেই বললেই চলে। তাই ভুলোর মামাবাড়িতেও সবাই ভোম্বলদার ব্যাপার-স্যাপার জানে। সেখানে ভোম্বলদার আরও বেশি সুবিধে। খাওয়ার ব্যাপারে আর কোনোরকম 'কিন্তু'-'কিন্তু' করতে হবে না। ভোম্বলদার খাওয়া যে কী—তা তো আমরা জানি। এক হাঁড়ি রস হয়তো একাই সাবাড় করে দেবে। আমাদের কপালে যে কী জুটবে, তাও আমরা জানি।

সেদিন ছিল বুধবার। ভোম্বলদা, ভুলো আর আমি—তিনজনে বসে ভুলোর মামাবাড়ি যাওয়ার প্ল্যান করছি। ভোম্বলদার আর তর সইছে না। সাঁঝের রস বলে বার বার নোলার জল টানছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী হলো?

—হবে আবার কী? তোদের প্ল্যান তো দেখছি গভর্নমেন্টের ফাইভ-ইয়ারস প্ল্যানের মতন।

ভুলো বলল—সবারই তো কাজকর্ম আছে। হুট বললেই তো আর উঠে পড়া যায় না।

মুখপোড়া হনুমানের মতো দাঁত খিঁচিয়ে বলল ভোম্বলদা—তা হলে তোরা ভাব। ভেবে-টেবে দ্যাখ এ-বছর যাবি, না সামনের বছর যাবি। তোদের তো আবার অনেক কিছু ভাবতে হয়।

আমি বললাম—তুমি ছটফট করছ কেন?

—ছটফট করব না? সাঁঝের রস বলে কথা। বাজখাঁই গলায় বলে উঠল ভোম্বলদা।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম—রস খাওয়াটা কি পালিয়ে যাচ্ছে?

—পালাবে কেন? তবে যেতে যখন হবে তখন আর দেরি করে লাভ কী? ভোম্বলদার স্বর একটু মোলায়েম।

ভুলো বলল— তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়লে ভালো হয়।

—মন্দ কী?

—টুলো কলকাতার বাইরে—সেটা খেয়াল আছে?

— যাঃ, এই কথাটা তো আগে বলবি!

—নতুন কোনো খাবারের কথা উঠলে তুমি তো নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাও। যতক্ষণ না সেই খাবারটি পাচ্ছ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার শান্তি নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রসাতলে গেলেও তোমার ভ্রূক্ষেপ থাকে না।

ভুলোর কড়া কথায় কোনো গুরুত্ব না দিয়ে উলটে বেশ গদগদ হয়ে ভোম্বলদা বলল—যা বলেছিস মাইরি, একখানা কথার মতন কথা। তাহলে আর দেরি করিসনি, ভুলো। শুভস্য শীঘ্রম্।

আমি বললাম—শুভস্য শীঘ্রম্ তো বুঝলাম। কিন্তু টুলো কোথায়? ভুলোর মুখে এক্ষুনি শুনলে তো সে কলকাতার বাইরে।

আবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠল ভোম্বলদা—এই টুলোটাকে নিয়ে হয়েছে যত সমস্যা। ফিরবে কবে সে?

ভুলো বলল—পরশু। অর্থাৎ শুক্রবার।

—তা হলে শুক্রবারেই যাওয়া যাক। কী বলিস, হুলো?

আমি বললাম—শুক্রবারে যাবে কী করে?

—কেন? ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল।

—টুলো ফিরবেই তো রাত্তিরে।

—নাঃ, আমার কপালটাই খারাপ। দেখছি সাঁঝের রস আর আমার কপালে নেই।

ভুলো আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল—কী বলছো তুমি ভোম্বলদা! খাবার ব্যাপারে তোমার কপাল খারাপ?

—নয় তো কী? টুলো আর বাইরে যাওয়ার সময় পেল না। ঠিক এই সময়ই বাইরে গেল।

আমি বললাম—ও কি আর জানত যে তুমি এই সময় সাঁঝের রস খেতে যাবে? তা ছাড়া ও তো পরশুই চলে আসছে।

টুলো শুক্রবারেই চলে এল। শনিবার রওনা হলাম আমরা চারজন। বেশ বেলা থাকতে থাকতেই পৌঁছে গেলাম আমরা তারাহাটে। তখনও গোরু চরে বেড়াচ্ছে মাঠেঘাটে।

এখানে এমন এক কাণ্ড করে বসল ভোম্বলদা, যা কোনোদিনও ভুলতে পারব না আমরা। রস খাওয়া তো মাথায় উঠল। ডাক্তার-ডাকা আর ওষুধের দোকানে সেকী ছোটাছুটি! লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা গেল সবার। তবে এটাও সত্যি ভোম্বলদা কিন্তু এর জন্যে ষোলোআনা দায়ী নয়। সে-কথায় পরে আসছি।

বেলায়-বেলায় পৌঁছে আমরা একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। গাছি গাছ কেটে হাঁড়ি বসিয়ে গেছে খেজুরগাছ দুটিতে। ভুলোর মামাদের দুটোই মাত্র খেজুর গাছ। তবে দুটো গাছ হলে কি হবে, রস হয় গাছে প্রচুর।

শীতকালের বিকেল। আয়ু আর কতক্ষণ! হাল্কা কুয়াশায় ঢাকা চরাচরের বুকে দেখতে দেখতে নেমে এল সন্ধ্যার ম্লান ছায়া। গাছগাছালির ছায়ায় কাটা-কাটা জ্যোৎস্নায় শুরু হল আলো-আঁধারির খেলা। দারুণ লাগছিল আমাদের। ভোম্বলদার সেকী আনন্দ!

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভোম্বলদা বলল— ভুলো, কতক্ষণ পরে রস খাওয়া যাবে রে?

—এই তো সবে গাছ কেটে হাঁড়ি বসিয়ে গেল গাছি। কম করে ঘণ্টা দুয়েক তো লাগবেই।

—দু-ঘণ্টা! বলিস কীরে! হতাশার সুর ভোম্বলদার কণ্ঠে।

—রসটা তো আর ঝরনার জলের মতন পড়ে না— ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে। তা দু-ঘণ্টা লাগবে না! বরং বেশিও লাগতে পারে। টুলো বলল।

—তুই থাম। যত নষ্টের মূল তুই। বাইরে যাওয়ার আর সময় পেলি না?

আমি বললাম—আর তো মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মামলা। চলো ততক্ষণে চা-টা খেয়ে নিই। আসার পর তো চা-ই খাওয়া হয়নি।

ভুলো বলল—তাই ভালো। সত্যি অনেক দেরি হয়ে গেছে। বড়মামি নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।

টুলো বলল—চল—চল। আর দেরি নয়। বড়মামির হাতের তৈরি খাবার দারুণ টেস্টি।

আমি বললাম—সেবার বড়মামি যে হালুয়া খাইয়েছিলেন, অত সুন্দর হালুয়া আমি জীবনে কখনও খাইনি। গরম লুচির সঙ্গে হালুয়া...

ভুলো বলল—এবার চায়ের সঙ্গে আরও অনেককিছু হবে।

— কেন, কেন? জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

—কালাচাঁদ এসেছে না?

—সেটা আবার কে রে? ভোম্বলদা হা করে ভুলোর মুখের দিকে তাকাল।

—বড়োমামার জামাই।

—বাড়িতে দেখিনি তো!

ভুলো বলল—দেখবে কী করে! ফান্টুসের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে।

—ফান্টুস! সে আবার কে?

টুলো বলল—ভুলোর মামাতো ভাই। যেমন বিচ্ছু তেমন রগুড়ে। তাই না রে হুলো?

—বাব্বাঃ, ওর কথা ভোলা যায় না। চিজ একখানা।

টুলো বলল—চলো ভোম্বলদা। কী সাঁঝের রস—সাঁঝের রস করছ। চায়ের সঙ্গে টায়ের ব্যবস্থা দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

—একথা আগে বলবি তো। নোলার জল টানতে টানতে ভোম্বলদা বলল, দারুণ খিদে লেগেছে। তাড়াতাড়ি চল।

চা-টা খাবার পর ব্যগ্র হয়ে ভোম্বলদা বলল—চল, একবার ঘুরে আসি।

—কোথায়? জিজ্ঞেস করল টুলো।

—কোথায় আবার? আসল জায়গায়। মানে সাঁঝের রস যেখানে।

ভুলো বলল—আধঘণ্টাও তো এখনও হয়নি ভোম্বলদা। তা ছাড়া অযথা ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার দরকার কী? গাছি তো রস পাড়ার আগে বাড়িতেই আসবে। তখন তার সাথেই যাব।

—তোরা ভীতু। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে তোদের এত ভয়!

—এটা কলকাতা নয়, পাড়াগাঁ। ভূত-টুতের ভয় আছে এখানে। বিশেষ করে জঙ্গল-টঙ্গলের মধ্যেই ওদের আড্ডা। গম্ভীর হয়ে বলল টুলো।

—ভূত! ভূত তোর মতন ভূতের কাছেই আসে। আমার কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। ভোম্বলদার মুখে বীরের হাসি। আমরা তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। বুঝলাম ভোম্বলদা রীতিমতো নাছোড়। সাঁঝের রসের কাছে যাবেই। তাই অগত্যা বাধ্য হয়ে পা বাড়ালাম আমরা পুকুরপাড়ের জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলের পথ গাছগাছালিতে ঢাকা। চাঁদের আলোর চিহ্ন নেই কোথাও। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে

যেদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু অন্ধকার। অন্ধকার আর অন্ধকার। দু-হাত সামনের জিনিসও দেখা যায় না। এরকম পরিবেশে অজ্ঞাতেই বুঝি গা ছমছম করে ওঠে। অন্ধকারের যবনিকা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলেছি আমরা চারজন। সামনে ভুলো আর সবার পেছনে টুলো। মাঝখানে বীরপুরুষ ভোম্বলদা আর আমি। যেতে যেতে হঠাৎ মজা করে টুলো বলল—এরকম অন্ধকার জঙ্গলেই ভূত-প্রেতের আবির্ভাব হয়।

—তুই থাম। গাঁক গাঁক করে উঠল ভোম্বলদা।

টুলো একধাপ এগিয়ে বলল—সত্যি বলছি ভোম্বলদা, ভূতেরা অনেক সময় কিন্তু রস-টসও খেতে আসে।

টুলোর কথা শেষ হতে-না-হতেই শুকনো পাতার উপর হাঁটার খসখস শব্দ উঠল।

—কীসের শব্দ রে হুলো? সাবু-খাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

—কীসের আবার! তাচ্ছিল্যের সুরে আমি বললাম, হয়তো জন্তু-জানোয়ারের হাঁটার আওয়াজ।

টুলো গম্ভীর হয়ে বলল—ভূত-টুতও হতে পারে।

—বলিস কী রে! বলে ভোম্বলদা আমায় জাপটে ধরল।

—কী করছ! ছেড়ে দাও। দম বন্ধ হয়ে যাবে যে!

কোনোক্রমে ভোম্বলদার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম। যেতে যেতে ভুলো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে দেখা দরকার। কিছু তো দেখারও উপায় নেই। ভোম্বলদা এমন তাড়া মারল যে টর্চটা আনতেও ভুলে গেলাম।

আমরা সবাই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। শব্দটা অবশ্য আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

আমরা আবার হাঁটা শুরু করে কিছুটা এগোতেই ফের ভুলো

বলল—ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

এবার ভোম্বলদা ছাড়া আমরাও কিন্তু ভয় পেলাম।

টুলো বলল—কেন রে? আবার কী হলো?

—ওই দিকে তাকিয়ে দ্যাখ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কোন দিকে? ভুলো বলল—ওই খেজুরগাছ দুটোর দিকে।

খেজুরগাছ দুটো ছিল পুকুরপাড়ের জঙ্গলের বাইরে মাঠের মধ্যে। কুয়াশাভরা আবছা জ্যোৎস্নার মধ্যেও গাছ দুটো দেখতে তেমন কোনো অসুবিধে হল না। খেজুরগাছের দিকে তাকিয়ে টুলোর আর আমার—দুজনেরই আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া। ভুলোও বেশ ভয় পেয়েছে মনে হল।

সে এক ভয়াল দৃশ্য। খেজুরগাছ দুটোর মাথায় বসান দুটো হাঁড়িরই সামনে দুটো ছায়া-ছায়া মূর্তি। মনে হচ্ছে মূর্তি দুটো একটু একটু দুলছে।

ভোম্বলদা এতক্ষণে কিছুই দেখতে পায়নি। তাই ভুলোর পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—কোথায় রে খেজুরগাছ দুটো?

—ওই তো বলে ভুলো হাত তুলে দেখাল।

ব্যস, একেবারে ধপাস। বাবা গো বলে ভোম্বলদা ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। আর ভোম্বলদার ওই চিৎকারের ঠেলায় খেজুরগাছতলাতেও ধপাস।

আমাদের তিনজনের অবস্থাই তখন কাহিল। এদিকে ভোম্বলদার দাঁত কপাটি লাগে লাগে অবস্থা। ওদিকে খেজুরগাছতলায় মা রে... বাবা রে... মরে গেলাম রে... বলে আর্তনাদ।

মাঠের মাঝখান দিয়ে আবার ছুটছে একটা ছায়া-মূর্তি।

হঠাৎ চোর... চোর... বলে চিৎকার করে খেজুরগাছতলার দিকে ছুটে গেল ভুলো। চোর... চোর... শোনার পর ভোম্বলদার ধরে প্রাণ

এল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ভোম্বলদা।

—সর্বনাশ হয়েছে। কাতর স্বরে বলে উঠল ভুলো। আমরা সবাই ঘাবড়ে গিয়ে ভুলোর কাছে ছুটে গেলাম।

সেকী কেলেঙ্কারি কাণ্ড! কালাচাঁদ— মানে ভুলোর বড়মামার জামাই গাছ থেকে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কোনোরকমে ধরাধরি করে তাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম আমরা। তারপর শুরু হল ডাক্তার-ডাকা আর ওষুধের দোকানে ছোটাছুটি। সাঁঝের রস খাওয়া মাথায় উঠল সকলের।

পরের দিন। কালাচাঁদ কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর যা বলল তার মানে মোটামুটি এই ঃ ধড়িবাজ ফান্টুসটা নাকি কালাচাঁদকে বলেছে যে ভোম্বলদা সাঁঝের রস খাওয়ার জন্যেই এখানে এসেছে। আর ভোম্বলদার পেট মানে একটা প্রকাণ্ড জালা। সুতরাং সাঁঝের রস তাদের কপালে ছিটে-ফোঁটাও জুটবে কিনা সন্দেহ। তা ছাড়াও ফান্টুস ওকে বুঝিয়েছে, গাছে উঠে রস খেতে নাকি দারুণ মজা। আর রসের টেস্টও ভাল পাওয়া যায়। তাই দুজনে মিলে পাটকাঠি দিয়ে রস খাওয়ার সময় ভোম্বলদার বিকট চিৎকারে কালাচাঁদ গাছ থেকে পড়ে যায়। আর ফান্টুস তরতর করে নেমে পালিয়ে যায়।

সব শোনার পর ভোম্বলদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী বুঝলি?

আমরা তিনজনেই বললাম—শুনলে তো তোমার পাবলিসিটি। এবার নিজেকে একটু কন্ট্রোল করো।

ভোম্বলদা আক্ষেপের সুরে বলল—তখন বলেছিলাম না আমার কপালটাই খারাপ!

টুলো বলল—কপাল-টপাল কিছু না। তুমি খাওয়ার লোভ আর ভূতের ভয়টা একটু কমাও। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বড়োমামার নির্দেশে তখনও কানে হাত দিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ফান্টুস।

ভোম্বলদার ভূত দর্শন

সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। আবছা অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে গোটা কলকাতা। যে কোনো মুহূর্তে আকাশের চৌবাচ্চাটা ফুটো হয়ে হড়হড় করে জল পড়তে পারে।

আমাদের তিনজনের মুখও ভার। আমাদের তিনজনের মানে—টুলো, ভুলো এবং আমার। আজ আমার ভেড়ির গোই খোলার দিন। আর আজই আমার সঙ্গে ওদের দুজনের ভেড়িতে যাওয়ার কথা। আগেই বলেছি, গোই হচ্ছে নদী থেকে ভেড়ি পর্যন্ত ছোটো একটা খাল। এই খাল দিয়েই জোয়ার-ভাটার জল ওঠা-নামা করে ভেড়িতে। খালেরই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁশের পাটা মেরে পাতা হয় মাছ-ধরার যন্ত্র। বাগদা চিংড়ির বাচ্চা ভেড়িতে ছাড়ার পর গোইয়ের মুখ আটকে জল ওঠা-নামা বন্ধ করে রাখা হয়। মাস তিনেক সময় লাগে প্রমাণ সাইজের বাগদা হতে। তাই তিন মাস পরে গোইয়ের মুখ খুলে সেখানে বিত্তি পেতে বাগদা ধরা শুরু হয়।

বাগদা সাধারণত ধরা পড়ে পূর্ণিমা আর অমাবস্যায়। আজ অমাবস্যার ভরা কোটাল। আমার ভেড়ির বাগদাও বেশ বড়ো হয়েছে। তাই আজই গোই খোলা দরকার। কিন্তু আকাশের চেহারা দেখে আমাদের তিনজনেরই মন খারাপ। যখন-তখন বৃষ্টি নামতে পারে। আর বৃষ্টি হলে সব মাটি হয়ে যাবে। ভুলো-টুলো দুজনেরই আর ভেড়িতে যাওয়া হবে না। ভেড়ির এঁটেল মাটির পাড় দিয়ে ওদের পক্ষে হাঁটা একেবারে অসম্ভব। তা ছাড়া বাগদাও বড়ো একটা ধরা পড়বে না। বেশি বৃষ্টি হলে বাগদা কম ধরা পড়ে।

আমার বাড়িতে বসে এই সব নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি সকাল তখন আটটা সাড়ে-আটটা হবে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ এসে হাজির হল মূর্তিমান ভয়ঙ্কর—মানে আমাদের ভোম্বলদা।

মূর্তিমান উগ্রমূর্তি ধারণ করে বাজখাঁই গলায় বলে উঠল—আমার সাথে চালাকি! তোরা ভেবেছিস কী মনে?

—কে করল আবার চালাকি? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—তোরা তিনজনেই।

—আমরা! বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি।

ভুলো বলল—ব্যাপারটা কী, আগে খুলে বলো তো।

—এর মধ্যে আবার খুলে বলার কী আছে রে? সিংহের মতো গর্জন করে উঠল ভোম্বলদা।

—তোমার ওই এক রোগ ভোম্বলদা। নিজে কোনোকিছু পরিষ্কার করে বলবে না, আর কারও কথা ঠিকমতন শুনবেও না। কথার মাঝখানেই চেঁচামেচি জুড়ে দেবে। বেশ ধমকের সুরেই কথাটা বলল টুলো।

টুলোকে বেশি ঘাঁটায় না ভোম্বলদা। বরং খাতির করেই চলে। সে-কথা আগেও বলেছি। এর কারণ আছে। টুলো যেমন মেধাবী তেমন বুদ্ধিমান। তা ছাড়া মনটাও দরাজ। হামেশাই ভোম্বলদাকে টুলোর শরণাপন্ন হতে হয়। তাই গলার স্বর বেশ নরম করেই ভোম্বলদা বলল—আমাকে ফেলে তোরা তিনজনে কী করে ভেড়িতে যাচ্ছিলি রে টুলো? তোদের প্রাণে কি একটুও দয়া-মায়া নেই রে?

—ওঃ, এই ব্যাপার! আমি বললাম, আকাশের এই অবস্থায় অমাবস্যার কোটালে তোমাকে নিয়ে আর কখনও যাই! আগের বারের কথা মনে নেই? বাপরে বাপ...

—চুপ কর। প্রথম-প্রথম সবারই ওরকম হয়। দাঁত খিঁচিয়ে উঠল ভোম্বলদা।

ভুলো বলল—আগের বারের কথা তো আমরা সবাই জানি। তাই আকাশের এই অবস্থা দেখে...

—রাখ তোর আকাশ। তুই আর টুলো যাচ্ছিস কী করে?

—আমরা যাব কি যাব না, তাই নিয়েই তো আলোচনা হচ্ছে।

—ও-সব আলোচনা-টালোচনা ছাড়, ভুলো। তোরাও যাবি, আমিও যাব। গোই খোলা জীবনে দেখিনি। এ সুযোগ কখনও ছাড়া যায়!

ভুলো বলল—তাই ভালো।

আমি বললাম—বেশ, চলো। তবে একটা কথা...

—এর মধ্যে কোনো কথা-টথা নেই। আমি যাবই যাব।

—এই তো তোমার দোষ ভোম্বলদা। টুলো বলল, একটু আগে এই কথাই বলছিলাম। হুলো কী বলতে চায়, কথাটা আগে শোনো।

—ঠিক আছে। কী বলছিস হুলো, বল।

আমি বললাম—এবার কিন্তু কোনো মাছ-টাছ পাবে না।

—কেন?

—এটা নিয়ম।

—নিয়ম! বুঝেছি।

—বোঝা-টোঝার কিছু নেই, ভোম্বলদা। প্রথম গোই খুলে কাউকে কোনো মাছ দেওয়া হয় না। এমনকী আমিও বাড়িতে নিয়ে যাব না। সব মাছই বাজারে বিক্রি হবে। এই নিয়মই চলে আসছে আজ পর্যন্ত।

—সেকী রে! আর বছর একটা মাছও বাড়িতে নিয়ে যেতে পারিনি। আর এবার তুই এই কথা বলছিস! দেখছি আমার কপালটাই খারাপ।

—কপাল তোমার খারাপ হবে কোন দুঃখে? সামনের কোটালেই তুমি মাছ পাবে।

—ঠিক তো?

—বেঠিক হবে কেন? সামনেই তো পূর্ণিমার কোটাল। তখন তুমি আমার সাথে ভেড়িতে যাবে।

—এই জন্যেই তো তোকে এত ভালোবাসি, হুলো। কী বুঝলি?

ভুলো, টুলো আর আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরই রওনা হলাম সবাই ভেড়ির উদ্দেশ্যে। শ্যামবাজার থেকে তিরানব্বই নম্বর বাসে চেপে চলে এলাম আমরা খড়িবাড়ির মাছের বাজারে।

বাগদার বাজার হিসেবে খড়িবাড়ি বিখ্যাত। এখানে অনেক ভেড়ির মাছ আসে। আসে আমার ভেড়ির মাছও। তাই ভেড়ির জিমনি গজুকে খড়িবাড়ির মাছের আড়তে থাকতে বলেছিলাম। খড়িবাড়ি থেকে ভেড়িতে যাওয়ার পথে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। এবারও ভোম্বলদাই 'হিরো' আর 'জিরো' যাই বলো, ঘটনার আসল ব্যক্তি। সে-কথায় পরে আসছি।

বেলায়-বেলায় আমরা খড়িবাড়ি পৌঁছলেও মেঘের চাপে বেলা কিন্তু পড়ে গেছে। গোটা তল্লাট জুড়ে যেন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া। বৃষ্টি না হলেও আকাশের অবস্থা যে-কে সেই। অর্থাৎ—মেঘাচ্ছন্ন।

আমাদের পৌঁছনোর আগেই গজু এসে আড়তে বসেছিল। আগের বার গজুর সঙ্গে ভোম্বলদার বেশ ভাব হয়েছিল। তাই দুজনে আড়তের এককোণে বসে গল্প জুড়ে দিল। আমিও ব্যবসার ব্যাপারে আলোচনা শুরু করলাম আড়তদারের সঙ্গে। ভুলো আর টুলো বসেছিল আমার কাছেই।

কিছুক্ষণ পরে ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—এখানে তোর আর কতক্ষণ লাগবে রে হুলো?

—কেন?

—গজু বলছে ওকে নাকি এক্ষুনি ভেড়িতে যেতে হবে। তুই বললে আমি ওর সাথে চলে যেতে পারি। তোরা তিনজন বরং কাজ সেরে পরে আয়।

গজুর সঙ্গে যেতে ভোম্বলদা বেশি উৎসাহী। তাই বললাম—ঠিক হ্যায়। তুমি গজুর সাথে বেরিয়ে যাও। আমরা একটু পরেই আসছি।

ভোম্বলদা আর গজু ভেড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশের চেহারা একেবারে পালটে গেল। সারা আকাশে কে যেন কালি লেপে দিল। আমরাও আর দেরি না করে ভেড়ির দিকে পা বাড়ালাম। ভেড়িতে আসার পথে যা শুনলাম তাতে আমরা তিনজনেই অবাক। সে-কথাই এখন বলব।

ভেড়িতে পৌঁছে দেখি ভোম্বলদা আর গজু খোস মেজাজে গল্প করছে।

—কী ব্যাপার? আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের খুব খুশি-খুশি মনে হচ্ছে?

গজু বলল—খড়িবাড়ি থেকে আসার সময় একখানা কাণ্ড হয়ে গেছে, বাবু।

—কী কাণ্ড? জিজ্ঞেস করল টুলো।

—তবে শুনুন। গজু বলল, খড়িবাড়ি ছেড়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছি আমরা, এমন সময় দেখি মেঘে-মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভালো করে পথ দেখাই যায় না। দু-হাত সামনের জিনিসও অস্পষ্ট। ঝোপে ঝোপে জোনাকির আলো। বিশ্রী সুরে পেঁচা ডেকে উঠল হঠাৎ। সেই সঙ্গে ঝিঁঝির ডাক। কেমন যেন একটা ভয়-ভয় ভাব। আপনা আপনি গা ছমছম করে ওঠে। আমি আর পালোয়ানবাবু ছাড়া পথে একটা লোকও নেই। দুজনে খুব আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছি। আগে আমি, পিছনে পালোয়ানবাবু। আমার হাতে টর্চ। দুজনে খুবই কাছাকাছি রয়েছি। বলতে গেলে প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করেই চলেছি। হঠাৎ শ্মশানের ধারে সেই বটগাছতলায় আসতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আছড়ে পড়ল আমাদের চোখে-মুখে। তারপর শুরু হল পাগলা হাওয়ার মাতামাতি আর পাশের ঝোপ থেকে নানারকম শব্দ। সেই সঙ্গে শেয়ালের মরাকান্না। থেকে-থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন। মাঝে মাঝে বাঁশঝাড় থেকে

বাঁশগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করছে। পালোয়ানবাবু ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। ভয় পাওয়ারই কথা। আমিও ভয় পেলাম বৈকি! তবে মুখে প্রকাশ করলাম না। কিন্তু... বলে গজু থামল।

ভুলো জিজ্ঞেস করল—কী হলো গজু? কিন্তু কী?

—তারপর যা ঘটল তাতে শুধু পালোয়ানবাবুর নয়, আমার রক্তও হিম হয়ে গেল।

—সেকী গো! এইটুকু সময়ের মধ্যে এত কাণ্ড! বিস্ময় প্রকাশ করল ভুলো।

—কাণ্ড মানে! শুনলে আপনারও আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হয়ে যাবে ভুলোবাবু।

টুলো বলল—তাহলে বলেই ফেল, গজু।

গজু বলতে লাগল—একে ঘোর অন্ধকার। তারপর হঠাৎই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের চোখে-মুখে। সেই সঙ্গে শেয়ালের মরাকান্না আর নানারকম শব্দ ভেসে আসতে লাগল ঝোপের মধ্যি থেকে। এই সব দেখেশুনে বুঝলাম এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়া ভালো। ঊর্ধ্বশ্বাসে দুজনে এগিয়ে চলার চেষ্টা করলাম আপ্রাণ। এখনও অনেকটা পথ বাকি। তাড়াতাড়ি যেতেই হবে। কুইক মার্চ। কিন্তু কোথায় কুইক মার্চ, আর কোথায় কী! ঠাণ্ডা... একেবারে ঠাণ্ডা।

—তার মানে? জিজ্ঞেস করল ভুলো।

—মানে আমাদের দুজনের পা আর তেমন চলছে না। বলতে গেলে প্রায় থেমেই গেল।

—কেন, কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ভুলো।

—সে কী আর বলব বাবু! সবে শ্মশানটা পেরিয়েছি... গজু একটু থেমে বলল, হঠাৎ আমাদের পিছনে কে যেন হাঁটতে শুরু করল। আমাদের দুজনের অবস্থাই তখন কাহিল। দুজনেই ঠকঠক করে কাঁপছি। সারা শরীরে যেন বল নেই। পা ভারী হয়ে যাচ্ছে। চলার

শক্তিও প্রায় নেই বললেই হয়। মুখ দিয়ে কথাও বেরোচ্ছে না। বুঝলাম এখানটা তো তেনাদেরই দখলে। তেনাদেরই একজন বোধহয় পিছন নিয়েছেন। পিছন থেকে ঘাড় মটকে দিলেই তো শেষ। তাই কোনোক্রমে পালোয়ানবাবুকে বললাম, 'রাম' নাম করুন। বহু কষ্টে পালোয়ানবাবুর মুখ দিয়ে কথা বেরোল। উনি আমায় বললেন—মন্তর পড়ো। মন্তর-টন্তর তখন আমি ভয়ে ভুলে গেছি। যা হোক, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে আমরা এগোচ্ছি। তিনিও আস্তে আস্তে পিছন-পিছন আসছেন। না, এভাবে চলা যায় না। তাই পালোয়ানবাবুকে বললাম—পালোয়ানবাবু, কপালে যা আছে তাই হবে। দেখি...

গজুর কথা শেষ হওয়ার আগেই ভোম্বলদা বলে উঠল—দেখি বলে ঘুরে গজু টর্চের আলোটা পিছনে ফেলল। ব্যস, তারপর... ভোম্বলদা চুপ।

—তারপর কী? জিজ্ঞেস করলাম আমরা সবাই।

—ভোম্বলদার সেই 'হিরো-হিরো' ভাব। মুখে শুধু তারপর... তারপর...

—ধ্যাত্তোর, শুধু তারপর... তারপর। বলতে হয় বলো, না হলে গজুর কাছ থেকে শুনি। টুলো বলল।

—তবে শোন। গজু পিছন দিকে টর্চের আলো ফেলতেই দেখলাম... ভোম্বলদা আবার থামল।

—কী দেখলে? এবারও আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম।

—কুকুর। উনি আমাদের দেখে আনন্দে ল্যাজ নাড়ছেন।

—কুকুর! অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমরা।

—হ্যাঁ রে। হুলোর ভেড়ির কুকুরটা আমাদের পিছন-পিছন আসছিল। আর ওকে দেখার পরই আমার ভয়-টয় একেবারে হাওয়া।

—তারপর কী করলে? ভুলো জিজ্ঞেস করল।

আবার কী! হন-হন করে বুক ফুলিয়ে ভেড়িতে চলে এলাম।

টুলো বলল—তোমাকে তো অনেকবারই বলেছি ভোম্বলদা, ভূত-

টুত বলে কিছু নেই। ওসব আমাদের মনের ভুল।

—ঠিকই বলেছিস টুলো। ভয় মনে করলেই ভয়। তবে আর কোনোদিন ভূতের ভয় পাব না।

—খুব ভালো কথা। তবে অত চেঁচামেচি করলে কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—তোরা কী করে জানলি?

—আসার সময় নগেনবাবুর ভেড়ির লোকেরা বলছিল।

—আসলে কুকুরটাকে দেখার পর আমরা দুজনেই আনন্দে হইহই করেছিলাম। তাই পাশের ভেড়ির কিছু লোকজন ছুটে এসেছিল। তাদের বললাম, এইভাবেই তো লোকে ভয় পায়। তারপর জ্ঞান দিলাম সবাইকে।

—দেখলে তো ভোম্বলদা, এবারও সেই অমাবস্যায় এসে এক কাণ্ড করে বসলে।

—একে তুই কাণ্ড বলছিস! সত্যি হলো, তোর ভেড়িতে এবার এসে আমার দারুণ লাভ হল। ভূতের ভয়টা কেটে গেল।

—ভালোই হল। আমি বললাম, সবাই তোমার প্রশংসা করছিল।

—সত্যি?

—সত্যি। মিথ্যে কেন বলব? এবার তো তুমি হিরো।

ভোম্বলদা যেখানে যায় সেখানেই কিছু-না-কিছু কাণ্ড ঘটায়। ফলে বারবারই আমাদের মাথা নিচু হয়েছে। এবার এই প্রথম ভোম্বলদার জন্যে আমাদের মাথা উঁচু হল। আমরা সবাই মিলে তাই আনন্দে হিপ-হিপ-হুররে—ভোম্বলদা জিন্দাবাদ বলে উঠলাম।

ভোম্বলদা একেবারে আনন্দে আত্মহারা।

গজুও বলল—মন্তর-টন্তর সব বাজে কথা। ভূত মনের ভয় ছাড়া কিছু নয়।

টুলো বলল—সবই বুঝলাম গজু, তবে আমার মনে হয় তোমার আর ভোম্বলদার ভূতের ভয় এখনও আছে।

গোয়েন্দা ভোম্বলদা

বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে ছুঁই-ছুঁই, আমরা তখন কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়। লেখালেখি শুরু করার পর থেকে আমরা প্রায়ই কলেজ স্ট্রিটে আসি। এ-ব্যাপারে ভোম্বলদার উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। কারণ, তার একটি কবিতার বই বাজারে বেরিয়েছে। আমাদের কারওরই কোনো বই এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তবে খুব শিগগিরি প্রকাশিত হবে—সেই আশায় এত ঘন-ঘন আসা।

আজ এসেছি আমরা পাঁচজনই—ভোম্বলদা, ভুলো, টুলো, ঢোল গোবিন্দ আর আমি।

বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ঢোল গোবিন্দ বলল—ভোম্বলদা, তোমরা কফিহাউসে বসো। আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি।

—যাচ্ছিস কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—একজন প্রকাশকের কাছে।

ভোম্বলদা বলল—কফিহাউসের ওই গ্যাঞ্জাম আর বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া একেবারে অসহ্য। তা ছাড়া আজকাল আগের মতন খাবারও পাওয়া যায় না। আর সেই পরিবেশও এখন আর নেই।

—তা হলে কোথায় বসবে?

—আমরা যেখানে বসি—অর্থাৎ বসন্ত কেবিনে।

—ভাবলাম আজকে একটু ভালো জায়গায় বসব। বেজার মুখে বলল ঢোল গোবিন্দ, তা-না সেই বসন্ত কেবিন। ওটাই বা কী এমন আহামরি জায়গা! ওখানকার অবস্থাও তো তথৈবচ।

—তবুও মন্দের ভালো। ভোম্বলদা বলল, তুই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে আয়। তারপর ভালো জায়গায় বসা যাবে।

ঢোল গোবিন্দ চলে গেল। আমরা বসন্ত কেবিনের দিকে পা বাড়ালাম।

বসন্ত কেবিনে ঢুকেই টোস্ট আর চায়ের অর্ডার দিল ভোম্বলদা। অর্ডার সব জায়গায় ভোম্বলদাই দেয়, কিন্তু পয়সা দিতে হয় আমাদের। সে-দুঃখের কথা অযথা বলে আর লাভ কী! তাতে আমরাই মনে কষ্ট পাব।

টোস্ট এল টেবিলে। এমন সময় ঢোল গোবিন্দ এসেও হাজির হল। খেতে খেতেই ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার? তোর এত দেরি হল কেন রে ঢোল গোবিন্দ?

ভোম্বলদার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ঢোল গোবিন্দ ভুরু নাচিয়ে এমন ভাবে হাসতে লাগল যেন সে বিরাট কিছু জয় করে ফিরে এসেছে।

—একে তো এলি লেট করে, তারপর আবার হাসছিস? দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল ভোম্বলদা, তুই ভেবেছিস কী মনে?

ঢোল গোবিন্দ স্পীকটি নট। মুখে শুধু হাসি। ভোম্বলদা আরও রেগে গেল।

ভুলো বলল—আসলে ব্যাপারটা কী খুলে বল তো ঢোল গোবিন্দ। তখন থেকে শুধু হেসেই চলেছিস।

—আছে, আছে—ব্যাপার আছে। ঢোল গোবিন্দর আবার হাসি।

—আছে, আছে। কী আছে রে? ভেংচি কাটল ভোম্বলদা।

টুলোও বেশ বিরক্ত হয়ে বলল—তুই থাম তো ঢোল গোবিন্দ। তোর স্বভাব কোনোদিন পালটাবে না দেখছি। সব সময়ই তোর খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। সাধে কি আর তোর নাম শুধু গোবিন্দ থেকে ঢোল গোবিন্দ হয়েছে! ভনিতা ছেড়ে কাজের কথা বল।

—সে-কথা শুনলে ভোম্বলদা রেগে যেতে পারে।

আমি এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলাম। আর থাকতে পারলাম না। বললাম—যে কথা শুনলে ভোম্বলদা রেগে যেতে পারে সেই কথা মনে করে তুই হেসেই চলেছিস! তোর ব্যাপারটা কী বল তো?

—আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে... ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকাল ঢোল গোবিন্দ।

সাপের মতো ফোঁস করে উঠল ভোম্বলদা—কী আরম্ভ করেছিস, ঢোল? চালাকি করছিস? প্রকাশকের সাথে দেখা করে এসে চালাকি শুরু করে দিলি? মনে হচ্ছে তোর বইটা যেন এক্ষুনি বাজারে বেরিয়ে পড়বে।

—সে তুমি যা-ই বলো, বইটা আমার খুব শিগগিরি বেরিয়ে যাবে। তবে তুমি তোমার বই ছাপতে গিয়ে ভীষণ ঠকে গেছ।

—অ্যাঁ! বিষম খেল ভোম্বলদা।

—সত্যি বলছি। সেই কথা ভেবেই তো আমি হাসছি। তোমাকে ঠকিয়েছে—এ-কথা যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

—আমি যে ঠকেছি, তুই তা বুঝলি কী করে?

—প্রকাশকের কাছ থেকে কোটেশন নিয়ে। তোমার কবিতার বই পাঁচ ফর্মার—আমারও তাই। সাইজও এক। কাগজও এক। তোমার কত খরচ হয়েছে তা তো আমাদের বলেছ। প্রকাশক যা হিসেব দিলেন তাতে দেখা গেল তোমার বইয়ের অর্ধেকেরও কম খরচে আমার বই বেরিয়ে যাবে।

—প্রকাশক নিজের পয়সায় বই ছাপেন। খরচের হিসেব তোকে দেবেন কেন? লেখক তো স্রেফ পঁচিশ কপি বই আর রয়্যালটি পায়।

—কথাটা ঠিক। আর এটাই নিয়ম। তবে নিয়মের বাইরেও তো অনেক ব্যাপার থাকে।

টুলো কিছুটা উত্তেজিত হয়েই জিজ্ঞেস করল—ব্যাপারটা কী, শুনি।

—আসলে দুই শ্রেণির প্রকাশক আছে কলেজ স্ট্রিটে। তোরা এক শ্রেণির কথাই জানিস। আমি যাদের কথা বলছি তারা লেখকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বই ছাপে। বই বিক্রি করে লেখকের সব টাকা ফেরত দেয়। আর লেখক যত বই চাইবে তত বই-ই পেয়ে যাবে।

—যত মানে কত? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—একশো-দুশো যা চাওয়া যাবে। তোর যত বই ছাপা হবে, তার মধ্যে দরকার মতো যা চাইবি পেয়ে যাবি।

—এরকম প্রকাশকও আছে নাকি! বিস্ময় প্রকাশ করল টুলো।

—আছে, আছে। সব খোঁজ রাখতে হয়।

ভোম্বলদাকে খুবই বিমর্ষ দেখাল। তাই টুলো আর কথা বাড়াল না। টাকা-পয়সার ব্যাপারে রীতিমতো সচেতন ভোম্বলদা। ষোলোআনার জায়গায় বত্রিশআনা হিসেবি। একনম্বরের কিপটে। মানে হাড়কিপটে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে ঠকাতে পারেনি। এ হেন ভোম্বলদা ঢোল গোবিন্দর কথায় খুবই মনমরা হয়ে পড়ল। বলল—তোর প্রকাশক কে রে?

আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঢোল গোবিন্দ বলল—গঙ্গা-যমুনা।

—বেশ নাম তো! ভোম্বলদা মনমরা অবস্থায়ও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, দুটো নদীকে এক করে ফেলেছে। আজকাল অবশ্য এই ধরনের নাম প্রায়ই দেখা যায়।

—এরকম কোনো প্রকাশকের নাম তো শুনিনি। টুলো বলল, নিশ্চয়ই একেবারে আনকোরা সংস্থা।

—না-না, আনকোরা নয়। অনেক বই বেরিয়েছে গঙ্গা-যমুনা থেকে। তা ছাড়া এই নামে ওঁদের একটা মাসিক পত্রিকাও আছে।

ভুলো বলল—তুই এই সব খবর কোত্থেকে পাস রে ঢোল গোবিন্দ?

ঢোল গোবিন্দ একটু হাসল। আজ যেন ওর হাসবারই দিন। ঠিক হল আমরা তক্ষুনি গঙ্গা-যমুনায় যাব।

সন্ধে হয়ে গেছে। রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে পা বাড়ালাম সবাই গঙ্গা-যমুনার দিকে। যেতে যেতে ভোম্বলদা বলল—কার মুখ দেখে যে ঘুম থেকে উঠেছিলাম আজ! তবে আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।

গঙ্গা-যমুনায় বসে আলোচনা শুরু করলাম আমরা। জানালাম আমরাও এখান থেকে বই প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। আমাদের বেশ আদর-আপ্যায়ন করে ভদ্দরলোক জানালেন তিনি সরকারি চাকরি করেন। তাই স্ত্রীর নামে সবকিছু। নিজের বাড়ি-ফোন সবই আছে। আমাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। শেষে এ-ও জানালেন যে তাঁর একটি পুরস্কার-কমিটি আছে। তাঁদের ওখান থেকে বই বেরোলে ভবিষ্যতে পুরস্কারের ব্যবস্থাও তিনি করে দিতে পারবেন।

একে এত কম টাকায় বই বের হবে, তার উপর আবার পুরস্কারপ্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে, তারও উপর ওঁদের পত্রিকায় আমাদের লেখাও প্রকাশিত হবে—এ যে চিন্তার বাইরে! আমরা সবাই অবাক। ঢোল গোবিন্দকে বাহবা জানালাম। ব্যাটা বেশ চালু তো। তলে-তলে এত খবর রাখে! দেখলাম সত্যি ঢোল গোবিন্দর ঢোল পেটানো মিথ্যে নয়।

গঙ্গা-যমুনা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম। ভোম্বলদার মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—আমার নাম ভোম্বল ঘোষ। সারা কলকাতা চষে বেড়াই আমি। টালা টু টালিগঞ্জ, বালি টু বালিগঞ্জ—এমন কোনো মিঞা নেই যে আমাকে ঠকায়। আর শেষ পর্যন্ত আমাকেই যক দিল! আমিই যক খেলাম ওই ছোঁড়াটার কাছে! দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

আমি বললাম—তোমার বই তো বেরিয়েছে অনেক দিন আগে। এখন আর এ নিয়ে ঝামেলা করে লাভ কী?

—লাভ কী মানে? চোখ পাকিয়ে ভোম্বলদা বলল, টাকা আদায় করে ছাড়ব।

—এতদিন পরে কি কেউ টাকা ফেরত দেয়?

—ওর ঘাড় দেবে। ভক্তিকে কি আমি সহজে ছেড়ে দেব!

টুলো জিজ্ঞেস করল—ভক্তিটা আবার কে?

ভোম্বলদা গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলল—আরে ওই ব্যাটা প্রেসঅলা—মানে প্রেসের মালিক। ওই তো বইটা ছেপেছে। আমাকে যক মারার ফল হাড়ে-হাড়ে টের পাবে বাছাধন। এবার বুঝবে ভোম্বল ঘোষ কী জিনিস।

পরের দিন। বেলা তখন সাতটা। ভোম্বলদা আমার বাড়িতে এসে হাজির। সঙ্গে ঢোল গোবিন্দ।

—কী ব্যাপার, ভোম্বলদা? আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা দুজনে কোথাও যাচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ। তুইও আমাদের সাথে যাবি।

—কোথায়?

—ভক্তির প্রেসে।

—এই সাতসকালে!

—হ্যাঁ। এই সাতসকালে গিয়েই ব্যাটাকে ধরব। ও তো প্রেসেই থাকে। দেরি কেরে গেলে বেরিয়ে পড়তে পারে। জানিস হুলো, সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি।

—যা হওয়ার হয়ে গেছে। কেন তুমি সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা খারাপ করছ, ভোম্বলদা?

—বলিস কী রে! এটা সামান্য ব্যাপার? তুই চটপট তৈরি হয়ে নে। দ্যাখ না কী করি আমি আজ ওকে। আভি তো খেল শুরু হোগা। এখনই তো শুরু হবে আসল খেলা।

বুঝলাম ভক্তির কপালে দুঃখ আছে।

ভক্তির প্রেসে বেলা আটটা নাগাদ আমরা তিনজনেই এসে হাজির হলাম। ভক্তি তো এত সকালে আমাদের দেখে অবাক।

—কী ব্যাপার, ভোম্বলদা? ভক্তি জিজ্ঞেস করল, কোনো আর্জেন্ট

কাজ আছে নাকি?

—কাজ নেই, কথা আছে।

—কথা পরে শুনব। আগে চা-টা খান।

—না, খেতে আমি আসিনি। গম্ভীর হয়ে ভোম্বলদা বলল, তুমি আগে কথা শোনো।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভক্তি বলল—বলুন তা হলে।

ভোম্বলদা বলল—তুমি তো ভালো করেই জানো যে তোমাকে আমি নিজের ছোটোভাইয়ের মতন স্নেহ করতাম।

—বিলক্ষণ। আমিও তো আপনাকে নিজের বড়ো ভাইয়ের মতনই ভক্তি করি।

—ভক্তি-টক্তি তুমি মোটেই করো না। নামেই তুমি ভক্তি, কাজে নও।

—এ কী কথা বলছেন আপনি, ভোম্বলদা?

—ঠিকই বলছি। যে যাকে ভক্তি করে সে কি তাকে ঠকায়?

—তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আপনাকে আমি ঠকিয়েছি।

—আলবাৎ। সাপের মতো ফোঁস করে উঠল ভোম্বলদা, তুমি কি মনে করো, আমি ক-অক্ষর-গোমাংস? বই ছাপার ব্যাপারে কিছুই বুঝি না?

—আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ব্যাপারটা খুলেই বলুন না, ভোম্বলদা।

—তবে শোনো। তোমার সাথে আমার বহুদিনের পরিচয়। আর সেই জন্যেই তোমার কাছে আমার কবিতার বইটা ছাপতে দিয়েছিলাম। তুমি বলেছিলে খুব কম খরচে আমার বইটা করে দেবে। কথাটা তাই হয়েছিল তো?

—হ্যাঁ। আমি বাজার থেকে অনেক কম রেটে আপনার কাজ করে দিয়েছি।

—মিথ্যে কথা। তুমি অনেক বেশি টাকা আমার কাছ থেকে নিয়েছ।

—না, আমি নিইনি।

—যদি প্রমাণ করতে পারি তুমি নিয়েছ, তা হলে...

—সব টাকা ফেরত দেব। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল ভক্তি।

—ঠিক আছে। কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল ভোম্বলদা।

প্রেস থেকে বেরিয়ে ভোম্বলদা বলল—ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে রে হুলো।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমি বললাম, তা না হলে ভক্তির এই চ্যালেঞ্জের সাহস আসে কোত্থেকে? ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

ঢোল গোবিন্দ বলল—এতে সন্দেহের কী আছে? ব্যাপারটা তো জলের মতন পরিষ্কার। গঙ্গা-যমুনা তো ওই টাকায় বই বের করে দেবে বলেছে।

আমি বললাম—চকচক করলেই সোনা হয় না, ঢোল গোবিন্দ।

—অতশত বুঝি না। আমরা সবাই তো গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে আলোচনা করলাম।

আমাদের দুজনের কথার মাঝখানে হঠাৎ ভোম্বলদা বলে উঠল—তোরা চুপ কর। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। চল, কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় আগে যাই।

—তারপর? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—তারপরই তো হবে আসল খেলা।

ট্রামে চেপে আমরা পৌঁছলাম কলেজ স্ট্রিটে। ভোম্বলদা তার প্ল্যানটা আমাদের দুজনকে বুঝিয়ে দিল। আমরা অবাক। এ ভোম্বলদা তো সে ভোম্বলদা নয়। এ যেন অন্য ভোম্বলদা—রীতিমতো এক পাকা গোয়েন্দা।

ভোম্বলদার প্ল্যানমতো প্রথমে আমরা পা বাড়ালাম কাগজের

দোকানের দিকে। বড়ো বড়ো পা ফেলে ভোম্বলদা আমাদের থেকে বেশ খানিকটা আগে আগে চলেছে। যেতে যেতে ঢোল গোবিন্দ আমাকে ফিসফিস করে বলল—জানিস হুলো, ভোম্বলদা রেগুলার শার্লক হোমস পড়ে। এবার তো ওর ডিটেকটিভ গল্পের বই বেরোবে।

আমিও ফিসফিস করে বললাম—আশ্চর্য! ভোম্বলদা তো কোনোদিন এ-কথা বলেনি আমাদের। তুই জানলি কী করে?

ঢোল গোবিন্দ বলল—তুই আবার এ-কথা ভোম্বলদাকে বলিস না যেন। দিনকয়েক আগে হঠাৎ একদিন ভোম্বলদার বাড়িতে যাই। গিয়ে দেখি ভোম্বলদা লিখছে—আর পাশে রয়েছে একগাদা শার্লক হোমস গোয়েন্দা কাহিনি। তখনই ভোম্বলদা আমাকে বলল এবং বারণ করে দিল কাউকে যেন না বলি। তবে হ্যাঁ, এ-কথাও বলল যে বাস্তবে এত গোয়েন্দা কাহিনি আছে যে কল্পনার দরকার হয় না। আর ভোম্বলদা বাস্তব-কাহিনি নিয়েই লিখবে।

কাগজের দোকানের কাছে আসতেই ভোম্বলদা পিছন ফিরল। আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম।

কয়েকটা দোকান থেকে আমরা কাগজের দাম জেনে নিলাম। তারপর ছুটলাম প্রেসের দিকে। সেখান থেকেও কোটেশন নিলাম। বাইন্ডিং-কস্ট্ জানার জন্যে গেলাম বাইন্ডারের কাছে। একেবারে শেষে গেলাম ব্লকমেকারের কাছে। ব্লকের দাম জেনে আমরা হিসেবে বসলাম।

কিন্তু একী! খরচ যে গঙ্গা-যমুনার কোটেশনের ডবল-এর বেশি। এমনকী ভক্তির চেয়েও কিছুটা বেশি। তবুও ভক্তিরটা কাছাকাছি।

বেজার মুখে ঢোল গোবিন্দ বলল—নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। তোমার প্ল্যানমতো কাজ হলে মনে হয় সব রহস্য বেরিয়ে যাবে, ভোম্বলদা।

—তা হলে চল এবার গঙ্গা-যমুনায়।

গঙ্গা-যমুনায় পৌঁছে তার প্রকাশিত বইগুলো দেখতে চাইল ভোম্বলদা। একটা বইয়ে কী যেন মনোযোগ দিয়ে দেখল। পরে আসব বলে বেরিয়ে এলাম আমরা সেখান থেকে।

আবার এলাম আমরা ভক্তির প্রেসে। প্রেসে ঢুকেই ভোম্বলদা ভক্তিকে জড়িয়ে ধরে বলল—তুমি নির্দোষ। কম টাকায় আমার বই বের করে দিয়েছ। কিন্তু একটা জিনিস যে তোমাকে জানাতে হবে, ভক্তি।

—বলুন, ভোম্বলদা।

—গঙ্গা-যমুনা কী করে অত সস্তায় বই বের করে?

ভোম্বলদার প্রশ্নে অবাক হলাম আমরা। ভক্তি কী করে জানবে গঙ্গা-যমুনার কথা। এ তো অদ্ভুত গোয়েন্দাগিরি ভোম্বলদার!

ভক্তি বলল—আমি কী করে বলব?

—তুমিই বলতে পারবে ভক্তি। বেশ গোয়েন্দা ঢং-এ ভোম্বলদা বলল, সেই জন্যেই তোমার এখানে ছুটে আসা। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবে ভাই।

ভক্তি কেমন যেন আমতা-আমতা করছে দেখে ঢোল গোবিন্দ আর আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

ভোম্বলদা আবার বলল—তুমিই পারো ভাই, এই রহস্য ফাঁস করতে।

ভক্তি বলল—ব্যবসার তো একটা নীতি আছে, ভোম্বলদা! কাস্টমারের গোপন ব্যাপার কি ফাঁস করা উচিত?

—সাধারণত উচিত নয়। কিন্তু তখনই উচিত যখন সেটা দশজনের ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা আমার তাই মনে হচ্ছে এখন।

—ঠিকই ধরেছেন। আর এই জন্যেই আমি ব্যাপারটা ফাঁস করছি। সত্যি-ই গঙ্গা-যমুনা বহুলোককে এই ভাবে ঠকিয়ে চলেছে। আর এই নোংরামির জন্যেই ওদের কাজ আমি আর করি না।

ঢোল গোবিন্দ আর আমি অবাক। সত্যি গোয়েন্দাগিরিতে ভোম্বলদার কেরামতি আছে। ব্যাপারটা ঠিক ধরে ফেলেছে তো!

ভক্তি আসল রহস্য ফাঁস করল—লেখকদের কাছ থেকে এগারোশো কপি বই ছাপার টাকা নেয় গঙ্গা-যমুনা। ছাপে বড়জোর দেড়শো থেকে দুশো কপি। ব্যস, আসল কারসাজি সেখানে। সেই জন্যেই রেটের বাইরে অনেক কম টাকা নেয়।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—সেটা কী করে সম্ভব? লেখক যখন বইয়ের হিসেব চাইবে তখন কী হবে?

—ওরা খুব ভালো করেই জানে যে নতুন লেখকদের বই তেমন বিক্রি হয় না। ভক্তি বলল, লেখককে পঞ্চাশ থেকে একশোখানা বই দিলেই কাজ হাসিল। ওই বইগুলোই তখন লেখকের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কজনের আর বেশি বই বিক্রি করার সোর্স আছে? ফলে পাঁচ-দশ কপি বিক্রি করার পর বাকি সব বই ঘরে পড়ে থাকে।

—একেবারে কারও যে তেমন সোর্স নেই, এ-কথাও তো বলা যায় না। কারও কারও থাকতেও পারে। আমি বললাম, তখন কী করবে ওরা?

—তখন ধরা পড়বে।

ভোম্বলদা বলল—আজ পর্যন্ত ধরা-টরা পড়েছে কি?

—মনে হয় পড়েছে। ভক্তি বলল—একজন লেখিকাকে একশো বই দিয়েছিল। তাঁর খুব সোর্স ছিল। তিনি চার-পাঁচদিনের মধ্যেই সব বই বিক্রি করে ফেলেছেন। বলতে গেলে প্রায় রোজই এখন ওদের পিছনে ঘুরছেন বইয়ের জন্যে।

—বই আর পাচ্ছেন না তো?

—পাবেন কী-করে? ছেপেছিল তো মাত্র দেড়শো। ওই বইটা আমার প্রেসেই ছাপা হয়েছিল।

—লেখিকার নাম কী?

—ইলা মজুমদার।

—ওনার ঠিকানাটা জোগাড় করতে পারো, ভক্তি?

—আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব, ভোম্বলদা।

—প্লিজ ভক্তি।

আপনি যখন বলছেন তখন আমি চেষ্টার কোনোরকম ত্রুটি করব না। কথা দিলাম।

—থ্যাঙ্ক য়্যু ভক্তি, থ্যাঙ্ক য়্যু। আনন্দে উচ্ছ্বাসে বলে উঠল ভোম্বলদা, তুমি আজ আমাদের দারুণ উপকার করলে।

ঢোল গোবিন্দ আর আমি ভোম্বলদাকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি ভক্তিকে ধরার ক্লু পেলে কী ভাবে? জানলে কী করে যে ভক্তি গঙ্গা-যমুনার কাজ করত?

হাসতে হাসতে ভোম্বলদা বলল—গঙ্গা-যমুনায় গিয়ে ওদের বইয়ে প্রিন্টারের নাম যখন দেখছিলাম তখনই ভক্তির নাম চোখে পড়ে। কী বুঝলি?

আমি বললাম—বুঝলাম তুমি শার্লক হোমস হতে চলেছ।

ভক্তি বলল—তাহলে আপনাকে আরও একটু খাটাখাটনি করতে হবে, ভোম্বলদা।

—কেন?

—ওদের এই গঙ্গা-যমুনা পত্রিকা-পুরস্কার আর বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থের মধ্যেও অনেক রহস্য আছে।

—কী রকম? জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

—বই ছাপার মতনই ব্যাপারটা।

—তার মানে চিটিংবাজি?

—চিটিংবাজি তো বটেই। ভক্তি বলল, তা ছাড়াও অনেক ব্যাপার আছে, ভোম্বলদা।

—তাহলে সব বলে ফেলো।

—পুরো ব্যাপারটা আমি এখনও জানতে পারিনি। কিছুটা জেনেছি। বাকিটা দু-চারদিনের মধ্যেই জানতে পারব।

—যতটা জানো ততটাই বলো।

ভক্তি বলল—পুরস্কার আর ওদের পত্রিকায় লেখা ছাপার লোভ দেখিয়ে নতুন লেখক-লেখিকাদের কাছ থেকে মোটা টাকা নেয় বই ছাপার জন্যে। বই কত ছাপে সে-কথা তো আগেই বলেছি। পুরস্কারের জন্যে আবার আলাদা টাকা নেয়। সে-ব্যাপারেও লোক ঠকায়। সন্ধের পর নাকি ওদের বাড়িতে অনেককিছু হয়। এরকম আরও অনেক ব্যাপার আছে। সে-সব না-বলাই ভালো।

—তুমি এটা নিয়ে উঠেপড়ে লেগে যাও, ভক্তি। আমি আছি তোমার সাথে। সাহিত্যের আঙিনায় এ-সব আগাছা আমি উপড়ে ফেলবই।

—আমার ষোলোআনা সহযোগিতা পাবেন, ভোম্বলদা। গঙ্গা-যমুনার মুখোশ আমি খুলে দেব। ওরা পুরো দু-নম্বরি।

ভোম্বলদা বলল—এই ঢোল গোবিন্দ, জোর বেঁচে গেছিস। যা—পঞ্চাশ টাকার মিষ্টি নিয়ে আয়।

বেজার মুখে ঢোল গোবিন্দ মিষ্টি আনতে গেল।

ভোম্বলদা আবার বলল—ভক্তি, সত্যিই তোমার নামের সাথে কাজের মিল আছে। তুমি দেখে নিও—আমি গঙ্গা-যমুনাকে সহজে ছেড়ে দেব না। এই চিটিংবাজির ফল ওকে পেতেই হবে।

মিষ্টি আসতে ভক্তিকেই বেশি করে মিষ্টি খাওয়াল পেটুক ভোম্বলদা। তারপর আমাদের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—পুরো মিষ্টিটাই তো ভক্তির প্রাপ্য। কী বুঝলি?

মুখে কিছু না বলে মনে-মনে আমি বললাম—সত্যি ভোম্বলদার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসছে। কী করে কাজ হাসিল করতে হয়, বুঝে ফেলেছে।

ভক্তি তখন খুশিতে ডগমগ।

ভেড়িতে শিকার

শিকার! শিকার! বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ক্লাবে ঢুকল ঢোল গোবিন্দ। আমরা সবাই অবাক। আমরা সবাই মানে আমরা চারজন—ভোম্বলদা, ভুলো, টুলো আর আমি।

সবার আগে ভুলো বলে উঠল—যাক, শেষ পর্যন্ত তা হলে স্বীকার করেছে ওরা।

—না-করে যাবে কোথায়? ভোম্বলদাও তাড়াতাড়ি হিরো-হিরো ভাব দেখিয়ে বলল, আমার নাম ভোম্বল ঘোষ। আমি কি অত সহজে ছেড়ে দেব ওদের! স্বীকার করুক আর নাই করুক—শাস্তি ওদের পেতেই হবে।

আমি বললাম—ছি-ছি! ওরা কি মানুষ!

টুলো বলল—ওই গঙ্গা-যমুনা তো! সত্যি সাহিত্যের আঙ্গিনায় ওরা স্রেফ জঞ্জাল ছাড়া কিছু নয়।

ভোম্বলদা আবৃত্তির সুরে বলল—'যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ / প্রাণপণে সরাব সাহিত্যের জঞ্জাল।'

হো-হো করে হেসে উঠল ঢোল গোবিন্দ।

—হাসলি কেন রে? দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল ভোম্বলদা।

ঢোল গোবিন্দর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই দেখে আমারও গা জ্বলে উঠল। রীতিমতো খেঁকিয়ে উঠলাম—তোর লজ্জা করে না? দু-দিন আগেও তো কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় এমনি করে হেসেছিলি। ভোম্বলদাই গোয়েন্দার ভূমিকায় নেমে তোকে বাঁচাল। তা না হলে তো গঙ্গা-যমুনা তোকে একেবারে শেষ করে দিত।

টুলো আর ভুলোও আমার কথায় সায় দিল।

এবার কিন্তু ঢোল গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে বিজ্ঞের মতো বলল—আমি

বললাম এক, আর তোরা বুঝলি আরেক।

—মানে? আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম।

—আমি গঙ্গা-যমুনার দোষ স্বীকারের কথা বলিনি, বলেছি ভজাদার শিকারের কথা।

—ভজাদা আবার কী করল যার জন্যে তাকে দোষ স্বীকার করতে হল? জিজ্ঞেস করল টুলো।

—দোষ স্বীকার নয়, শুধু শিকার।

—তার মানে?

—শিকার মানে বধ—মারা।

—সেকী! ভজাদা আবার কাকে মারল? প্রশ্ন করলাম আমি।

—কোথায় মারল? কেন মারল? কবে মারল? ভুলো আর টুলোর গলায় বিচলিত কণ্ঠস্বর।

ভোম্বলদা ঠাট্টা করে বলল—ওই তালপাতার সেপাই, ফুঁ দিলে যে উড়ে যায়, সে আবার কী মারবে রে?

—পাখি মারবে। বিজয়গর্বে ঢোল গোবিন্দ ঘোষণা করল।

—ধুত্তোর! এত কাণ্ডের পর এখন পাখি মারার কথা। বিরক্ত হয়ে ভুলো বলল।

—আমি তো ভেবেছিলাম ভজাদার মতো পালোয়ান হয়তো কোনো মানুষকেই মেরে ফেলেছে। আবার বিদ্রূপ করল ভোম্বলদা।

—ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি। ভজাদা একটা বন্দুক কিনেছে।

—তাতে কী হল?

ঢোল গোবিন্দ বলল—ভেড়িতে এই সময় প্রচুর পাখি আসে। হুলোর ভেড়িতে পাখি শিকারে যাবে ভজাদা।

—পাখি শিকার করবে ভজাদা! তবেই হয়েছে। টিটকিরি কাটল ভোম্বলদা, ভজাদাকে বলিস বাড়িতে চড়ুই পাখি মেরে আগে হাত পাকাক। তারপর ভেড়িতে বড়ো পাখি শিকারে যাবে। পাখি শিকার!

দু-দিন পরে শুনব বাঘ শিকারে যাচ্ছেন ভজহরি বিড়িং।

—তুমি ভজাদার নাম শুনলে খেপে যাও কেন বলো তো? বিরক্ত হয়ে বলল ঢোল গোবিন্দ।

—শাট আপ। ন্যাকামো করতে হবে না। এই গ্যাঁজা মারবার জন্যে তোর এত লম্ফঝম্ফ। বাঁজখাই গলায় ভোম্বলদার সেকী চিৎকার!

—লম্ফঝম্ফ কোথায় করলাম?

—লম্ফঝম্ফ নয়তো কী? তুই শিকার-শিকার করে ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচালি কেন? ভেংচি কাটল ভোম্বলদা।

ব্যাজার মুখে ঢোল গোবিন্দ বলল—আমি তো কোনোদিন শিকারে যাইনি। ভজাদা বলল আমাকে শিকারে নিয়ে যাবে। তাই...

—তাই নাচতে হবে? ধমকে উঠল ভোম্বলদা।

কাচুমাচু মুখে ঢোল গোবিন্দ আমাদের দিকে তাকাল।

সান্ত্বনার সুরে টুলো বলল—সব ব্যাপারেই তোর উচ্ছ্বাসটা একটু বেশি, ঢোল গোবিন্দ। এটা একটু কমা এবার। এই স্বভাবের জন্যে কতবার যে তুই কতরকম কটূক্তি শুনেছিস তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

ঢোল গোবিন্দ আগের মতোই নীরবে মাথা নিচু করে বসে রইল।

সহানুভূতি দেখা যায় ভুলোর মধ্যেও। সে ভোম্বলদাকে রীতিমতো খেঁকিয়ে উঠল—সব ব্যাপারেই তুমি তিলকে তাল করে তোলো, ভোম্বলদা। ঢোল গোবিন্দর উচ্ছ্বাস আছে ঠিকই, কিন্তু তুমিও বেশ বাড়াবাড়ি করো। তা না হলে সামান্য ব্যাপার...

—একে তুই সামান্য বলছিস ভুলো? আজকে একটা দারুণ রূপকথা বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু ঢোল গোবিন্দর ঢোলের ঠেলায় আমার 'মুডটাই' অফ হয়ে গেল।

—মুড যখন অফ তখন খপ করে পকেটে হাতটা ঢোকাও তো বাপু। আচমকা টুলো বলে ফেলল।

—কেন, কেন?

—কিছু মালকড়ি বের করো দিকি। চা-সিঙ্গারা খাওয়া যাক। একদিন তো তোমার খাওয়ানোর কথা আছে, ভোম্বলদা। আজই হয়ে যাক।

—তোর মধ্যে কি দয়া-মায়া বলে কিছুই নেই রে টুলো? তুই যে কতটা অবিবেচক হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আজ তা আমি হাড়ে-হাড়ে টের পেলুম। আক্ষেপের সুরে কথাগুলো বলল ভোম্বলদা।

—তা যা বলেছ। পকেটে হাত দিতে গেলেই তোমার মুখ থেকে দারুণ-দারুণ বিশেষণ উড়ন তুবড়ির মতো ছোটে। সাধে কি আর ভজাদা তোমাকে হাড়কিপটে মাক্ষিচুষ বলে!

—রাখ তোর ভজাদা। ওরকম ঢের ভজাদা আমার দ্যাখা আছে। ভজহরি বিড়িং তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে তোদের পেছনে দু-চার পয়সা খরচ করে বলে তোরা তাকে কেউকেটা ভাবিস। আমার কাছে তোদের ভজাদা স্রেফ নট কিচ্ছু নাথিং। বলিহারি তোদের লোভের! দু-একটা সিঙ্গাড়া-কচুরি খাওয়ার লোভে তোরা তাকে মাথায় করে নাচিস। আমার অত লোভ-টোভ নেই। কী বুঝলি?

—বুঝলাম খাওয়ার ব্যাপারে তোমার কোনো লোভ নেই। কিছুদিনের মধ্যেই তুমি বিখ্যাত নিখাগী মায়ের শিষ্য হতে চলেছ। ফোড়ন কাটল টুলো।

টুলোর কথা শুনে ভোম্বলদা হনুমানের মতো দাঁত-মুখ খিঁচোতে যাচ্ছে, এমন সময় ঢোল গোবিন্দ হঠাৎ বলে উঠল—আরে, রাতে ভজাদার বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্নর কথা তোদের জানাতে আমি একেবারে ভুলে গেছি।

—ভজাদার বাড়িতে নেমন্তন্ন! দারুণ ব্যাপার। ভুলো বলল, এ-কথা আগে বলবি তো! তা না যত সব ধানাই-পানাই শুরু করেছিস।

ভোম্বলদাকে জ্বালাবার জন্যে টুলো জিজ্ঞেস করল—মেনু জানিস, গোবিন্দ?

—কিছুটা জানি। চিকেন স্যুপ, চিকেন ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, ফিস রোল, সুইট অ্যান্ড সাওয়ার প্রণ, পুডিং, আরও কী সব মিষ্টি-টিষ্টি। সাড়ে সাতটা-আটটার মধ্যেই ভজাদা আমাদের পৌঁছতে বলেছে। খেতে খেতে শিকারের ব্যাপারে আলোচনা হবে। আটটা প্রায় বাজে। এবার উঠে পড়া যাক। ঢোল গোবিন্দর চোখে-মুখে পরম পরিতৃপ্তির ছাপ।

—যা—যা, ভজাদার বাড়িতে গিয়ে ভ্যারেন্ডা ভাজ। আহত সিংহের মতো গর্জে উঠল ভোম্বলদা, আমি ওসব ফালতু ব্যাপারে নেই। আমার সময়ের দাম আছে।

মনে মনে বললাম—সময়ের যে তোমার কত দাম, সে তো আমরা ভালো করেই জানি। ভজাদার বাড়ির খাবার-মেনু শুনে তো নোলায় জল এসে গেছে—তা কি আর আমরা লক্ষ করিনি! ভজাদা একবার 'ডাকিলেই যাইব এবং খাইব' গোছের অবস্থা এখন তোমার। ভাবটা এই, তোমাকে ভজাদার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা যেন একটু সাধাসাধি করি। কিন্তু তোমার সঙ্গে ভজাদার যা-সম্পর্ক তাতে আমরা তোমাকে নিয়ে যাব কোন সাহসে। তা ছাড়া আমরাও অত কাঁচা নই। তোমাকে তো হাড়ে-হাড়ে চিনি। তোমার খাওয়া মানে আমাদের উপোস—এ প্রমাণ বহুবার পেয়েছি। জেনেশুনে কে আর উপোস করতে চায় বলো! কায়দা করে তোমাকে কাটাতেই হবে। তাই মুখে দরদভরা সুরে বললাম—তুমি কাজের মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই তোমার দ্বিতীয় গ্রন্থ বেরোবে। এখন লেখায় মন দাও। অযথা কেন সময় নষ্ট করবে?

অসহায়ের মতো করুণ দৃষ্টিতে ভোম্বলদা আমার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু পরিস্থিতি সুবিধে নয় দেখে শেষ পর্যন্ত আস্ফালন করে উঠল—তুই ঠিকই বলেছিস, হুলো। আমার এখন কত কাজ! ওই সব ভজাদা-টজাদার বাড়িতে গিয়ে আমার মতো লোকের সময় নষ্ট করে

লাভ কী!

রীতিমতো বিরক্ত এবং উত্তেজিত হয়ে গট-গট করে ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেল ভোম্বলদা।

টুলো হাসতে হাসতে বলল—মোক্ষম চাল চেলেছিস, হুলো। তোর জবাব নেই।

ভুলো বলল—ভেরি গুড। ভজাদা তো ভোম্বলদাকে নেমতন্নই করেনি। ভোম্বলদা গেলে আমরা বেকাদায় পড়তাম।

ঢোল গোবিন্দ বলল—চল, ওঠা যাক এখন।

আমরা চারজন ভজাদার বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

কে এই ভজাদা?

কী তার পরিচয়?

ভজাদা মেদিনীপুরের লোক। প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক। এক কথায় টাকার কুমির। পুরো নাম—ভজহরি বিড়িং। চেহারা ও স্বভাবে ভোম্বলদার বিপরীত। ভজাদার হাড্ডিসার চেহারা। বড়জোর ফুট পাঁচেক লম্বা। মাথায় অকালপক্ক কেশ। চোখে চশমা। চড়ুই পাখির মতো আহার। তবে অপরকে প্রাণখুলে খাওয়াতে ভালোবাসে। আমরা যখন যা খেতে চাই তাই খাওয়ায়। বিরাট দিলের লোক আমাদের এই ভজাদা। তবে ভোম্বলদার সঙ্গে ভজাদার খটাখটি লেগেই আছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। ভজাদা বলে, তোদের ওই ভোম্বলদা হাড়কিপটে। তার উপর আবার যেমন গুলবাজ তেমন পেটুক। রাক্ষসের মতন খায়। ওটা একেবারে ভদ্রসমাজে অচল। ভোম্বলদাও ভজাদার নামে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। বলে, ওই তো ফড়িং-এর মতো চেহারা। ওটা কি একটা মানুষ! নামে বিড়িং, কাজেও ফড়িং-এর মতো তিড়িং-তিড়িং করে। এক নম্বরের চালবাজ। টাকার গরম দ্যাখায়। লোকের সঙ্গে মেশার অনুপযুক্ত।

সত্যি কথা বলতে কী আমরা দুজনের কথাই শুনি, কিছু বলি না।

জানি, ওদের দুজনের সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে একদম ভুলে গেছি। চেহারা-স্বভাবে ওদের মিল না থাকলেও একটা জায়গায় কিন্তু দুজনের ভীষণ মিল। গল্পের শেষের দিকে সেই অদ্ভুত মিলটা দেখা যাবে।

এখন আগের দিকের কথা বলে নিই। ভজাদার বাড়িতে পৌঁছে দেখি ভজাদা সব কাজ ফেলে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। রীতিমতো আপ্যায়ন করে সোজা নিয়ে গেল ডাইনিং হলে।

খেতে বসলাম আমরা। ভজাদাও বসল আমাদের সঙ্গে। সেকী এলাহি আয়োজন! ঢোল গোবিন্দ যে মেনু আমাদের জানিয়েছিল, তার উপর আরও গোটা পাঁচেক আইটেম। নানারকম খাবারের গন্ধে ডাইনিং হল ম-ম করছে। ভোম্বলদার কথা বার বার মনে পড়তে লাগল।

খেতে খেতে ভজাদা জিজ্ঞেস করল—বল তো হুলো, তোর ভেড়িতে কী-কী পাখি পাওয়া যাবে?

আমি বললাম—নানা রকমের পাখি এসে বসে। আমি কি ছাই সব পাখির নাম জানি!

—তবুও যেগুলোর জানিস, সেগুলোর নামই বল না।

—বেলেহাঁস, পানকৌড়ি, স্নাইপ, বাটাং—আরও কত রকমের পাখি।

—বলিস কী রে! এসব আগে জানলে আমি কবে বন্দুক কিনে ফেলতাম।

ভুলো বলল—শুধু বন্দুক কিনলেই তো হল না, হাতে টিপ থাকা চাই।

—টিপ! কী বলছিস তুই, ভুলো? ভজাদা বেশ খোশ মেজাজেই বলল, এর আগে কি আমি কম পাখি মেরেছি!

—তা হলে তোমার আগের বন্দুকটা গেল কোথায়? জিজ্ঞেস

করল ভুলো।

—বন্দুক দিয়ে মারিনি, গুলতি দিয়ে মেরেছি।

—মরেছে রে! টুলো বলল, গুলতি আর বন্দুক কি এক হল, ভজাদা?

—তা হবে কেন? তোরা তো আমার হাতের টিপ জানতে চেয়েছিস।

—তা ঠিক। তবে তুমি এর আগে কি কখনও বন্দুক চালিয়েছ?

ভজাদা একটু হাসল। তারপর বেশ গর্বের সঙ্গে বলল—আমাদের জমিদারির কথা তো তোরা সবাই জানিস। আর এটাও অবশ্যই জানিস, জমিদারমাত্রেই বন্দুক চালাতে জানে।

আমরা বললাম—তা ঠিক।

—তা ছাড়া তোরা তো আমার সঙ্গেই থাকবি, দেখতেই পাবি। ভজাদা বলল, তা হলে কাল সকালেই যাত্রা করা যাক।

আমি বললাম—ঠিক হ্যায়। চলো।

ঠিক হল ভোর পাঁচটায় ভজাদার বাড়িতে আমরা সবাই হাজির হব।

যথা সময়ে আমরা হাজির হলাম ভজাদার বাড়িতে। ভজাদার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। ওই সাতসকালেই চান-টান সেরে তৈরি হয়ে বসে আছে। অত সকালেই ভজাদার বাড়িতে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম আমরা ভেড়ির উদ্দেশ্যে।

ভজাদার নতুন 'এ. সি. মারুতি' চেপে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সবাই গন্তব্যস্থলে। পাকা রাস্তায় গাড়ি রেখে ভেড়ির দিকে পা বাড়ালাম আমরা পাঁচজন। যেতে যেতে ভজাদা বলল—আহা! কী সুন্দর! সাধে কি আর কবি-সাহিত্যিকরা পাড়াগাঁয়ের সৌন্দর্য বর্ণনা করে! সত্যি কী সুন্দর গাছগাছালি, দু-ধারে সবুজ ধানের খেত,

সামনে ভেড়ির জলে ঢেউ, মাথার উপর নীল আকাশ, ভোরের মিষ্টি হাওয়া, ফিঙের নাচ, কোকিলের গান—প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়।

টুলো বলল—তুমিও এবার কবিতা লেখো, ভজাদা।

—না রে, কবিতা-টবিতা আমার একেবারে আসে না।

এই ভাবে কথা বলতে বলতে আমরা এগিয়ে চলেছি। ঢোল গোবিন্দ চলেছে অনেকটা আগে-আগে। হঠাৎ পাখি-পাখি বলে চেঁচিয়ে উঠল ঢোলগোবিন্দ। আমরা ছুটে গেলাম। সত্যি ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি বসে আছে ভেড়ির জলের উপর। দূর থেকে মনে হয় যেন রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে আছে। ভজাদা আনন্দে আত্মহারা।

ভেড়ির আলাঘরে ঢুকে ভজাদা জিজ্ঞেস করল—পাখিগুলো যেখানে বসে আছে সেখানে কতটা জল হবে রে হুলো?

—খুব বেশি নয়। বড়োজোর তিন-চার ফুট।

—তবে ঠিক আছে।

—কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—শিকার তো আর ডাঙায় বসে হবে না, জলে নামতে হবে।

জলে নামার জন্যে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। সার্ট-প্যান্ট ছেড়ে সবাই আমরা গেঞ্জি আর বারমুডা পড়লাম। এই নতুন পোশাকে ভজাদাকে যা দেখাচ্ছে তার বর্ণনা না-দেওয়াই ভালো। সে বর্ণনা দেওয়া মানে ভজাদাকে বিদ্রূপ করা। তবে ভয় হচ্ছে, হাওয়ার দাপটে ভজাদা না উড়ে চলে যায়!

ভজাদাকে দারুণ খোশ মেজাজে দেখে টুলো বলল—আজ আমাদের কপাল ভালো। ভজাদা নিশ্চয়ই অনেক পাখি শিকার করবে।

—নিশ্চয়ই। বলে ভজাদা একেবারে আহ্লাদে আটখানা।

ভুলো বলল—একদিনে সবচেয়ে বেশি কতগুলো পাখি মেরেছো, ভজাদা?

—পঞ্চাশটা।

আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

—গুলতি দিয়ে পঞ্চাশটা! বিস্ময় প্রকাশ করল টুলো।

—হ্যাঁ রে। অতি সহজভাবে বলল ভজাদা।

ভুলো আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে ফেলল—মোটে পঞ্চাশটা। আমি ভেবেছিলাম চার-পাঁচশো হয়তো হবে।

ভুলোর কথায় কান না দিয়ে ভজাদা আমার দিকে চেয়ে বলল—হুলো, আর দেরি করে লাভ নেই। নে, এবার জলে নামা যাক।

আমি বললাম—তথাস্তু।

হ্যাঁ, একটা কথা বলা দরকার। ভজাদা কিন্তু ভোম্বলদার মতো কথায় কথায় রেগে যায় না। আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে রাগে না। ভীষণ শান্ত স্বভাবের মানুষ ভজাদা।

জলে নামার আগে কয়েকবার ডন বৈঠকি দিয়ে নিল ভজাদা। সত্যি দেখার মতো একটা দৃশ্য বটে! গেঞ্জি-বারমুডা পরে ডিগডিগে পালোয়ান ভজাদার ডন-বৈঠকি দেখে আমরা বহু কষ্টে হাসি চাপলাম। ক্যামেরা থাকলে ফটো তুলে নিতাম।

জলে নামার সময় ভজাদা বলল—হুলো, তুই আমার সাথে থাক। কারণ, তোর ভেড়ি। কোথায় কত জল আছে না-আছে, তুই ভালো জানিস।

আমি বললাম—ঠিক হ্যায়। চলো।

হঠাৎ ঢোল গোবিন্দ বলল—বা রে, আমি তো এই প্রথম শিকারে এলাম। আমি যাব না?

ভজাদা বলল—যাবি না কেন? তোরা তিনজনেই যাবি। তবে তোরা একটু দূরে-দূরে থাকবি। একসঙ্গে একগাদা লোক থাকলে পাখি উড়ে যেতে পারে।

জলে নেমে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি আমরা সবাই পাখির ঝাঁকের দিকে। আগে ভজাদা, তারপর আমি। ওরা তিনজন বেশকিছুটা

পিছনে। ভজাদা বেঁটে বলে বন্দুকটা আছে আমার হাতে। ঠিক জায়গায় পৌঁছে গুলি ছোড়ার সময় ভজাদা আমার কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে নেবে।

এসে গেছি গন্তব্যস্থলে। দাঁড়িয়ে গেলাম ভজাদা আর আমি। ইশারায় ওদের তিনজনকে এগোতে বারণ করলাম।

এবার আসল কাজ। মনে সে কী আনন্দ! সামনে অজস্র অগুনতি পাখি। ভজাদা হয়তো এক গুলিতেই বিশ-ত্রিশটা পাখি মেরে ফেলবে।

আমি ভজাদার হাতে বন্দুকটা দিতে যাব এমন সময় সাপ-সাপ বলে চেঁচিয়ে উঠল ভজাদা। ভয়ে সবাই আমরা চেঁচামেচি জুড়ে দিলাম। এমন চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল যে এক মুহূর্তে সব পাখি হাওয়া। আর ওই কোমর জলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাবুডুবু খেল ভজাদা। ভুলো-টুলো-ঢোল গোবিন্দর অবস্থাও প্রায় তথৈবচ।

ভয় তো তখনও সবারই মনের মধ্যে। যার জন্যে আমাদের শিকারই বন্ধ হয়ে গেল, সেই সাপটা গেল কোথায়। তাই আমি ভজাদাকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি সাপ দেখলে কোথায়?

—ওই-ওই। বলে ভজাদা সাপটাকে দেখিয়ে ভয়ে আবার হাবুডুবু খেতে লাগল।

—কই, কই বলে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল ওরা তিনজনে।

—ধ্যাত্তোর। বলে আমি ধমকে উঠলাম সবাইকে। একটা ঢোঁড়া সাপ দেখে এত চিৎকার-চেঁচামেচি! ছি-ছি! পুরো প্রোগ্রামটাই মাটি।

টুলো বলল—আমাদের দোষটা কোথায়? আমরা তো কলকাতার ছেলে। ঢোঁড়া-বোড়া আমরা চিনি নাকি? আমাদের কাছে সাপ মানে সাপই। তা ছাড়া ভজাদাই তো সাপ-সাপ বলে চ্যাঁচাল। আমরা তো কোনোকিছুই দেখিনি।

ভুলো বলল—ভজাদা তো পাড়াগাঁয়ের ছেলে। গুলতি দিয়ে একদিনে পঞ্চাশটা পাখি মারে। তা সে চিনবে না কোনটা কী সাপ?

ভজাদা তখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বলল—চুপ কর।

অত ফ্যাচফ্যাচ করতে হবে না।

আমি বললাম—আর জলে থেকে লাভ নেই। ডাঙ্গায় ওঠো সবাই।

ডাঙ্গায় উঠতে উঠতে ঢোল গোবিন্দ বলল—ভজাদা, তোমার কপাল ভালো। হুলোর হাতে বন্দুকটা ছিল বলে বন্দুকে জল ঢোকেনি।

ভজাদা বলল—ঠিক কথা বলেছিস। তবে শিকার আজ না করে ফিরছি না। ভেড়ির পাখি হয়তো মারতে পারলাম না, কিন্তু গাছের পাখি যাবে কোথায়? চল—চা-টা খেয়ে আবার শুরু করা যাক।

মনে মনে বললাম শুরুতেই যা খেল দেখালে, শেষ পর্যন্ত যে কী করবে তা ভগবানই জানে।

চা খেয়ে শুরু হল আমাদের শিকার-অভিযান। ভেড়ির দক্ষিণদিকে নদীর পাড়ে বেশ ঘন জঙ্গল। ওখানেও গাছে-গাছে নানা রকম পাখি বসে। আমরা জঙ্গলের দিকে পা বাড়ালাম।

ভজাদা বলল—শোন হুলো, এবার কিন্তু তোরা চারজনই আমার পিছন-পিছন পা টিপে-টিপে হাঁটবি। একটু শব্দ হলেই পাখি উড়ে যাবে।

—ঠিক আছে। ও নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোরা সবাই আমার থেকে বেশকিছুটা দূরে থাকবি।

—ওভি ঠিক হ্যায়। তুমি আগে পাখি মারো তো!

—এবার দ্যাখ না কী করি। আস্ফালন করল ভজাদা।

জঙ্গলে ঢুকে পা টিপে-টিপে চলেছি আমরা। হঠাৎ থেমে গেলাম ভজাদার ইশারায়।

ভজাদা বন্দুক বাগাল। শিকারের দিকে লক্ষ স্থির করছে। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি। আর হয়তো এক পলকের অপেক্ষামাত্র। এরপরই ডানা ঝটপট করে গুলিবিদ্ধ পাখিটা আমাদের সামনে এসে পড়বে।

গুড়ুম করে আওয়াজ হতেই দুড়ুম করে কী যেন একটা আমাদের সামনে এসে পড়ল। আমরা চমকে উঠলাম। একী! এ যে একটা বেড়াল! মাটিতে পড়েই দাঁত-মুখ বিকৃত করে ফোঁস-ফোঁস করতে লাগল। গাছে যে পাখিগুলো বসেছিল, সব উড়ে পালাল। ভজাদা ধর-ধর করে ছুটে এল।

আমি বললাম—কাকে ধরব? বেড়ালটাকে?

—ইস, এটা বেড়াল! ভজাদা বলল, আমি ভেবেছিলাম বড়ো হরিয়াল। দ্যাখ ব্যাটার গায়ের রঙ—ঠিক যেন হরিয়ালের মতন।

টুলো বলল—তাতে কী হল? হরিয়াল থাকলেই বা তুমি কী করতে? আসলে গুলি-ই তো লাগেনি ওর গায়ে।

—তোরা শিকারের কিচ্ছু বুঝিস না। হরিয়াল থাকলে ব্যাটা মরে পড়ত। ও কি আর বেড়ালের মতন ফোঁস-ফোঁস করত?

—তা ঠিক। ভুলো বলল, গুলতি দিয়ে তুমি একদিনে পঞ্চাশটা পাখি মেরেছ—তোমার মতন পাকা শিকারি ভূ-ভারতে কটা আছে বলা মুশকিল। হরিয়াল-টরিয়াল সবই বাসায় গিয়ে মরত।

—তোরা কি আমাকে ঠাট্টা করছিস?

—আরে রাম-রাম! ঠাট্টা কেন করতে যাব? তোমার গুলতির টিপের প্রশংসা করছি। টুলো বলল, গুলতি দিয়ে একদিনে পঞ্চাশটা পাখি মারা কি মুখের কথা!

এতক্ষণ ঢোল গোবিন্দ চুপচাপ থাকলেও এবার ঢোলে কাঠি মারল—সত্যি ভজাদা, এইখানেই তোমার সঙ্গে ভোম্বলদার পুরোপুরি মিল। মুখের আস্ফালনে তোমরা দুজনেই সমান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তোমাদের বর্ষণের চেয়ে গর্জন বেশি। আর শিকারে দরকার নেই। ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফেরা যাক।

আমাদের দিকে তাকিয়ে ভজাদা করুণ স্বরে বলল—এ নির্ঘাৎ ভোম্বলটার অভিশাপ। পরের বার ওকে সঙ্গে নিয়ে আসব।

আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম—আবার!

ময়নার বাঘ

ভজাদার শিকার-কাহিনি শোনার পর ভোম্বলদার সেকী হাসি! হাসবেই তো। হাসবারই কথা তার। তাকে বাদ দিয়ে তো আমরা শিকারে গেছিলাম। সে এখন বিদ্রূপ করবে না তো কে করবে! এখন তো তার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করারই সময়।

তাই রীতিমতো বিদ্রূপ করে ভোম্বলদা বলল—আমি তো তোদের বলেইছিলাম, ভজাদা আগে বাড়িতে চড়ুই পাখি মেরে হাত পাকাক, তারপর শিকারে যাক।

সত্যি ভোম্বলদার কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেল। ভজাদা যে একটাও পাখি মারতে পারবে না তা কে জানত!

আমি বললাম—ভজাদার সঙ্গে শিকারে গিয়ে খুব শিক্ষা হয়েছে। আর কোনোদিন যাব না। অযথা সময় নষ্ট।

—সময় নষ্ট তো বটেই। এ-কথা তো আমি আগেই বলেছি। ভোম্বলদা বলল, ভজাদার শিকারের দৌড় তো আমার অজানা নয় রে হুলো! তাই আমি তোদের সঙ্গে শিকারে যাইনি। কী বুঝলি?

মনে মনে বললাম যা বোঝবার ঠিকই বুঝেছি। যাওয়ার ইচ্ছে তোমার ষোলোআনার জায়গায় বত্রিশআনাই ছিল। আমরা নিইনি বলেই তোমার যাওয়া হয়নি। মুখে অবশ্য বললাম—ঠিকই করেছ। ওকে কি শিকারে যাওয়া বলে! ধুত, একেবারে ফালতু ব্যাপার।

—বেড়ালকে পাখি ভেবে গুলি ছোড়ে তোদের ভজাদা। এরপর পাখিকে বেড়াল ভেবে তাড়া করবে। কী বুঝলি? বলে হো-হো করে হেসে উঠল ভোম্বলদা।

—তা যা বলেছ, একখানা কথার মতন কথা! আমি ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকালাম।

ভোম্বলদা বলল—শোন হুলো, তোকে একটা গোপন কথা বলি। কেউ যেন জানতে না পারে।

—কী যে বলো ভোম্বলদা, তোমার গোপন কথা আমি কাউকে বলতে পারি! তুমি ভাবলে কী করে?

—বলবি না তা জানি। তবুও সাবধান করা ভালো।

—তো কথাটা কী, বলো।

—শোন। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন ময়না প্রকাশনীর মালিক শ্যামসুন্দর সাহুর সাথে আলাপ হল। বেশ ভাবও হয়ে গেছে আমার ওর সঙ্গে। ও আমাকে ভোম্বলদা বলেই ডাকে।

—তাই নাকি? তা হলে তো কেল্লা মেরে দিয়েছ। এখন আর তোমায় পায় কে! এবার তো শুধু একের পর এক বই বেরোবে তোমার।

—বই বেরনোর কথা বলছি না।

—তবে?

—অন্য কথা।

—মানে?

—বাঘের কথা।

—ধুৎ, তুমিও তো দেখি অদ্ভুত কথা বলছ।

—কেন?

—প্রকাশকের সঙ্গে বাঘের কী সম্পর্ক?

—তা হলে ব্যাপারটা আগে শোন। কথায়-কথায় হঠাৎ একদিন ময়না প্রকাশনীর মালিক শ্যাম আমাকে বলল, ওদের গ্রামে মানে ময়নায় সন্ধের পর প্রায়ই বাঘ আসে। বাড়িতে বসেই বাঘ দেখা যায়। বাঘটাও নাকি সাইজে খুব ছোটো। ভয়ের কোনো কারণ নেই। সে আজ পর্যন্ত কারও ক্ষতি করেনি।

—ক্ষতি করেনি, ঠিক কথা কিন্তু করতে কতক্ষণ। আমি বললাম,

বাঘ বাঘ-ই, মানুষখেকো জন্তু। ওই জন্তুকে বিশ্বাস করা যায় না।

—না, না। ভয়ের কিছু নেই। শ্যামের একটা বন্দুকও আছে। তা ছাড়া শ্যাম আমাকে বলেছে যে আমার এক ঘুঁষিতেই ওই পুঁচকে বাঘ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—শ্যামবাবু মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর কবিতার লাইনটা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন—'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।'

—কথাটা মন্দ বলিসনি তো হুলো! তা হলে চল এবার, দরকার হলে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে।

—বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ! তোমার গায়ে বহুৎ জোর আছে ভোম্বলদা, তুমি গিয়ে যুদ্ধ করো। আমার দরকার নেই।

মেজাজে ভোম্বলদা বলল—সাধে কি আর তোদের বলি, চেহারার দিকে নজর দে। চেহারা হল মানুষের সম্পদ। দেখবি, বাঘও আমাকে দেখলে থমকে দাঁড়াবে। আর ওই পুঁচকে বাঘ তো ভয়ে পালাবে। কী বুঝলি?

—যা বোঝবার ঠিকই বুঝেছি। বাঘ তোমাকে দেখে পালিয়ে যাক বা অজ্ঞান হয়ে পড়ুক—তা দেখে আমার দরকার নেই। মোদ্দাকথা আমি যাচ্ছি না।

—এমন সুযোগ আর কোনোদিন পাবি না রে হুলো। বিশ্বাস কর, তোকে আমি অন্য চোখে দেখি বলেই বলছি। চল আমার সঙ্গে ময়নায়।

—ময়নাটা কোথায়?

—মেদিনীপুরে। বেশি দূরে নয়, খুবই কাছে। বড়োজোর কলকাতা থেকে একশো কিলোমিটার হবে। শ্যামের মুখে শুনেছি দারুণ জায়গা। গ্রামটা বেশ সুন্দর। গ্রামের গা ঘেঁষে কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে কংসাবতী নদী। গাছগাছালিতে ভরা পাখি-ডাকা এই গ্রামটি সত্যিই

সুন্দর। গ্রাম দর্শন আর বাঘ দর্শন—দুই-ই হবে। আর সেই সাথে শ্যামের বন্দুক দিয়ে দু-চারটে পাখিও মারা যাবে।

—আবার পাখি মারা! ওর মধ্যে আমি আর নেই। ভজাদা যা খেল দেখাল...

বাধা দিয়ে ভোম্বলদা বলল—ওই ডিগডিগে পালোয়ান ভজাদা আর ভোম্বল ঘোষ এক নয় রে হুলো। ঢোঁড়াসাপ দেখে হাঁটুজলে যে হাবুডুবু খায় তার সঙ্গে আমার তুলনা করছিস! আমি যাচ্ছি জঙ্গলের বাঘ দেখতে। তোর ভজাদা তো খাঁচার বাঘ কিংবা সার্কাসের বাঘ দেখলেই অজ্ঞান হয়ে যাবে।

—পাখি মারার সঙ্গে বাঘ দেখার কথা উঠছে কেন?

—তুই আমাকে ভজাদার সঙ্গে তুলনা করলি বলে।

—তুলনা তো করিনি। বলেছি পাখি মারার মধ্যে আমি আর নেই। তা ছাড়া পাখি মারাও তো বেআইন। গাছ কেটে পাখি মেরে পরিবেশ নষ্ট করে ফেলছি আমরা।

—বাদ দে ওসব কথা। চল আমার সাথে। বাঘও দেখবি আর আমার হাতের টিপও দেখবি। তুই তো জানিস তোকে ছাড়া আমি কোথাও যাই না। তুই সঙ্গে থাকলে আমার ভালো লাগে।

যাওয়ার জন্যে তো আমি একপায়ে খাড়া। প্রায়ই এখানে-সেখানে বেড়াতে যাই। স্রেফ নিজের দর বাড়ানোর জন্যে এত কথার অবতারণা। তাই জিজ্ঞেস করলাম—কবে যেতে চাও?

—কালই। কাল শনিবার। বিকেলের দিকেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

—শ্যামবাবুর সাথে কথা হয়েছে?

—হ্যাঁ রে। শ্যামই তো দিন ঠিক করেছে। তুই আর অমত করিস না, হুলো।

—তবে চলো।

পরের দিনই বেরিয়ে পড়লাম ভোম্বলদা, শ্যামবাবু আর আমি। হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে সোজা মেচেদা স্টেশন। ওভার ব্রিজ পেরিয়ে বাস স্ট্যান্ডে এসে একটা ভাড়ার গাড়ি জোগাড় করে রওনা হলাম আমরা ময়নার উদ্দেশ্যে। তখনও বেলা পড়ে যায়নি। পশ্চিম আকাশে সোনার থালার মতো সূর্য জ্বল জ্বল করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যটা নেমে এল বাঁশবাগানের মাথার উপর। তারপরই এক ফাঁকে ডুব দিল বাঁশবাগানের আড়ালে। দেখতে দেখতে নেমে এল সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গোটা তল্লাট জুড়ে।

সন্ধের একটু পরে আমরা পৌঁছলাম কংসাবতী নদীর এ-পারে। ও-পারে ময়না। নদীর ওপর বাঁশ দিয়ে তৈরি বেশ চওড়া সাঁকো। মানুষ-গাড়ি—সবই পারাপার হয় এই সাঁকোর ওপর দিয়ে।

গাড়িটাকে এ-পারে রেখে আমরা তিনজনে সাঁকোর উপর এসে দাঁড়ালাম। ভারী সুন্দর দৃশ্য। নদীর বুকে চাঁদের আলো। মৃদু ঢেউয়ে চিকচিক করছে শান্ত জলরাশি। দু-পারের গাছগাছালির মধ্যে আলো-আঁধারির খেলা। কিছুক্ষণের জন্যে সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে আমরা এই দৃশ্য উপভোগ করলাম।

ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—কেমন লাগছে রে হুলো?

—দারুণ!

—এখন তো বুঝতে পারছিস আমি বাজে কথা বলিনি।

শ্যামবাবু বললেন—ভোম্বলদা, এখানে আর দেরি করব না। ও-পারে একটা চায়ের দোকানে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক অপেক্ষা করছেন।

—ঠিক আছে, চলো। ভোম্বলদা বলল, খিদেও পেয়েছে। একটু চা খাওয়াও দরকার।

চায়ের দোকানে কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর আমরা শ্যামবাবুর বাড়িতে পৌঁছলাম। সেখানে শ্যামের বউদির মুখে

যা শুনলাম তাতে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। রাত্তিরবেলায় নাকি হঠাৎই বাড়ির পিছনের জঙ্গল থেকে মাঝেমধ্যেই বাঘটা চলে আসে উঠোনের মাঝখানে। আর একবার ওই বাঘ দেখেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

ভোম্বলদা কী যেন ভাবল। তারপর বলল—শ্যাম, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে।

—কেন ভোম্বলদা?

—অজ্ঞান হয়ে যাওয়া একটা মানুষকে বাগে পেয়েও বাঘ ছেড়ে দেবে কেন? তাকে তো তুলে নিয়ে যাবে।

—তুলে নেবেটা কী করে?

—কেন, অসুবিধে কোথায়?

—বাঘ দেখলেই বউদি খুব জোরে গোঁ-গোঁ শব্দ করে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকজন এসে পড়ে। ব্যস, বাঘও পালিয়ে যায়।

—বউদি ছাড়া বাঘটাকে আর কে-কে দেখেছে?

—বাড়ির সবাই দেখেছে।

ঠিক হল আজ রাতেই বউদি উঠোনে থাকবেন। আর আমরা তিনজন—মানে ভোম্বলদা, শ্যামবাবু আর আমি বারান্দার পাশে ঘাপটি মেরে থাকব।

যেমন কথা তেমন কাজ। বউদিও উঠোনে ঘোরাফেরা করছেন আর আমরাও বারান্দার পাশে ঘাপটি মেরে আছি। কিন্তু কোথায় বাঘ আর কোথায় কী! বাঘের কোনো পাত্তাই নেই।

রাত তখন অনেক। আমি বললাম—মনে হয় বাঘ টের পেয়ে গেছে এখানে শিকারি এসেছে। আজ আর বাঘ আসবে না।

হঠাৎ শ্যামবাবু বললেন—চুপ-চুপ।

ভোম্বলদা বলল—কেন?

—জঙ্গলের দিক থেকে একটা খসখস শব্দ ভেসে আসছে।

আমি বললাম—তাই তো। তা হলে কি সত্যি-সত্যি জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে আসছে?

শ্যামবাবু বললেন—মনে হয় বাঘ এদিকেই আসছে।

আমি বললাম—ঠিকই বলেছেন শ্যামবাবু। কী যেন একটা এদিকে এগিয়ে আসছে।

শ্যামবাবু বললেন—চুপ একদম কথা নয়।

—'ওটা কী... ওটা কী' বলে ভোম্বলদা আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

শ্যামবাবু বললেন—ওই তো বাঘ।

—'বা...ঘ—বা...ঘ' বলে ভোম্বলদা আমাকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আমিও ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলাম।

শ্যামবাবু চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। বউদিও গোঁ-গোঁ শব্দ করে অজ্ঞান হলেন।

জঙ্গলের মধ্য থেকে মানুষের হাসির শব্দ পেয়ে আমার কেমন সন্দেহ হল। তাড়াতাড়ি ভোম্বলদার হাত ছাড়িয়ে শ্যামবাবুর কাছ থেকে টর্চ নিয়ে প্রাণপণে ছুটলাম জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে শব্দটাকে অনুসরণ করে টর্চ-লাইট ফেললাম। কিন্তু একী! এ তো বাঘ নয়। আমার সন্দেহই ঠিক। মাথায় চাদর জড়িয়ে একটা লোক ছুটছে। তার পিছন-পিছন ছুটছে একটা বিরাট কুকুর। কুকুরটাকে দেখতে বাঘের মতোই অনেকটা। আপ্রাণ চেষ্টা করেও ধরতে পারলাম না। মনে হল কুকুরটার মুখে বাঘের মুখোশ।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ব্যাপারটা সবাইকে খুলে বললাম। শ্যামবাবু একটু গম্ভীর হলেন। তখনও ভোম্বলদা বা বউদির—কারও জ্ঞান ফেরেনি।

জুতো-টুতো নাকের কাছে ধরে অনেক কষ্টে বউদির জ্ঞান ফেরানো হল। ভোম্বলদার জ্ঞান ফিরল তারও ঘণ্টাখানেক পরে।

পরের দিন। বেলা তখন আটটা-সাড়ে আটটা হবে। হঠাৎ দেখি শ্যামবাবু বারো-তেরো বছরের একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে আসছেন। শ্যামবাবু ছেলেটিকে নিয়ে কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার?

শ্যামবাবু বললেন—বাঘের সন্ধান পেয়েছি। এই বদমায়েসটাই এই সব করছিল। ওর একটা বিরাট কুকুর আছে। তারই মুখে মুখোশ পরিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে ছেড়ে দিত। আর নিজে থাকত জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে। আমার বউদি মৃগী রুগী। তিনি ওই মুখোশ দেখেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। তাঁর গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে আমরা আসতে-না-আসতেই কুকুরটা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ত। দূর থেকে আমরা কয়েকবার বাঘরূপী কুকুরটাকে দেখতেও পেয়েছি। তাই আমরা বলাবলি করতাম বাঘটা সাইজে খুব ছোটো। ঠিক আছে, আজ ছুঁচোর মজা দেখাচ্ছি।

ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—ওকে ছুঁচো বলছ কেন?

—ওর নামই তো ছুঁচো। ছোটোবেলা থেকে এরকম বজ্জাতি করে পালিয়ে যেত বলেই তো ওর ঠাকুমা ওর নাম রেখেছিল ছুঁচো। শ্যামবাবু বললেন, ওকে নিয়ে আজ আমি থানায় যাব।

বীরপুঙ্গব ভোম্বলদার সেকী আস্ফালন—ছুঁচোকে আমি আজ গর্তে ঢুকিয়ে দেব। ও ভেবেছে কী মনে? দেখাচ্ছি মজা।

ফিসফিস করে ভোম্বলদাকে বললাম—গর্তে তো ছুঁচোই তোমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কুকুর দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়লে। জ্ঞান ফিরল চার ঘণ্টা পরে। এবারও এক কাণ্ড করলে তুমি।

ভোম্বলদা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

রূপকথা হলেও সত্যি

সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় আমাদের ক্লাবে। এক-একদিন এক-এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আমরা। কবিতা বা ছোটো গল্প হলে টুলো সেদিন বক্তা। উপন্যাস হলে দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। ভূতের গল্প হলে ভুলো একেবারে ভয় ধরিয়ে দেয় আমাদের। হাসির গল্প হলে ঢোল গোবিন্দ মাতিয়ে রাখে সকলকে। আর রূপকথা হলে তাক লাগিয়ে দেয় ভোম্বলদা। হাঁ করে ওর কথা শুনি আমরা সবাই।

তা সেদিন রূপকথাই শোনা হবে ঠিক হল। কিন্তু বলবেটা কে! ভোম্বলদার তো পাত্তাই নেই। আসার টাইমও চলে গেছে অনেকক্ষণ। আজ আসবে কিনা কে জানে! তাই আমরা মত পালটালাম।

টুলোর বক্তব্য—ভুলো আজ একটা ভূতের গল্প বলুক।

ভুলো বলল—ভূতের গল্প তো অনেক হয়। ভূত-টুত ছেড়ে আজ বরং একটা অ্যাডভেঞ্চার-গল্প বলি।

আমি বললাম—তাই ভালো।

ঢোল গোবিন্দ বলল—রূপকথা কিন্তু সত্যি-সত্যি অনেক দিন হয়নি। আগামী শনিবারে তাহলে রূপকথার আসর হোক।

—আগামী শনিবার কেন? আজই রূপকথা হবে। বলতে বলতে হঠাৎ ক্লাবে ঢুকল সেই মূর্তিমান—মানে আমাদের ভোম্বলদা।

ভোম্বলদাকে দেখে আমরা সবাই দারুণ খুশি। ভোম্বলদা না থাকলে কি আর আসর জমে! ভোম্বলদা গুল মারুক আর যাই করুক, আসর জমাতে ওর জুড়ি নেই।

টুলো জিজ্ঞেস করল—আজ তোমার এত দেরি হল কেন, ভোম্বলদা?

—আরে দেরি তো হল রূপকথারই জন্যে।

—তার মানে? সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম আমরা সবাই।

—সেই কথাই তো বলব এখন। ভোম্বলদার মুখে হাসি-হাসি ভাব।

ভুলো বলল—তা হলে বলেই ফেলো।

—বলব, বলব। এত ছটফট করলে কি হয়! এই রূপকথাটা শোনার জন্যে আমি চার ঘণ্টার উপর বসেছিলাম। রূপকথার মতন রূপকথা। সত্যি, এই রূপকথাটা শুনে আমার জীবন ধন্য হল।

সেকী! রূপকথা শুনে জীবন ধন্য হয়—এমন কথা তো আজ পর্যন্ত শুনিনি। বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমরা সবাই।

ভুলো বলল—তা হলে শোনা যাক। দেরি না করে শুরু করো। এমনিতেই তো অনেক দেরি করে এসেছ।

—হোক দেরি। এমন রূপকথা জীবনে কখনও শুনিসনি তোরা। সারা রাত কাবার হয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই। দেখবি আনন্দে গর্বে বুকটা ফুলে উঠবে তোদের। কী বুঝলি?

—যা বোঝার ঠিকই বুঝেছি। বিরক্ত হয়ে টুলো বলল, তোমার এই বকবকানি রোগ আর কোনোদিনও কমবে না।

—এ-কথার মানে? তুই কী বলতে চাস? চোখ পাকিয়ে উঠল ভোম্বলদা।

—মানে খুবই সহজ সরল। রূপকথা তো রূপকথাই। উদ্ভট কল্পনা ছাড়া তো কিছু নয়। তাতে আবার কারও বুক গর্বে ফুলে ওঠে নাকি? ভোম্বলদাকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল টুলো।

—ওঠে, আলবাত ওঠে। এ-রূপকথা সে-রূপকথা নয়।

—মানে? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—তবে শোন, মুখে বিজয়ীর হাসি নিয়ে ভোম্বলদা বলল, রূপকথা কী বা কাকে বলে—সে তো আমরা সবাই জানি। ইংরেজিতে যাকে বলে ফ্যান্টাসি বা ফেয়ারিটেলস বাংলায় তাকেই বলে রূপকথা।

অর্থাৎ, একেবারে অবাস্তব কাল্পনিক কাহিনির নামই রূপকথা।

—এ-কথা কে না জানে? টুলো বলল।

আমরাও সবাই সায় দিলাম টুলোর কথায়।

—আমার আজকের রূপকথাটা যে তা নয়, আসল ব্যাপারটাই তো সেখানে। বিজ্ঞের মতো বলল ভোম্বলদা।

—তা হলে তোমার রূপকথাটা কী? জিজ্ঞেস করল ভুলো।

—বাস্তব-ঘটনা—একেবারে বাস্তব। কল্পনার কোনো অবকাশ নেই। ষোলোআনাই বাস্তব।

—বাস্তব-ঘটনা আবার রূপকথা হয় নাকি? বিরক্তি প্রকাশ করল টুলো।

—কে বলেছে হয় না? হয়, নিশ্চয়ই হয়। সেই জন্যেই তো বলেছি, এই রূপকথাটা শুনলে বুকটা গর্বে ফুলে উঠবে।

গুলসম্রাট ভোম্বলদাকে তো আমরা চিনি। তাই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

এতক্ষণ চুপচাপ বসে সব শুনছিল ঢোল গোবিন্দ। ভোম্বলদা আসার পর একটি কথাও সে বলেনি। এই প্রথম বলল—ভোম্বলদা, তোমার গল্পের চেয়ে ভূমিকাই তো বেশি দেখছি।

ভুলো বলল—ঠিকই বলেছিস। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।

উত্তেজিত হয়ে ভোম্বলদা বলল—চুপ কর। এখানে বাজনার দরকার আছে। গল্পটা শুনলে চমকে উঠবি।

—তখন থেকে শুধু একই কথা বলে চলেছ। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, গল্পটাই তো বলছ না। আগে রূপকথাটা...

আমার কথাটা লুফে নিয়ে টুলো বলল—হ্যাঁ, আগে রূপকথাটা বলো। তারপর তো সব বোঝা যাবে। তোমার রূপকথা শুনতে ভালো লাগে বলেই তো তোমাকে রূপকথা বলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই ডিপার্টমেন্টটাই তো তোমার।

ফোড়ন কাটল ঢোল গোবিন্দ—অর্থাৎ গুলের ডিপার্টমেন্ট। রূপকথা মানেই তো অদ্ভুত সব গুল। তা তুমি থাকতে ওই ডিপার্টমেন্ট কি আর কাউকে দেওয়া যায়!

রে-রে করে ঢোল গোবিন্দর দিকে তেড়ে গেল ভোম্বলদা। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমরা ভোম্বলদাকে থামাই। গজগজ করতে করতে ভোম্বলদা বলল—এই রূপকথার মানে তুই কী বুঝবি রে ব্যাটা ঢোল? তুই তো নিজের ঢোল নিজেই পেটাস।

ঢোল গোবিন্দ চুপচাপ। মুখে টু শব্দটি নেই। হঠাৎ মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে পড়েছে, তার ঠেলায় অন্ধকার। এরপর কথা বলার যে কী পরিণাম তা সে ভালো করেই জানে। ভোম্বলদাকে হাড়ে-হাড়ে চেনে। তাই একেবারে স্পিকটি নট।

ভোম্বলদার মেজাজ সপ্তমে দেখে টুলো আস্তে আস্তে বলল—কেন চেঁচামেচি করছ ভোম্বলদা? ঢোল গোবিন্দ কি আর সত্যি-সত্যি এ-কথা তোমাকে বলেছে! এমনি-এমনি কথায় কথায় বলে ফেলেছে। বাদ দাও তো ওসব কথা। তুমি রূপকথাটা শোনাও।

ভোম্বলদার মস্ত বড়ো গুণ সে টুলোর কথা মেনে চলে। তাই আগুনে জল পড়ার মতো তার রাগ নিভে গেল। মৃদু হেসে বলল—তুই যখন বলছিস তো ঠিক আছে। তবে আর কোনদিন ঢোল গোবিন্দ উলটো-পালটা বললে তখন কিন্তু ওকে আমি ছাড়ব না। ঢোল একেবারে ফাটিয়ে দেব।

টুলো বলল—অবশ্যই। ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ভুলো বলল—এ-কথার জন্যে আজ ওকে পেনাল্টি দিতে হবে।

আমি বললাম—অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার শুরু করে দাও ভোম্বলদা।

—তা তোদের কি চা-টা খাওয়া হয়ে গেছে?

—অনেকক্ষণ আগে। তুমি আসছ না দেখে আমরা খেয়ে নিলাম।

—তা হলে আমার জন্যে বল।

ভুলো বলল—এই ঢোল গোবিন্দ, যা—ভোম্বলদার জন্যে একটা চিকেন কাটলেট আর চা নিয়ে আয়। এটাই তোর আজকের পেনাল্টি।

মুখ কাঁচুমাচু করে ঢোল গোবিন্দ বেরিয়ে গেল। একটা বেফাঁস উক্তির জন্যে আজ বেশকিছু টাকা তার দণ্ড গেল। অথচ কাথাটা তো সত্যি। ভোম্বলদার মতো গুলবাজ ভূ-ভারতে খুব কমই আছে।

—মাইরি, তোর জবাব নেই ভুলো। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভোম্বলদা বলল, বেড়ে টাইট দিয়েছিস ব্যাটাকে। তবে ঢোল গোবিন্দ ছেলে কিন্তু খারাপ নয়। উলটোপালটা বকলেও ওর অনেক গুণ আছে।

মনে-মনে বললাম, খাবারের কথা শুনলে তোমার কাছে সবই ঠিক।

চা আর চিকেন কাটলেট নিয়ে এল ঢোল গোবিন্দ। খেতে খেতে ভোম্বলদা শুরু করল রূপকথা ঃ

অনেক দিন আগের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ঘটনা। তা হলে ভেবে দ্যাখ তোরা এটা কতকাল আগের কাহিনি। জোর যুদ্ধ চলছে তখন সার পৃথিবী ব্যাপী। গোটা বিশ্ব ভয়ে রীতিমতো থরথর করে কাঁপছে। নেতাজি সেই সময় সিঙ্গাপুরে। সেখান থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তিনি ব্রিটেন আর আমেরিকার বিরুদ্ধে। যুদ্ধ তো ঘোষণা করলেন, কিন্তু টাকা কোথায়? তখনকার যুদ্ধ তো আর সেই বহু আগেকার দিনের যুদ্ধ নয় যে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ময়দানে নেমে পড়ল দুই পক্ষ। আধুনিক যুদ্ধ হল বিজ্ঞানের যুদ্ধ। এখানে শুধু টাকার খেলা। মানে অঢেল অর্থের অকুণ্ঠ অপব্যয়। সে টাকা নেতাজির কোথায়? তিনি তো কপর্দকহীন এক রাষ্ট্রপ্রধান। জাপানের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য নিলেও অর্থসাহায্য নেবেন না তিনি। তাঁর স্পষ্ট কথা—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে ভারতীয়দেরই

টাকা দিতে হবে। তাই অর্থ সংগ্রহের জন্যে দুরন্ত ঘূর্ণির মতন ছুটে বেড়াতে লাগলেন নেতাজি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। সমানে চলেছে সভা-সমিতি। আর প্রতিটি সভায় সেকী লোকের ভিড়! সিঙ্গাপুরে এমনই এক সভার কথা। সভা-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। ভোম্বলদা একটু থামল।

টুলো বলল—এ তো ঐতিহাসিক কাহিনি। এর সাথে রূপকথার কী সম্পর্ক, ভোম্বলদা?

—আছে, আছে। ধৈর্য্য ধরো। সবুরে মেওয়া ফলে।

টুলো বলল—তথাস্তু।

আবার শুরু করল ভোম্বলদা ঃ

একটা ভিখারিনী সারা দিন ধরে ঘুরে-ঘুরে একটা পয়সাও ভিক্ষে পায়নি। কপালে খাওয়া জোটেনি। 'বাবুগো একটা পয়সা' বলে-বলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ভুলো মৃদু হেসে বলল—তুমি যে আজ কী রূপকথা শোনাবে তা ভগবানই জানে।

—কেন? ভোম্বলদা বলল, আমি তো আগেই বলেছি একেবারে বাস্তব-ঘটনার রূপকথা। নির্ভেজাল সত্য।

—তো বলো সেটা।

ভোম্বলদা বলল—ভালো করে মন দিয়ে শোন। অত বকবক করলে কি ঠিকমতো কথা বলা যায়! একদম ডিস্টার্ব করবি না। কী বুঝলি?

আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

ভোম্বলদা আরম্ভ করল ঃ

হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখা দরকার। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন কিন্তু আধ পয়সা বাজারে চালু ছিল। আধ পয়সায় এক ঠোঙা মুড়ি-মুড়কি পাওয়া যেত। সিঙ্গাড়া-কচুরির দাম ছিল এক পয়সা করে।

পঁচিশ পয়সায় পেট ভরে মাছ-মাংস-ভাত খাওয়া যেত। এক টাকায় রাজকীয় খাবার মিলত। আর এই কলকাতার বহু অভিজাত অঞ্চল, এখন যেখানকার এক কাঠা জমির দাম পনেরো-কুড়ি লাখ টাকার উপর, সেই সব অঞ্চলের জমি তখন বিক্রি হত বিঘে হিসেবে। বড়জোর হাজার টাকা বিঘে ছিল। ওই সব জমি ছিল জঙ্গলে ভর্তি। সন্ধে হতে-না-হতেই শেয়াল ডাকা শুরু হত। ভয়ে আশপাশ দিয়ে কেউ যেত না। ভোম্বলদা আবার থামল।

আমি বললাম—ভোম্বলদা, এ যে ধান ভানতে শিবের গীত হচ্ছে।

—এখন তাই মনে হচ্ছে। পরে কিন্তু অন্য কথা বলবি।

—তা বলি বলব। এখন ধানাই-পানাই ছেড়ে আসল কথাটা বলো তো। রূপকথা মানে যুদ্ধ আর জমির গল্প নয়।

—দ্যাখ হুলো, এভাবে ডিস্টার্ব করবি না।

—ঠিক আছে গুরু, তুমি বলো।

ভোম্বলদা বলল—তবুও বলে রাখি, এ-কথাগুলো কেন বললাম সেটা এক্ষুনি বুঝতে পারবি। যাক, সে-কথা। যে কথা বলছিলাম সেই কথায় আসি ঃ

সেই যে ভিখারিনী, যে সিঙ্গাপুরের রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াত, সেদিন সারা দিনে একটা পয়সাও ভিক্ষে পায়নি। বিকেলের দিকে হঠাৎ তার নজরে পড়ল এক বিশাল জনসমাবেশ। মনে মনে ভাবল নিশ্চয়ই ওই পার্কে মেলা-টেলা বসেছে। সারা দিন না খেয়ে আছি, ওখানে গেলে হয়তো একটু খাবার-টাবার পেলেও পেতে পারি। দু-একটা পয়সাও হয়তো মিলতে পারে। এই আশায় সে এগিয়ে গেল পার্কের জনসমাবেশের দিকে। সুসজ্জিত প্রধান তোরণের কাছে যেতেই দেখে তার সামনে এসে থামল একখানা বেশ বড়ো গাড়ি। অনেক লোক ওই গাড়িটার দিকে ছুটে চলেছে। কী ব্যাপার! নিশ্চয়ই কোনো পয়সাঅলা লোক হবে। হাত পাতলে আমারও কিছু জুটে যেতে পারে।

তাই ভিখারিনীও এগিয়ে গিয়ে একে-ওকে গাড়ির লোকটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। কে কার কথার জবাব দেবে! সবাই গাড়ির লোকটাকে দেখার জন্যে ব্যস্ত। গাড়ি থেকে লোকটি নামতে- না-নামতেই ধ্বনিত হয়—নেতাজি জিন্দাবাদ—আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ—জয়হিন্দ্।

ভিখারিনী বুঝল সে যা ভেবেছিল, তা নয়। তবে নেতাজিকে দেখার বাসনা তার মনেও জেগে ওঠে। কিন্তু অত ভিড়ের মধ্যে তার পক্ষে আর এগোনো সম্ভব হল না। না পারল নেতাজিকে দেখতে, না জুটল ভিক্ষে। তাই মনমরা হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় দু-চারজনের কাছে ভিক্ষে চাইল। কে আর তখন ওকে ভিক্ষে দেবে! সবাই নেতাজিকে দেখার জন্যে ব্যস্ত। অন্তত এক পলকের জন্যে দেখলেও জীবন ধন্য। সারা দিন না খেয়ে থাকা নিঃস্ব বুড়িটা তখন ভাবল, তার জমানো টাকা ভেঙে কিছু খাবে। কতক্ষণ আর না খেয়ে থাকবে! আর সারা দিন কিছু না খেয়ে রীতিমতো ধুঁকছে সে। মনের দুঃখে তখন সেই বৃদ্ধা এগিয়ে চলেছে দোকান থেকে কিছু কিনে খাওয়ার জন্যে। যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সে। এমন কথা তো সে এ-জীবনে কারও মুখ থেকে কখনও শোনেনি। নেতাজির সেকী আগুন-ঝরা পাগল-করা ডাক! নেতাজির উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বানে তার পা যেন আর নড়তে চাইল না সেখান থেকে। ভুলে গেলে সে ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। ভাবাও বুঝি যায় না। বুড়িটা এমন কাণ্ড করল যা দেখে সবাই অবাক।

—কী রকম? আমরা সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

—সেই কথায়ই তো আসছি। তোরা সবাই জানিস আমরা রাজপুত্র-রাজকন্যার রূপকথা জানি—জানি সোনার কাঠি-রুপোর কাঠির কথাও। রুপোর কাঠি ছোঁয়ালে ঘুমিয়ে পড়ে, সোনার কাঠি ছোঁয়ালে জেগে ওঠে। সোনার কাঠির মতন সোনার ভাষণে অনেক মানুষ জেগে উঠেছে, ইতিহাসের সেই সব কথাও তো আমরা জানি।

কিন্তু আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনো নেতার বক্তৃতার কথা শুনিনি যার বক্তৃতায় কোনো ভিখিরি জেগে উঠেছে। এখানে অবশ্য তাই হল। সারা দিন না খেয়ে থাকা বৃদ্ধ ভিখারিনী, যার কপালে সেদিন একদম ভিক্ষে জোটেনি, সবকিছু ভুলে গিয়ে শুনতে লাগল নেতাজির সেই জ্বালাময়ী ভাষার সোনার ভাষণ। সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতটে শোনা গেল সেদিন নতুন জোয়ারের কলতান ঃ

বন্ধুগণ, পরাধীন জাতির কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেয়ে গৌরবের আর কিছু নেই। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধই ঘোষণা করেছি আমরা। ভারত স্বাধীন না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই যুদ্ধ চলবে। আর তার জন্যে আমি প্রতিটি ভারতীয়র কাছে আবেদন রাখছি, যার যা-কিছু আছে সব কিছু দান করুন দেশের স্বাধীনতার জন্যে। 'করো সব নিছোয়ার, বনো সব ফকির'। যথাসর্বস্ব দিয়ে ভিখিরি হয়ে যাও।

জ্বালাময়ী ভাষায় নেতাজির বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল অনেকে এসে মোটা টাকা দান করে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল সেই ভিখারিনীকে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে। সর্বাঙ্গে শতচ্ছিন্ন ময়লা বসন। কাঁপতে-কাঁপতে সেই নিঃস্ব বৃদ্ধা বলল—একটু সরে দাঁড়াও না বাবুরা, আমি নেতাজির কাছে যাব।

সবাই অবাক। দু-একজন আবার জিজ্ঞেস করল—তুমি কী করতে যাবে?

সারাদিন না-খেয়ে থাকা ভিখারিনী জবাব দিল—কেন? নেতাজি যে বলেছে যার যা আছে সব দিয়ে দিতে।

একজন প্রশ্ন করল—তা তোমার আছেটা কী?

এই ভাবে কথা বলতে বলতে ভিখারিনী প্রায় মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেছে। মঞ্চের উপর নেতাজির পাশে বসেছিলেন শাহনওয়াজ খান। তিনি নেতাজিকে বললেন—এই নিঃস্ব বৃদ্ধা তো আপনার দিকেই এগিয়ে আসছে, স্যার!

গম্ভীর কণ্ঠে নেতাজি বললেন—আসতে দাও।

নেতাজির সামনে বৃদ্ধা আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কী চাই মা তোমার?

ভিখারিনী বলল—তুমি যে বলেছ যার যা আছে সব দিয়ে দিতে।

নেতাজি বললেন—তা তো বলেছি। কিন্তু তুমি কী জন্যে এসেছ, মা?

ভিখারিনী বলল—আমি তিনটে টাকা তোমায় দিতে এসেছি নেতাজি। এই নাও।

চমকে উঠলেন নেতাজি। চমকে উঠলেন শাহনওয়াজ খান ও মঞ্চে উপবিষ্ট সবাই।

কম্পিত কণ্ঠে নেতাজি বললেন—না-না-না। এ-টাকা আমি নিতে পারব না।

কান্নায় ভেঙে পড়ল ভিখারিনী। বলল—তুমি বিশ্বাস করো নেতাজি, এ-ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। এই আমার যথাসর্বস্ব।

নেতাজি বললেন—তোমার এই অসহায় জীবনে এই তিনটে টাকা ছাড়া তো আর কিছুই নেই। ভিক্ষে করতে গিয়ে কত মুখ-ঝামটা খেয়েছ। সবকিছু সহ্য করে সারা জীবনে মাত্র এই তিনটি টাকা জমিয়েছ। তোমার এই শেষ সম্বল আমি নিই কী করে, মা?

ভিখারিনী বলল—সবাই কত কী দিচ্ছে। আমি দিচ্ছি তো মাত্র তিনটে টাকা। তুমি টাকাটা নাও, নেতাজি।

নেতাজির চোখ ফেটে জল এল। সারা দেহ কাঁপছে। থরথর করে কাঁপছে হাতও। সেই কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি নিঃস্ব বৃদ্ধার দিকে। বৃদ্ধা নেতাজির হাতে টাকা তিনটে দিয়ে আনন্দে চলে গেল। নেতাজি শাহনওয়াজকে বললেন—লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকার চেয়ে এই তিনটি টাকার দাম আমার কাছে অনেক, অনেক বেশি। নোট

করে নাও শাহনওয়াজ, এই নিঃস্ব বৃদ্ধার দানই আমার পাওয়া সব দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান।

টুলো বলল—সত্যিই শ্রেষ্ট দান। এ যে ভাবাও যায় না।

ভোম্বলদা বলল—আমার কথাটি ফুরাল।

আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম—কে বলেছে তোমার কথা ফুরাল?

—তোরাই তো বলার সময় কত কথা বললি।

—তখন কি আর জানতাম তোমার কাছ থেকে এমন সুন্দর কথা শুনতে পাব? টুলো বলল।

—তা এখন কী বুঝলি?

ভুলো বলল—বুঝলাম তোমার কথা ষোলোআনাই ঠিক। সত্যিই গর্বে বুক ফুলে ওঠার মতন কথাই তুমি বলেছ।

টুলো আবার বলল—তুমি ওই সব রূপকথা ছেড়ে এবার থেকে এই ধরনের কাহিনি আমাদের শুনিও। এর মধ্যে শিক্ষার অনেক কিছু আছে।

—নেতাজির জীবনে এরকম অনেক ঘটনা আছে। ভোম্বলদা বলল, শুনলে অবাক হয়ে যাবি।

ঢোল গোবিন্দ বলল—সাধে কি আর নেতাজিকে রূপকথার রাজপুত্র বলা হয়!

ভোম্বলদা বলল—নেতাজির জীবনী পড়লে বুঝতে পারবি এরকম দেশপ্রেমিক সারা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জন্মায়নি।

আমি বললাম—তোমার এই গল্পের জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভোম্বলদা। আজ তোমাকে সত্যি-সত্যি প্রাণ খুলে খাওয়াতে ইচ্ছে করছে।

—তবে খাওয়া।

সবাই আমরা ভোম্বলদাকে খাওয়াতে রাজি হলাম।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম আমরা। যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, জীবনে এই প্রথম ভোম্বলদা এমন সুন্দর একটি ঘটনা শোনাল আমাদের।

হঠাৎ টুলো বলল—এই কাহিনি শোনার জন্যেই বুঝি তুমি চার ঘণ্টা বসেছিলে, ভোম্বলদা?

—ইয়েস।

—কার কাছ থেকে শুনলে? ঢোল গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল।

—একজন নেতাজি-গবেষকের কাছ থেকে।

ভুলো বলল—এমন সুন্দর ঘটনা বড়ো একটা শোনা যায় না। এ তো রূপকথাকেও হার মানায়।

আমি বললাম—ঘটনার মতন ঘটনা। এমন ঘটনা শুনলে মন আনন্দে ভরে যায়।

ঘটনাটা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অপূর্ব কাহিনি। এরকম ঘটনাকে রূপকথা বললে অত্যুক্তি হয় না। শুনলে কিন্তু রূপকথা বলেই মনে হয়। এই রূপকথা অমর হয়ে থাক ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে।

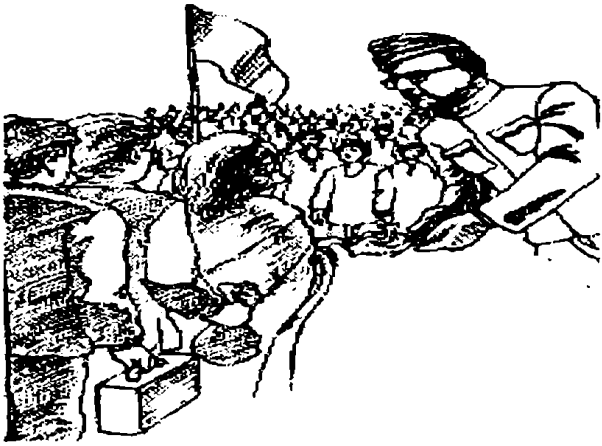

ভণ্ডুলদার কীর্তি

আমাদের সেভেন-ইন-ওয়ান ক্লাবের অনেকেই আমার সঙ্গে ভেড়িতে গেছে, যাওয়া হয়নি শুধু খেলার মাঠে ল্যাং মেরে ঠ্যাং ভাঙার ওস্তাদ বিখ্যাত ভণ্ডুলদার।

সামনেই পূর্ণিমার ভরা কোটাল। চিংড়ি ধরা পড়ে কোটালেই তা সে পূর্ণিমারই হোক বা অমাবস্যার। তবে এই কোটালে ভালোই ধরা পড়বে বলে মনে হয়। ভণ্ডুলদার বহুদিনের সখ বাগদা চিংড়ি কী ভাবে ধরা হয় তা দেখার।

তবে হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত যাদের নিয়ে ভেড়িতে গেছি তাদের মধ্যে ভোম্বলদা আর ভজাদার মতো খেল আর কেউ দেখায়নি। বৃষ্টিভেজা এঁটেল মাটিতে ভেড়ির পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আছাড় খাওয়ার সেঞ্চুরি করেছিল ভোম্বলদা। আর ভেড়িতে পাখি শিকার করতে গিয়ে ঢোঁড়া সাপ দেখে কোমর জলে হাবুডুবু খেয়েছিল ভজাদা। এমনকী গাছের ডালে একটা বেড়ালকে হরিয়াল ভেবে গুলি ছুঁড়েছিল পর্যন্ত। ওদের কাণ্ডকারখানায় হাসাহাসি করেছিলাম আমরা। আসলে ওদের ব্যাপারগুলো ছিল হাসির খোরাক। কিন্তু ভণ্ডুলদা যা করেছিল তা মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি। বাপরে বাপ, সেকী কেলেঙ্কারিয়াস কাণ্ড! সে কথায় পরে আসছি।

ভণ্ডুলদা আর আমি দুজনে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবে রাস্তায় পা দিয়েছি, এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল আমাদের সেই বিখ্যাত মূর্তিমান—মানে ভোম্বলদা। আমরা দুজনেই আকাশ থেকে পড়লাম।

—তোরা ভেড়িতে যাচ্ছিস তো?

মূর্তিমানকে তো চিনি। তাই 'হ্যাঁ' না-বলে উপায় কী!

—আমাকে না জানিয়ে কেটে পড়ছিলি?

—এতে কেটে পড়ার কী আছে? আমি বললাম, তুমি তো বেশ কয়েকবার ভেড়িতে গেছ ভোম্বলদা। ভণ্ডুলদা একবারও যায়নি। তাই...

—তাই ওকে নিয়ে যাচ্ছিস। খুব ভালো কথা। তবে আমিও যাব। মনে মনে বললাম সে কী আর বুঝতে পারিনি। ভেড়িতে যাওয়ার কথা শুনলেই তুমি পাগল হয়ে ওঠো। বাগদা চিংড়ির নামে তোমার নোলায় জল আসে। মুখে অবশ্য বললাম—চলো।

সন্ধের মুখে আমরা তিনজনে খড়িবাড়ি পৌঁছলাম। খড়িবাড়ির গা থেকে ভেড়ির শুরু। ভেড়ির পাড়ই যাতায়াতের রাস্তা। এই রাস্তা ধরেই যেতে হয় আমার ভেড়িতে। কম-সে-কম তিন কিমি হাঁটতেই হয়। অন্য একটা পথ থাকলেও আমরা এই পথেই বেশি যাতায়াত করি।

হাঁটা শুরু করলাম আমরা। দূর আকাশের গায়ে তখন জ্বলজ্বল করছে পূর্ণিমার চাঁদ। ভেড়ির বুকে চাঁদের আলো। চিক চিক করছে ভেড়ির জল। যেতে যেতে ভোম্বলদা বলল—দারুণ লাগছে, তাই না রে ভণ্ডুল?

ভণ্ডুলদার জীবনে এই প্রথম ভেড়ি দর্শন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভণ্ডুলদা বলল—অপূর্ব! ঘরের পাশে এত সুন্দর জায়গা অথচ আমরা জানি না।

ভোম্বলদা এবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ

'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু।'

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম—ব্যবসার চেয়ে ভেড়ির এই আকর্ষণই আমাকে টানে বেশি। তাই কারণে-অকারণে এত ঘন-ঘন আসি। বিশেষ করে চাঁদনি রাতে ভেড়ির বিউটিই আলাদা।

—এক্কেবারে খাঁটি কথা বলেছিস। ভণ্ডুলদা বলল, আঃ! এই সুন্দর

জ্যোৎস্না-রাতে ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়ায় মনটাই যেন অন্য রকম হয়ে যায়। এবার থেকে মাঝেমধ্যে তোর ভেড়িতে আসব রে হুলো।

যেতে যেতে এরকম নানা কথা বলছিলাম আমরা।

ভেড়িতে পৌঁছে দেখি ফড়িং বসে আছে। আমাকে দেখেই হাসি-হাসি মুখ করে কাছে এল।

ফড়িং সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। ওর পুরো নাম ফড়িং কাচার। আমার ভেড়ির পাশেই ছোট্ট একটা ভেড়ির মালিক ও। কলকাতা থেকে ভেড়িতে যাওয়ার সময় আমি বরাবরই কিছু খাবার-টাবার সঙ্গে নিয়ে যাই। নিয়ে যাই কিছু ওষুধপত্তরও। কিন্তু ফড়িংয়ের জ্বালায় রীতিমতো অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। প্রথমে ওকে দিতে হয় খাবার, তারপরেই ওষুধ। এ এক অদ্ভুত আবদার। বলতে গেলে এই আবদার এখন দাবিতে পৌঁছেছে। এতদিন এ কথা আমি কাউকে বলিনি বা বুঝতেও দিইনি। তবে আমার ভেড়ির লোকজন কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল। মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে তারা বেশ অসন্তুষ্ট। এবার অবশ্য আমি ভেড়িতে আসার সময় ফড়িংয়ের ব্যাপারটা ভণ্ডুলদাকে খুলেই বলেছিলাম। সব শুনে ভণ্ডুলদা অবাক হয়ে বলেছিল—সুস্থ শরীরে কেউ কি ওষুধ খায়?

—ওষুধ কেন, পরের পয়সায় ও বিষও খেতে পারে। তা ছাড়া আমি তো নিয়ে যাই অ্যান্টাসিড-ট্যাবলেট আর ডাবরের হজমালা। দুটোই তো খেতে ভালো। বিশেষ করে হজমালা তো খুবই মুখরোচক।

—এবার অন্য দাওয়াই দে। কড়া জোলাপের ট্যাবলেট নিয়ে চল। টের পাবে বাছাধন পরের পয়সায় খাওয়ার মজাটা।

ভেড়িতে পৌঁছে আমরা একটু ঘোরাঘুরি করলাম। ফড়িং কিন্তু নট নড়ন-চড়ন। একই ভাবে বসে আছে। কিছুটা ঘোরাঘুরির পর আমরা এসে মাচার উপর বসলাম। আমি বসলাম ফড়িংয়ের পাশে।

একটু পরে চা এল। চা পানের সময় দরবেশ আর বিস্কুটের প্যাকেট

বের করলাম। ফড়িং তিড়িং করে আমার আরও কাছে এল। চা-টা খেয়ে যথারীতি জিজ্ঞেস করল—দাদা, পেটটা একটু গোলমাল করছে। ওষুধ এনেছেন নাকি?

—অবশ্যই। ওষুধ ছাড়া আমাকে কবে ভেড়িতে আসতে দেখেছ?

—তা ঠিক। তা হলে...

—তা হলে পাবে। এখন তুমি তোমার ভেড়িতে যাও। আমি ভোম্বলদা আর ভণ্ডুলদাকে নিয়ে একটু পরেই তোমার কাছে আসছি।

ফাজলামিতেও ওস্তাদ ফড়িং। হঠাৎ বলে উঠল—ওরে বাবা, 'ভ' ছাড়া তো আপনার কোনো দাদা-ই নেই দেখছি। ভজাদা, ভোম্বলদা, ভণ্ডুলদা...সবই তো 'ভ'। মানে ভয়।

—ভয়েরই ব্যাপার বুঝলে ফড়িং। ভোম্বলদার গায়ের জোর, ভজাদার বন্দুকের নল আর ভণ্ডুলদার বুদ্ধির বল টের পেয়েছে অনেক খল। কী বুঝলে?

—আমার আর বুঝে কাজ নেই। আমি চলি। বলে যেতে যেতে ফড়িং বলল—ওষুধ নিয়ে যেতে কিন্তু ভুলবেন না দাদা।

বলতে গেলে প্রায় ফড়িংয়ের মতোই উড়ে চলে গেল ফড়িং।

ভোম্বলদা বলল—বুঝলি হুলো, একনম্বরের ধান্দাবাজ তোর এই ফড়িং।

—ধান্দাবাজ বলে ধান্দাবাজ। আমি ভেড়িতে এলে আর দেখতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বডি ফেলবে এখানে। খাওয়া তো আছেই—সেই সঙ্গে ওষুধগুলো পর্যন্ত শেষ করবে। চিজ একখানা বটে!

ভণ্ডুলদা বলল—এবার বাছাধনকে এমন জোলাপ দেব যে ভুলেও আর হুলোর কাছে খাওয়ার নাম করবে না।

ভোম্বলদা বলল—কী ব্যাপার বল তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

ভোম্বলদাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম। ভণ্ডুলদার প্ল্যান মতো

কড়া জোলাপের ওষুধ নিয়ে এসেছি, তা-ও জানালাম। এখন দু-চারটে ট্যাবলেট পেটে গেলেই টের পাবে বাছাধন। ওষুধ খাওয়ার শখ একেবারে মিটে যাবে।

—ভেরি গুড আইডিয়া। ভোম্বলদা বলল, তবে ভেবে দ্যাখ। ও যে বলল ওর পেট গোলমাল করছে। তার উপর আবার...

—ধুর-ধুর, ও একনম্বরের গুলবাজ। ভণ্ডুলদা বলল, আমি তো হুলোর মুখে সব শুনেছি। ওর চালাকি ঠাণ্ডা করে দেব। ভণ্ডুল কী জিনিস, টের পাবে হাড়ে-হাড়ে।

আমি বললাম—তবুও ভেবে দ্যাখা দরকার, ভণ্ডুলদা।

—ভাবা-টাবার কিছু নেই। বহু জিনিসই তো আমি ভণ্ডুল করেছি আজ পর্যন্ত, সে সব তোরা জানিস। এ তো একটা সামান্য ব্যাপার।

—ঠিক আছে। আমি বললাম, তুমি এ ব্যাপারে মাস্টার। তোমার কথাই শেষ কথা।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আলোয় আমরা ফড়িংয়ের ভেড়ির দিকে পা বাড়ালাম। ভেড়িতে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই গদগদ হয়ে ফড়িংয়ের সেকী আপ্যায়ন—আসুন, আসুন। আমার কী সৌভাগ্য, একসঙ্গে তিনজনের আবির্ভাব! এ যে দেখছি পর্বতই নেমে এসেছে মহম্মদের কাছে।

লেখাপড়া না জানলেও কথার ফুলঝুরিতে কিছু কম যায় না ফড়িং। মুখে যেন খই ফোটে।

হঠাৎ ফড়িং আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল—ওষুধটা এনেছেন তো দাদা? আজ আপনি আরামবাগের চিকেন আনবেন বলে গেছিলেন।

আমি জবাব দেওয়ার আগেই আবার বলে উঠল—জানেন ভোম্বলদা-ভণ্ডুলদা, দাদার আনা-ওষুধ খেলেই খিদে বেড়ে যায়।

টেস্টও দারুণ।

কথাটা মিথ্যে বলেনি ফড়িং। অম্বল বা হজমের ওষুধ খেলে হজম ভালো হয়, খিদেও বাড়ে।

ভণ্ডুলদা বলল—এবার আরও খিদে বাড়বে। নতুন এই ওষুধটা দারুণ খিদে বাড়ায়। এটা চুষে খায় না, জল দিয়ে খেতে হয়। চারটে ট্যাবলেট একবারে খেয়ে নাও। তা হলে খুব তাড়াতাড়ি ভালো অ্যাকশন হবে।

ভণ্ডুলদা ওর হাতে চারটে ট্যাবলেট দিল। আরামবাগের চিকেনের ছবি ওর সামনে ভেসে উঠল। আর তর সয়! সঙ্গে সঙ্গে চারটে ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিল ফড়িং।

তারপর যা হওয়ার তাই হল। ঘর আর পায়খানা—পায়খানা আর ঘর। প্রথম দিকে দু-চারবার সুড়ুৎ করে পায়খানায় ঢুকে ফুড়ুৎ করে বেরোতে লাগল। কিন্তু তারপর...তারপর লুঙ্গি-টুঙ্গি নষ্ট করে হুড়ুম করে ঢুকতে গিয়ে দুড়ুম করে পড়ল পায়খানার সামনে। ফড়িংয়ের মুখে কথা নেই। নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। যায়-যায় অবস্থা।

ভণ্ডুলদাও নিস্তেজ। ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপছে। মুখ শুকিয়ে গেছে ভোম্বলদারও। ফড়িংয়ের কিছু হয়ে গেলে আর রক্ষে নেই। ভণ্ডুলদার ভণ্ডুলগিরি চিরদিনের মতো শেষ। পাবলিকের ডাণ্ডার ঠেলায় ঠাণ্ডা হয়ে যেতে হবে।

এর পরের ঘটনা খুবই বেদনাদায়ক। ফড়িংকে নিয়ে আমরা হাসপাতালে গেলাম। সেকী সাংঘাতিক অবস্থা! বলতে গেলে যমে মানুষে টানাটানি। কিছু না খেয়ে সারা রাত হাসপাতালেই কেটে গেল সকলের।

ফড়িং আস্তে আস্তে সুস্থ হল। ডাক্তার বলল, বিপদ কেটে গেছে। আমরা ফড়িংকে দেখতে ভিতরে ঢুকলাম।

ঢুকেই আমি বললাম—ফড়িং, আর ভয় নেই। দু-একদিনের মধ্যেই

তোমাকে ছেড়ে দেবে।

ফড়িং ভণ্ডুলদার দিকে চেয়ে মুখে করুণ হাসি এনে বলল—ভণ্ডুলদা, আর কোনো নতুন ওষুধ বেরোয়নি তো?

ভণ্ডুলদা ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল। ভণ্ডুলদার কান্না দেখে আমি খ্যাঁক করে হেসে ফেললাম। বললাম—এখনও তোমার ওষুধ খাওয়ার শখ আছে নাকি?

—আবার! ফড়িংয়ের মুখে ম্লান হাসি।

—যাক, বাঁচা গেল। তোমার ওষুধ খাওয়ার নেশা কাটল আর ভণ্ডুলদার ভণ্ডুলগিরিও এবার থামবে মনে হয়। কী ভণ্ডুলদা, তাই তো?

—আবার! প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ভণ্ডুলদা বলল, জোলাপ দিতে গিয়ে আমি নিজেই জোলাপ খেয়ে গেছি রে।

—বুঝলি ভণ্ডুল, তোর জন্যে আমার মুরগীর মাংস খাওয়াটা মাঠে মারা গেল। নোলার জল টানতে টানতে ভোম্বলদা বলল, 'আরামবাগের চিকেন...আহ্ মুরগী-বাহ্ মুরগী'...

—আবার তোমার সেই খাই-খাই রোগ। আমি বললাম, এই রোগের জন্যেই ফড়িংকে দাওয়াই দিতে গিয়ে প্রায় দমদম দাওয়াই খাওয়ার অবস্থা হয়েছিল আমাদের। এরপরও তোমার আবার খাবার লোভ!

ভোম্বলদা আমাদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল—বাপ রে বাপ, আবার!

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

মাছ-চুরির রহস্য

বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ টুলো, রকেট আর আমি ক্লাবে এসে হাজির হলাম। আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ তখনও আসেনি। আর কেউ বলতে ভোম্বলদা আর ভণ্ডুলদা। শুধু ওদের দুজনেরই আসার কথা। এবার ভেড়িতে যাওয়ার আগে আমরা সবাই মিলে বসে একটু আলোচনা করতে চাই। সত্যি-ই আলোচনার বিশেষ দরকার।

এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে আমার ভেড়িতে। সেই জন্যেই টুলো আর ওর মাসতুতো ভাই রকেটকে ভেড়িতে নিয়ে যাব বলে ঠিক করেছি। তবে ভোম্বলদা আর ভণ্ডুলদার সঙ্গে কথা বলে, দরকার হলে ওদের দুজনকেও নিয়ে যেতে পারি।

আসলে এই সময় মানে নভেম্বর মাসে বাগদাচিংড়ির ভেড়ি-ছেঁচা শুরু হয়। ভেড়ির পুরো জল ছেঁচে ফেলে সব মাছ ধরে নেওয়া হয়। পরের বছরের জন্যে আবার নতুন করে ভেড়ি 'অকসান' হয়।

নভেম্বর শেষ হতে চলেছে। এখনও কিন্তু আমার ভেড়ি-ছেঁচা শুরু হয়নি। শুরু করেনি আমার মতো আরও অনেক ভেড়ির মালিক। কেউ কেউ আবার কিছুটা ছেঁচে বন্ধ করে রেখেছে।

অবশ্য এর পিছনে এক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা শুনলে লোকে হাসবে। আমিও প্রথমে হেসেছিলাম। পরে কিন্তু সে হাসি থেমে গেছে আমার। সেই কথাই বলছি এখন।

ব্যাপারটা সত্যি-ই অদ্ভুত। ভেড়ি ছেঁচে ধরা মাছগুলো হাপরে (বিরাট বড়ো খালুইতে) রাখার পর আপনা আপনি মাছগুলো হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। পাহারা দিয়েও কিছু লাভ হচ্ছে না। সবার চোখের সামনে থেকেই মাছ চুরি হয়ে যাচ্ছে। যেন পি. সি. সরকারের ম্যাজিক। চোখের সামনেই সব ভানিস! ভেড়ি-মালিকদের মাথায় হাত! একী অদ্ভুত ব্যাপার! তাই ভেড়ি-ছেঁচা প্রায় বন্ধ। কে জানে কার মাছ কখন

হাওয়া হয়ে যাবে! এ নিয়ে কি কম জল্পনা-কল্পনা চলছে! কিন্তু চললে কী হবে! এখন পর্যন্ত কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ওই অঞ্চলের অনেকেরই ধারণা এটা অপদেবতার কাজ। নিশ্চয় মেছোপেত্নী এ সব করে চলেছে। তাই বহু ভেড়ির মালিকই ওঝা-টোঝার শরণাপন্ন হচ্ছে। কিন্তু ফল যথা পূর্বং তথা পরম্। অর্থাৎ মাছ-চুরি বন্ধ হচ্ছে না।

বিজ্ঞানের যুগে আমি তো আর ওই সব বুজরুকি মানতে পারি না। আর মেনেই বা লাভ কী! ফল তো সেই শূন্য। অর্থাৎ মাছ-চুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না। তাই টুলোর মাসতুতো ভাই রকেটকে নিয়ে যাচ্ছি রহস্য ভেদের জন্যে।

এবার রকেটকে কেন নিয়ে যাচ্ছি সে সম্বন্ধে একটু খুলে বলা দরকার। রকেট বিজ্ঞানের ছাত্র। দারুণ মেধাবী। বাড়ির ছাদের উপর কিছুটা জায়গা ঘিরে একটা ছোটোখাট ল্যাবরেটরি তৈরি করেছে। বলতে গেলে দিনরাত সেখানেই পড়ে থাকে। নানা রকম গবেষণা করে। ইতিমধ্যে কী সব নাকি আবিষ্কারও করেছে। আর রকেটের কাজকর্মের গতিও রকেটের মতো। চটপট ও অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। অসাধারণ ওর বুদ্ধি। অনেকে পাঁচ দিনে যা বুঝে উঠতে পারে না, ও নাকি পাঁচ মিনিটেই তা বুঝতে পারে। তবুও ওর বুদ্ধির সঙ্গে ভোম্বলদার গায়ের জোর আর ভণ্ডুলদার ভণ্ডুল করার কৌশল একসঙ্গে আমি কাজে লাগাতে চাই। কারণ, ব্যাপারটা খুবই জটিল। তাই আমরা তিনজনেই ভোম্বলদা আর ভণ্ডুলদার জন্যে অপেক্ষা করছি। তা ছাড়া ভোম্বলদা তো গোয়েন্দাগিরিও করে।

কিন্তু নভেম্বরের শেষে দিনের আয়ু বেশ কিছুটা কমে যায়। সূর্যও কেটে পড়েছে কিছুক্ষণ আগে। তাই কুয়াশা গায়ে মেখে সন্ধ্যা নেমেছে হিমেল আমেজ নিয়ে।

টুলো আমাকে বলল—হুলো, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব ওদের

জন্যে? একে ভেড়ির অঞ্চল, তার উপর ঠাণ্ডাও বেশ পড়েছে। ছাদে রাত জেগে উল্কাবৃষ্টি দেখতে গিয়ে আবার শরীরও...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ক্লাবে ঢুকল ভোম্বলদা আর ভণ্ডুলদা। ভোম্বলদার ক্লাবে ঢুকেই সিংহনাদ—বোগাস!

—কী বোগাস? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—আবার কী! ওই সব গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপার-স্যাপার। যেমন হয়েছে সব জ্যোতিষী তেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা—ওরা সবাই সমান। কারও কথার দাম নেই। সবাই ধাপ্পাবাজ। ওদের ফোরকাস্ট তো দেখতেই পেলাম। ১৭ই নভেম্বর গভীর রাতে কলকাতার অন্ধকার ফুঁড়ে পূর্ব আর উত্তর-পূর্ব আকাশে নাকি দেখা যাবে আলোর ঝর্ণাধারা। ১৬ই নভেম্বর যা-বা একটু দেখা গেল, ১৭ই তো ফুস—মানে কিচ্ছু দেখা গেল না। আঁধার আকাশে আলোর আল্পনা জল্পনা-কল্পনাই রয়ে গেল।

—ভোম্বলদা, ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। রকেট বলল, হিসেবের গোলমাল একটু-আধটু হতেই পারে। গ্রহ-নক্ষত্রের পজিসনও সময়ের সঙ্গে ষোলোআনা তাল নাও রাখতে পারে। তার মানে এই নয় যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষীদের মতো আবোল-তাবোল বকে।

—তা নয় তো কী? জ্যোতিষীদেরও তো পাঁচটা ভবিষ্যদ্বাণীর দুটো-তিনটে মিলে যায়। তা হলে তফাতটা কোথায়?

—তফাতটা আছে বৈকি! বিরাট তফাত। আকাশ-পাতাল তফাত। এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। জ্যোতিষীরা এক নম্বরের ফোরটোয়েন্টি। ধাপ্পাবাজি আর ধান্দাবাজি ছাড়া ওদের মধ্যে কিচ্ছু নেই। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঠিক তার বিপরীত। ওঁরা একটা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কাজ করেন। লোক-ঠকানোর জন্যে আন্দাজে ঢিল মারেন না। জ্যোতিষীদের মতো ব্যবসা করে পয়সা কামানো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য নয়।

—তুই যা-ই বল রকেট, এবারের উল্কাবৃষ্টির ব্যাপার রীতিমতো হতাশ করেছে মানুষকে।

—দেখতে না-পাওয়ার জন্যে তুমি হতাশ হতে পারো ভোম্বলদা। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে হতাশ হওয়াটা ঠিক না। তাঁরা নির্দিষ্ট পথ ধরে চলেন। ১৬ তারিখে কি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা মেলেনি?

—ঠিক আছে। ভোম্বলদা বলল, ভেড়ির মাছ-চুরির হদিশ করতে পারলে তোর কথা ষোলোআনাই মেনে নেব।

রকেট বলল—চেষ্টা তো করবই। আশাকরি ক্লু-ও পাওয়া যেতে পারে।

ভেড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনায় বসলাম আমরা। ঠিক হল ওরা চারজনই আমার সঙ্গে ভেড়িতে যাবে। কালবিলম্ব না করে ক্লাব থেকে রওনা হলাম সবাই ভেড়ির উদ্দেশ্যে।

ভেড়িতে যখন পৌঁছলাম রাত তখন সাড়ে আটটা। ভেড়ির জল অনেক কমিয়ে ফেলা হয়েছে। অবশ্য সেটাই নিয়ম। ভেড়ি-ছেঁচার আগে জল কমানো হয়। চাঁদের আলোয় অল্প জলে প্রচুর মাছের ছোটাছুটি দেখা যাচ্ছে। একটা বিরাট ভেটকিমাছকে ছুটতে দেখে নোলার জল টেনে ভোম্বলদা বলল—ইস, এই মাছ চুরি হয়ে গেলে কার না বুকে লাগে রে! রকেট, চোর তোকে ধরতেই হবে। ধরে তুই শুধু আমার হাতে ছেড়ে দিবি। তারপর দ্যাখ কী ভাবে চোরের হাড়-মাস আলাদা করি।

—ধরতে পারলে তো হাড়-মাস আলাদা করবে! টুলো বলল, ঘটনা তো সবই শুনেছ। চোর ধরাটা অত সহজ নয় ভোম্বলদা। তুমি নিজেও গোয়েন্দাগিরি করে ধরার চেষ্টা করো না!

—আলবাত করব।

রকেট বলল—এ সব কথা এখন ছাড়ো। কাজের কথায় আসা যাক। হুলো, তোর পুরো ভেড়িটা আমাকে ভালো করে দ্যাখা। মাছ

ধরে রাখবি কোথায়...পাহারা কী ভাবে দেওয়া হবে...কতজন লোক পাহারায় থাকবে—সব আমাকে বুঝিয়ে দে।

আমি সব বুঝিয়ে দিলাম। তারপরই রকেট মাছ কোথায় রাখা হবে সে জায়গাটা আমাকে দেখিয়ে দিল। আমরা কে কোথায় থাকব তা-ও বলে দিল। শুধু ও নিজে কোথায় থাকবে সে কথা কাউকে বলল না। আর ভোম্বলদা থাকল ওরই সঙ্গে।

রাত দশটা থেকে ভেড়ির একাংশ ছেঁচে ফেলে সেখানকার মাছ ধরা হল। রকেট যেখানে মাছ রাখার কথা বলেছিল সেখানেই একটা বড়ো হাপরে (মাছ রাখার যন্ত্র) মাছ রাখা হল। তারপর হাপরের পাশে কড়া পাহারা। ভেড়ির চারপাড়েও লোক রাখা হল।

মাঝরাত। চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। চাঁদের আলো এসে পড়েছে ভেড়ির উপর। চিকচিক করছে ভেড়ির জল। ভেড়ির এখানে-ওখানে আমরা ঘাপটি মেরে আছি। তবে রকেট আর ভোম্বলদা যে কোথায় আছে তা জানি না, জানার কথাও নয়। এটাই রকেটের নির্দেশ। আর এখন সবকিছুই চলছে রকেটের নির্দেশে।

এমন ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মধ্যেও কেমন যেন একটা থমথমে ভাব—একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ। হঠাৎই মনে হল মাথাটা যেন কেমন ঝিমঝিম করছে, চোখ দুটো বুজে আসছে। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞানও হারালাম।

চেতনা ফিরে পেলাম চোর-চোর বলে বিরাট চিৎকারে। চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এল আমার কাছে। কারণ, কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আমি-ই পাহারা দিচ্ছিলাম মাছের হাপর। আর চিৎকারটা উঠেছিল হাপরের কাছ থেকেই। চেয়ে দেখি রকেট আর ভোম্বলদা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। দুজনের চোখে নীল চশমা।

রকেট বলল—তোর মাছ-চোরকে ধরেছি. হুলো। এই দ্যাখ।

ভোম্বলদা বাঁ-হাতে জামার কলার ধরার মতো করে বলল—এবার

যাবে কোথায়, বাছাধন?

আমরা সবাই অবাক। কোথায় চোর আর কোথায় কী! রকেট আর ভোম্বলদা কী আবোল-তাবোল বকে চলেছে।

টুলো বলল—আরে, চোরটা কোথায়? আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা দেখছি ফাঁকা মাঠে লাঠি ঘুরিয়ে চলেছ।

রকেট বলল—ফাঁকা মাঠ কোথায় রে? এদিকে আয়।

টুলো রকেটের কাছে যেতেই রকেট টুলোকে তার চশমাটা পরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে টুলো চেঁচিয়ে উঠল—আরেব্বাস, এই তো চোর। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ভোম্বলদা চোরটার কলার ধরে আছে।

বুঝলাম রকেটের আবিষ্কার সফল। এই চশমা দিয়েই অদৃশ্য জিনিস দেখা যায়। আমিও ভোম্বলদার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার চশমাটা চেয়ে নিয়ে চোখে দিলাম। তারপর চোরের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম।

একী! নিজের চোখকেই যে বিশ্বাস করতে পারছি না। এ কি স্বপ্ন না সত্যি! ওনার মতো লোক মাছ চুরি করবেন কোন দুঃখে! আশ্চর্য!

আমাকে হতবাক দেখে রকেট জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার রে হুলো? চোরটাকে দেখে তুই যেন আকাশ থেকে পড়লি বলে মনে হচ্ছে।

—পড়ারই কথা।

—কেন? কী ব্যাপার?

—ব্যাপার শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ইনি ডাক্তার ভেল্কি সর্দার। এই অঞ্চলের বিখ্যাত ডাক্তার এবং নামী লোক। একটি রাজনৈতিক দলের লোকাল কমিটির সেক্রেটারিও।

আমার কথা শুনে সবাই অবাক। হইচই থেমে গিয়ে ফিসফিসানি শুরু হল।

আমি ডাক্তার সর্দারকে জিজ্ঞেস করলাম—ডাক্তারবাবু, আপনি!

ডাক্তারের মুখে কোনো কথা নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন মাথা নিচু করে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কেন এমন কাজ করছিলেন ডাক্তারবাবু?

এবার উনি কেঁদে ফেললেন। ভদ্রলোকের চোখে জল দেখে আমার কষ্ট হল। মানুষটিকে আমি চিনি দীর্ঘদিন ধরে। ভেড়ি-সংক্রান্ত ব্যাপারে উনি কি আমাকে কম সাহায্য করেছেন! পরোপকারী দরাজ মনের মানুষ ডাক্তার ভেল্কি সর্দার। গরিবের মা-বাপ। তাদের চিকিৎসা-ওষুধপত্তরের জন্যে একটা পয়সাও নেন না। সেই লোকের এই কাজ! এ তো স্বপ্নেরও অগোচর—ভাবাই যায় না।

আমি এবার অনুরোধের সুরে বললাম—ব্যাপারটা খুলেই বলুন না ডাক্তারবাবু।

লজ্জায় ডাক্তার সর্দারের মুখ লাল হয়ে গেছে। জলভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—কী আর বলব হুলোবাবু, লোভ—লোভের জন্যেই আজ আমার এই দশা।

—বলেন কী! টাকা-পয়সার তো কোনো অভাব নেই আপনার। তা হলে কীসের লোভে এ কাজ করছেন আপনি?

—নামের লোভে।

—নামের লোভে!

—হ্যাঁ, ওই নেশায় ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়েছিলাম।

—সেকী!

—ঠিকই বলছি হুলোবাবু। আসলে পার্টি-ফাণ্ডের জন্যেই এই কাজ করেছি। সাধারণ লোকের কাছ থেকে তো এখন টাকা-পয়সা বড়ো একটা পাওয়া যায় না। সবার মুখে এক কথা, বাজারে জিনিসে হাত দেওয়া যায় না—সবকিছুর আকাশ-ছোঁয়া দাম। সংসার চালানোই দায়। পার্টি-ফাণ্ডে টাকা দেব কোত্থেকে মশাই! অথচ আমাকে আমার

'কোটা'র টাকা জমা দিতেই হবে। এবং সেই অঙ্কটা বিরাট। আর এই বিরাট অঙ্কের টাকাটা দিতে না পারলে হয়তো সামনের ইলেকশনে 'নমিনেশন' না-ও পেতে পারি।

—সেকী! আমি তো জানি এমন পার্টি আছে যাদের কাছ থেকে টাকায় নমিনেশন মেলে না। যোগ্যতায় মেলে।

—সব পার্টি তো তা নয় হুলোবাবু। যোগ্যতা আর কটা পার্টি দ্যাখে! তা দেখলে কি আর ফিল্মের নায়ক-নায়িকারা নমিনেশন পায়?

—তা ঠিক। তবে কী দরকার এ ভাবে ইলেকশনে দাঁড়ানোর! কিছু রাজনৈতিক দলের চরিত্র তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। আর ইলেকশন তো এখন...

আমাকে থামিয়ে রকেট বলল—ডাক্তারবাবু, আপনি অদৃশ্য হওয়ার ওষুধটা পেলেন কোথায়?

—ওষুধটা আমি নিজেই তৈরি করেছি। আমি বাড়িতেই একটা ল্যাবরেটরি বানিয়েছি। পাখি-বেড়াল-গিনিপিগ—সবই আছে সেখানে। দুটো জিনিস নিয়ে আমি অনেক দিন ধরে গবেষণা করে চলেছি। মানুষের 'উড়ে চলা' আর 'অদৃশ্য হওয়া'। প্রথমটা এখনও 'সাক্সেসফুল' হয়নি। তবে দ্বিতীয়টায় আমি পুরো সফল।

—কতক্ষণ থাকে আপনার এই ওষুধের অ্যাকশন?

—সেটা ওষুধের উপাদানগুলো মেশানোর উপর নির্ভর করে। তবে তিন ঘণ্টার কম নয়, সাড়ে চারঘণ্টার বেশিও নয়।

—একটা কথা বলতে চাই ডাক্তারবাবু। রকেট বলল, আপনার ওষুধের ফর্মুলাটা কি জানতে পারি?

—নিশ্চয়ই, রকেটবাবু। আপনার মতো একজন বিজ্ঞানীকে জানাতে পারলে আমি খুশিই হব। আমি তো আমার এই সৃষ্টি দিয়ে অন্যায় অশুভ কাজে মেতে উঠেছিলাম। আমি চাই আপনি এটা নিয়ে ভালো কাজ করুন। তা হলে শুনুন আমার ওষুধটার ফর্মুলা—

ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, নাক্স-ভমিকা টিনচার, এক্সট্রাক্ট অব গরগনাসস, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, পায়রার ডিম, ডাইনোসরের ডিমের খোলা আর তালের রস।

রকেট বলল—ধন্যবাদ ডাঃ সর্দার। আপনি যে অদৃশ্য হওয়ার ওষুধ খেয়ে চুরি করছিলেন সেটা বুঝেই আমি এই ভেদক চশমা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। এটাই আমার আবিষ্কার। আর আপনি যখন ওষুধের ফর্মুলাটা আমাকে বলছেন তখন আমারও কর্তব্য চশমার ফর্মুলাটা আপনাকে বলা। চশমাটা তৈরি করেছি ভল্লুকের লোম, বাঘের নখ, কুমিরের ছাল, হাতির দাঁত, কাঁচের গুড়ো আর সামান্য নীল রঙ দিয়ে।

হঠাৎ টুলো বলল—এ সব ফর্মুলার কথা শুনে আমাদের কী লাভ, বল হুলো? তার চেয়ে বরং মাছ-চুরির সময় সবার একসঙ্গে ঝিমুনি ভাবটা এল কেন—সেটা শুনলে কাজে লাগবে।

—ব্যাপারটা আমি জানি এবং বলতেও পারি। বলল রকেট, তবে ডাঃ সর্দারের মুখ থেকেই শোনা ভালো।

ডাক্তার সর্দার শুরু করলেন—তবে শুনুন। মাছ-চুরির সময় অদৃশ্য চোরকে কেউ দেখতে পাবে না ঠিকই, কিন্তু মাছের লাফালাফির শব্দ তো শুনতে পাবে। তখন চোরকে ধরতে না পারলেও হাপর শুদ্ধ মাছ তো ধরা পড়ে যাবে। যন্ত্রটাকে তো অদৃশ্য করা যায় না। তাই ক্লোরোফরমের মতো একটা ওষুধ ভেড়ির লোকজনের সামনে এসে স্প্রে করতাম। ওরা কিছুক্ষণের জন্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ত। আর সেই ফাঁকে আমি আমার কাজ সেরে ফেলতাম। অর্থাৎ, মাছ নিয়ে সরে পড়তাম।

—ভেড়ির চারপাশ ঘুরে আমাদের সবাইকে যখন ওষুধ স্প্রে করে অজ্ঞান করলেন তখন রকেট আর ভোম্বলকে করলেন না কেন? ভণ্ডুলদা জিজ্ঞেস করল।

উত্তরটা রকেটই দিল—উনি তো আমাদের দেখতেই পাননি।

ডাক্তারবাবু যে এরকম একটা ওষুধ স্প্রে করতে পারেন তা বুঝে আমি ভোম্বলদাকে নিয়ে ওই বড় গাছটায় চড়ে গা ঢাকা দিয়েছিলাম। তা ছাড়াও এই চশমা পরে ওনার সব গতিবিধি লক্ষ করছিলাম। না হলে ওনাকে ধরলাম কী করে!

ভোম্বলদা বলল—যাক, মাছ-চুরির রহস্য জানা গেল। সেই সঙ্গে রহস্যভেদও হল। তবে হুলো, আমার কিন্তু ওই বড়ো ভেটকিটা চাই।

—দূর ঘোড়াড্ডিম! ভণ্ডুলদা বিরক্ত হয়ে বলল, সব সময়ই তোর খাই-খাই। আমার এখনও একটা ব্যাপার জানা হয়নি। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সবাই যে একই সময়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ত সেটা আজ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি কেন? এর মধ্যে কী রহস্য আছে?

—এর মধ্যে কোনো রহস্য নেই। বললেন ডাঃ সর্দার, এটা একটা সোজা হিসেব। সময়টা মাঝরাত। ওই সময় জেগে থাকার চেষ্টা করলেও একটা ঘুম-ঘুম ভাব আসে। তাই সবারই মনে হয়েছে নিজেরাই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ওষুধের ব্যাপারটা কারও মাথায় আসেনি। তবে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ—দয়া করে এই ব্যাপারটা প্রকাশ করবেন না। তা হলে আমার মান-সম্মান একেবারে ডুবে যাবে। আমি মাছ বেচে যে টাকা পেয়েছি তার ডবল টাকা দিয়ে দেব।

—কাকে দেবেন? ভণ্ডুলদা জিজ্ঞেস করল, দিতে গেলেই তো ধরা পড়ে যাবেন।

—না, ধরা পড়ব না। ধরা-পড়ার ব্যাপারেই যাব না। আমার কথাটা শুনলেই বুঝতে পারবেন।

—বলুন তা হলে। ভোম্বলদা বলল।

—শীত তো এসেই গেছে। আপনারা সবাই আমার সঙ্গে থাকবেন। গরিবদের মধ্যে আমি কম্বল বিতরণ করব। গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের বই-খাতা কিনে দেব। যে পাপ আমি করেছি তার জন্যে আমি অনুতপ্ত ও

মর্মাহত।

রকেট জিজ্ঞেস করল—আপনার ওষুধের অ্যাকশন আর কতক্ষণ আছে ডাক্তারবাবু?

—মিনিট পনেরো। হাতঘড়ি দেখে বললেন ডাঃ সর্দার।

—এখান থেকে আপনার বাড়ি পৌঁছতে কত সময় লাগবে?

—দশ-বারো মিনিট।

—তা হলে আপনি বেরিয়ে পড়ুন। আপনার যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। অনুশোচনাই পাপের সবচেয়ে বড়ো প্রায়শ্চিত্ত।

ডাঃ সর্দার চলে যেতেই আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম নামের লোভে মানুষ কী-না করতে পারে! হায় রে নামের লোভ!

ভোম্বলদা বলল—নামের লোভ বড়ো লোভ।

রকেট বলল—খাঁটি কথা বলেছ। তবে মনে হয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেই নামের লোভটা সবচেয়ে বেশি।

টুলো বলল—সেখানে যে ক্ষমতা লাভের লড়াই থাকে সব সময়। ক্ষমতাই তো শেষ কথা।

ভণ্ডুলদা বলল—সেই জন্যেই মনে হয় রাজনীতিতে ল্যাং মারামারি এত বেশি।

আমি বললাম—রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের মধ্যে ল্যাং মারামারি থাকলেও খেলার মাঠে ফুটবল প্লেয়ারদের তোমার মতন ল্যাং মেরে কেউ ঠ্যাং ভাঙে না।

ভণ্ডুলদা বলল—আমি তো শুধু ল্যাং মেরে প্লেয়ারদের ঠ্যাং ভাঙি রে, এরা যে দেশটারই ঠ্যাং ভেঙে ফেলছে।

একসঙ্গে আমরা সবাই বলে উঠলাম—ভণ্ডুলদা জিন্দাবাদ।

শঠে শাঠ্যং

ঠিক যেন লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুনের লড়াই। সাজো-সাজো রব—টানটান উত্তেজনা। দু-দলের প্রতিটি প্লেয়ারই মরিয়া—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ভাব। অর্থাৎ, জিততেই হবে—জেতা ছাড়া গতি নেই।

হ্যাঁ, আমাদের গোলপার্কের সেভেন-ইন-ওয়ান ক্লাব আর উড়ে পাড়ার ফক্স-ব্রাদার্সের ফুটবল খেলার কথাই বলছি। এই দু-দলের খেলার কথা যার জানে তারা নিশ্চয় এ-ও জানে যে ব্যাপারটা সত্যি-সত্যি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচের মতোই উত্তেজনায় ভরা। খেলার সময় দু-দলের প্লেয়ারদের স্নায়ুযুদ্ধ তুঙ্গে ওঠে। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। সমর্থকদের অবস্থা প্লেয়ারদের মতোই হয়ে ওঠে। হৃদ্‌কম্প শুরু হয়ে যায়। খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সব সময় মনের মধ্যে কী হয়—কী হয় ভাব। সেকী উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা!

ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি।

এই গল্পে আমাদের ক্লাবের ব্যাপার-স্যাপার একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। অন্যান্য গল্পে অবশ্য তার প্রয়োজন হয়নি। তাই সেই সব গল্পে ক্লাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিনি। কিন্তু এখানে ক্লাব সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ না দিলে গল্পটা বুঝতে অসুবিধে হতে পারে। সুতরাং আমাদের ক্লাবের ছবিটা স্পষ্ট করে তুলে ধরলাম এখানে।

আমাদের ক্লাবের নাম সেভেন-ইন-ওয়ান। ক্লাবের সম্পাদক ভোম্বল ঘোষ—মানে আমাদের ভোম্বলদা। ক্লাবের নাম তারই দেওয়া। সত্যিই নামটা সার্থক। কারণ, সপ্তাহের সাত দিনে সাতরকমের প্রোগ্রাম হয়। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত এক-একদিন এক-এক রকমের প্রোগ্রাম। কোনোদিন তাস খেলা, কোনোদিন ক্যারাম পেটানো, কোনোদিন আবার বিতর্ক-সভা।

রবিবারটা সাহিত্যের আসর। আমরা কয়েকজন রবিবাসরের মেম্বার। ভোম্বলদা যেখানেই থাকুক না কেন, অন্য কোনোদিন ক্লাবে আসুক বা না-ই আসুক, শনি-রবি—এই দুদিন ক্লাবে আসবেই আসবে। শনিবারে থাকে নাটকের রিহার্সাল। আর রবিবারে হয় সাহিত্য-আলোচনা। এ দুটোতেই ভোম্বলদা অংশগ্রহণ করে। ভোম্বলদার চাপে অবশ্য আমরাও শেষ পর্যন্ত নাটকে পার্ট করেছি। তবে ক্লাবে আমাদের নানা রকম প্রোগ্রাম হলেও ফুটবলের ধারেকাছে যাইনি আমরা কখনও। কারণ, ভোম্বলদা। ভোম্বলদার বক্তব্য—বলে বেশি হেড দিলে বুদ্ধি নাকি ভোঁতা হয়ে যায়। অর্থাৎ, কবিতা-টবিতা আর মগজে ঢুকবে না। তাই ফুটবলের নামগন্ধ ছিল না আমাদের ক্লাবে। কিন্তু এই ভোম্বলদাই পরে ফুটবল টিম গড়ল। আর সেই টিমই রাতারাতি সাড়া জাগাল ফুটবল-মহলে।

মাত্র বছর তিনেক আগে আমাদের ফুটবল টিমের জন্ম। এরই মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সেই টিমের নাম। আমাদের টর্নেডো-আক্রমণ সামলাতে যে কোনো টিমই হিমসিম খেয়ে যায়। এই তিন বছরের মধ্যে কারও কাছে হারিনি আমরা। শুধু গোটা চারেক ম্যাচ ড্র করেছি। টিম গড়ে প্রথমেই ত্রিশঙ্কু কাপে খেলার জন্যে আমরা নাম এন্ট্রি করি। ব্যস, প্রথম আবির্ভাবেই আমরা ত্রিশঙ্কু কাপ চ্যাম্পিয়ান এবং পরের বছরও। অর্থাৎ, পর পর দু-বছর চ্যাম্পিয়ান। এবার জিতলে তিনবার হবে—মানে হ্যাটট্রিক। এর আগে দু-বারই ফাইনালে বিখ্যাত ফক্স-ব্রাদার্সকে হারিয়েছি আমরা। এবারও তাদেরই মুখোমুখি ত্রিশঙ্কু কাপে। ফক্স-ব্রাদার্স বরাবরই ফেভারিট ছিল। বহুবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। আমাদের মতো পর পর দু-বার ত্রিশঙ্কু কাপও পেয়েছে—কিন্তু হ্যাটট্রিক করতে পারেনি। এবার আমাদের সামনে সেই হ্যাটট্রিকের সুযোগ। হ্যাটট্রিক করতে পারলে আমাদের গায়ের জ্বালা মিটবে।

উঃ, গায়ের জ্বালা বলে জ্বালা। ফক্স-ব্রাদার্সকে পর পর তিনবার হারিয়ে হ্যাটট্রিক করা মানে চার বছর আগের সেই অপমান আর পরাজয়ের ঝাল মেটানো। চার বছর আগের সেই দুঃস্বপ্নের দিনটির কথা মনে পড়লে আজও ব্যথা-বেদনায় বুকটা টনটন করে ওঠে। বলতে গেলে আমরা প্রায় সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রতিজ্ঞার সুরে ভোম্বলদা বলেছিল এই অপমানের বদলা আমরা নেবই নেব। নিয়েছি। সত্যি-ই বদলা আমরা নিয়েছি। দু-দুবার ফক্স-ব্রাদার্সকে আমরা হারিয়েছি। এবার হারাতে পারলে চরম বদলা নেওয়া হবে।

কেন এই বদলা নেওয়া—সে কথাই বলব এখন। সে এক অদ্ভুত কাহিনি। হঠাৎ আমাদের ক্লাবের কিছু ছেলে ফুটবল খেলায় মেতে ওঠে। বিনা কোচে নিজেরাই অনুশীলন করে আর কাছাকাছি বেশ কিছু ছোটোখাটো টিমের সঙ্গে খেলে বেড়ায়। আমরা ও নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাও ঘামাইনি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড ঘটল। দুম করে ত্রিশঙ্কু কাপে নাম এন্ট্রি করল ওরা। আর পড়-না-পড় প্রথম খেলাই পড়ল দুর্ধর্ষ ফক্স-ব্রাদার্সের সঙ্গে। কোথায় ফক্স-ব্রাদার্স আর কোথায় তখন আমাদের সেভেন-ইন-ওয়ান! যেন পর্বতের সামনে মুষিক। সেকী দুরবস্থা আমাদের টিমের!

খেলা শুরু হতে-না-হতেই গোল... গোল... বলে জোর চিৎকার ফক্স-ব্রাদার্সের সমর্থকদের। হ্যাঁ, বিশ সেকেণ্ডের মাথায় গোল খেয়ে গেলাম আমরা। এক গোলে এগিয়ে গেল ফক্স-ব্রাদার্স। তারপর শুধু গোল আর গোল! ফক্স-ব্রাদার্স গোলের মালা পরিয়ে দিল আমাদের। পুরো এক ডজন গোল হজম করলাম আমরা। একটা ম্যাচে বারোটা গোল খাওয়া মানে মান-সম্মান ধুলোয় মিশে যাওয়া। তাই হল। খেলার শেষে আমাদের সমর্থকরা যখন ছি-ছি বলে ধিক্কার দিচ্ছিল

আমাদের, ওদের সমর্থকরা তখন হি-হি করে হাসছিল।

থ্রী চিয়ারস ফর ফক্স-ব্রাদার্স—হিপ হিপ হুররে... বলে ওরা যত চেঁচাচ্ছিল আমাদের মাথা ততই হেঁট হচ্ছিল। আর সেই সঙ্গে যে সব বিচিত্র শ্লোগান দিচ্ছিল তা শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। যেমন—এক ডজন গোল খেল কারা... সেভেন-ইন-ওয়ান... আবার কারা... সেভেন-ইন-ওয়ান খায় গোল... ভোম্বল বসে বাজায় ঢোল...

ব্যস, সেই দিনই ক্লাবে এসে নিজমূর্তি ধারণ করল ভোম্বলদা। সব কটা প্লেয়ারকে এই মারে তো সেই মারে। বাজখাঁই গলায় সিংহনাদ করে বলল—তোরা ভেবেছিস কী মনে? ফুটবল খেলা নিয়ে চালাকি? এ কি ক্লাবে বসে তাস খেলা বা ক্যারাম পেটানো? বলা নেই, কওয়া নেই দুম্ করে অত বড়ো একটা টুর্নামেন্টে খেলতে গেলি কোন আক্কেলে? ছি-ছি-ছি-এক ডজন গোল...

কারও মুখে কোনো কথা নেই। সবাই মাথা নিচু করে বসে আছে।

—শাস্তি! হ্যাঁ, শাস্তি তোদের পেতেই হবে। জরুর পেতে হবে। ভোম্বলদা পায়চারি করতে লাগল।

যারা খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল ভয়ে তারা একেবারে জড়োসড়ো হয়ে গেল।

ভোম্বলদা বলে উঠল—ফাইন...ফাইন দিতে হবে তোদের। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল সবাই। ভয়ে ভয়ে খাজা জিজ্ঞেস করল—কী ফাইন দিতে হবে ভোম্বলদা?

—কী আর দিবি? ভোম্বলদা শান্ত কণ্ঠে বলল, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন ফুটবল আর জার্সির টাকা লাগবে। সেই টাকার ব্যবস্থা করবি। মাঠে যখন একবার নেমেই পড়েছিস তখন লড়তে তো হবেই। পিছিয়ে তো আর আসা যায় না। বারো গোলের বদলা নিতেই হবে। আমরা ফুটবল টিম গড়ব। আর এই ত্রিশঙ্কু কাপেই ফক্স-ব্রাদার্সকে গো-হারা হারাব। কী বুঝলি?

'ভোম্বলদা জিন্দাবাদ' বলে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

এর পরই জন্ম হল আমাদের সেভেন-ইন-ওয়ান ক্লাবের ফুটবল টিমের।

আজ ত্রিশঙ্কু কাপ ফাইনাল। আজই টিমের চরম অগ্নিপরীক্ষা। জিতলে বাজি মাৎ—ত্রিশঙ্কু কাপে রেকর্ড—পর পর তিনবার জয়। তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ফক্স-ব্রাদার্সকে হারিয়ে এক ডজন গোলের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে রীতিমতো তেতে আছি আমরা।

সে কী উৎসাহ আমাদের! কাকভোরেই অনুশীলনে বেরিয়ে পড়েছিলাম সবাই। আকাশে তখন জেগে ছিল অনেক তারা। সাতসকালেই অনুশীলন সেরে ক্লাবে জড়ো হয়েছি আমরা। আজ এসপার কি ওসপার একটা কিছু করবই।

টুলোর জন্যে অপেক্ষা করছি সবাই। অনুশীলন সেরে টুলো কোথায় যেন গেছে—এসে পড়লেই টিম-মিটিং শুরু হবে। সেই ফাঁকে দুটো টিম সম্বন্ধে কিছু বলে রাখা দরকার।

ত্রিশঙ্কু কাপে আমাদের সেভেন-ইন-ওয়ান আর ফক্স-ব্রাদার্স—এই দুটি দলই বেশ শক্তিশালী। দু-দলই অপরাজিত থেকে ফাইনালে উঠেছে। তবে তুলনামূলকভাবে ফক্স-ব্রাদার্স থেকে অনেকটা এগিয়ে আমরা। আমরা ফাইনালে পৌঁছেছি অতি সহজে—প্রতিটি ম্যাচে চার-পাঁচ গোলে জয়ী হয়ে। আর ওরা ফাইনালে উঠেছে হোঁচট খেতে খেতে—সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে জিতে। সেদিক থেকে আমরা ফেভারিট। আমাদের টিম-স্পিরিটও দারুণ। প্রতিটি প্লেয়ারের মনোবল তুঙ্গে। তবুও খেলা বলে কথা। কখন কি হয় বলা যায়! পচা শামুকেও পা কাটে অনেক সময়। যখন-তখন অঘটন ঘটে যেতে পারে।

বিশেষ করে ওদের লিকলিকে-ডিগডিগে জুটি আর পটল-ভ্রাতৃদ্বয় দুর্ধর্ষ। পটল-ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে গোল করা সোজা কথা নয়। আর স্ট্রাইকার লিকলিকে-ডিগডিগে জুটি কোন

ফাঁকে যে বল জালে জড়িয়ে দেবে বলা মুশকিল। এ বছর এই চার প্লেয়ারই দারুণ ফর্মে। ইতিমধ্যেই লিকলিকে-ডিগডিগে জুটি বিশ্বকাপের চিলির সা-জা জুটির মতো লি-ডি জুটি হয়ে গেছে। তবে লি-ডি জুটি যত দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকারই হোক, আমাদের গোলকিপার ভোম্বলদাকে বিট করাও অত সহজ নয়—ভোম্বলদা একাই একশো। সাড়ে ছ-ফুটের ভোম্বল ঘোষ পুরো গোলমুখটা জুড়ে দাঁড়ায়। ডিফেন্সে ভণ্ডুলদা একটা স্তম্ভ। বিপক্ষের সব আক্রমণ ভণ্ডুল হয়ে যায় ভণ্ডুলদার সামনে। চোরাগোপ্তা মারেও ভণ্ডুলদা ওস্তাদ। সাড়ে চার ফুটের ভণ্ডুল বোস হেড করার সময় সাড়ে বারো ফুট পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠে। দেখার মতো দৃশ্য। দর্শকদের হাততালিতে মাঠ ফেটে যায়। মিডফিল্ডের প্রতিটি প্লেয়ারই হীরের টুকরো। টুলো তো অসাধারণ। আমিও কম যাই না। বাকিরাও দারুণ। মোদ্দাকথা এই দুর্ধর্ষ মিডফিল্ড আর দুর্ভেদ্য ডিফেন্স টপকে আমাদের সীমানায় ঢোকা যে কোনো প্লেয়ারের পক্ষেই মুশকিল। আর ফরোয়ার্ড! ভুলো মাঠে নামতে-না-নামতেই মারাদোনা-মারাদোনা বলে চিৎকার ওঠে। ওর পাশে ঢোল গোবিন্দর বিপজ্জনক দৌড় বিপক্ষ শিবিরে ত্রাসের সৃষ্টি করে। আর সেই সঙ্গে ধনুকের জ্যা-র মতো হালুয়ার ব্যাকভলি গোলে ঢোকার সময় গোলকিপারকে নড়ার সুযোগ দেয় না। এর উপর আছে আমাদের কোচ ত্রিভুজদার ভোকাল টনিক আর ত্রিভুজের মতো ডিফেন্স সাজানো। ওই ত্রিভুজ ভেঙে গোল করা সোজা কথা নয়। বাইচুং-বিজয়নদের মতো স্ট্রাইকাররাও হিমশিম খেয়ে যাবে।

এই হল আমাদের টিমের ছবি। আমাদের আটকায় কে! ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে যাব আমরা।

আমি বললাম—ত্রিশঙ্কু কাপে জয়ের হ্যাটট্রিক করে আজকের দিনটি স্মরণীয় করে রাখব।

—অত সহজ নয়। আমাদের রাইট স্টপার গজা বলল, লিকলিকে-

ডিগডিগে জুটির বল ধরে রানিং মানে বিপক্ষের ক্রায়িং।

—রাখ তোর লি-ডি জুড়ির রানিং। ভণ্ডুলদা বলে উঠল, আমার ফ্লাইংয়ের সামনে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে লাইং হয়ে যাবে ওরা। ডাইং হওয়াও বিচিত্র নয়।

হঠাৎ ভুলো বলল—শুনলাম ওরা নাকি নতুন সিস্টেমে খেলবে।

ভণ্ডুলদা জিজ্ঞেস করল—নতুন সিস্টেমটা কী?

—প্ল্যাটিনাম সিস্টেম।

—সোনাতেই হাত দেওয়া যায় না, আবার প্ল্যাটিনাম! হেসে উঠল ভণ্ডুলদা।

—ঠাট্টা নয়। ভুলো বলল, প্ল্যাটিনাম সিস্টেম নাকি যে কোনো দলের কাছেই ত্রাসের কারণ হতে পারে।

—হতে পারে। আমি বললাম, ব্রাজিল-ফ্রান্স-ইতালি-আর্জেন্টিনার কাছেও হতে পারে।

হো-হো করে হেসে উঠল সবাই।

ভুলো বলল—তোমরা হাসো-কাঁদো যা-ই করো, আমার দেখার দরকার নেই। আমি যা শুনেছি তাই বলেছি। এবার কোচ যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।

চুপচাপ বসে এতক্ষণ সবার কথা শুনছিল কোচ ত্রিভুজদা। এবার বীরবিক্রমে বলে উঠল—রাখ ওদের প্ল্যাটিনাম সিস্টেম। ও সব আমার দ্যাখা আছে। এতদিন তা হলে কোন সিস্টেমে খেলেছিল ওরা?

ভুলো বলল—এই সিস্টেমটা নাকি লুকিয়ে রেখেছিল। ফাইনালে দেখাবে আসল খেলা।

—গত দু-বছর যে ওরা ফাইনালে আমাদের কাছে হারল, তা হলে সেটা কি নকল খেলা খেলেছিল?

ভোম্বলদা বলল—একখানা কথার মতন কথা বলেছ ত্রিভুজদা।

আমি বললাম—জিতলে শত বুদ্ধি, হারলে হত বুদ্ধি।

—রাইট। একেবারে খাঁটি কথা বলেছিস হুলো। ত্রিভুজদা বলল, জিতলে সবার পায়েই যাদু, হারলে গোটা টিম হাঁদু। ছাড় ও সব কথা। ও রকম কথা আমি অনেক শুনেছি। আমার লৌহ ত্রিভুজ সিস্টেমের মধ্যে পড়লে সিলভার-গোল্ড-প্ল্যাটিনাম—সবকিছুই ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে।

—খাঁটি কথা। একদম খাঁটি কথা। ভোম্বলদা বলল, আমাদের ত্রিভুজের মধ্যে পড়া মানে চক্রব্যূহে পড়া।

—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে অভিমন্যু বধ। হাসতে হাসতে বলল ভণ্ডুলদা।

—তবে তুই অভিমন্যু বধ কর আর যা-ই কর—পেনাল্টি-বক্সের বাইরে করবি। ভোম্বলদা বলল, ম্যাও পোহাতে হবে তো আমাকে—মানে গোলকিপারকে। তোর আর কী! তুই তো মেরেই খালাস।

—ঠিক বলেছে ভোম্বল। ত্রিভুজদা বলল, এর আগে তোর জন্যেই দু-দুবার বিপক্ষ দল পেনাল্টি পেয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। দু-বারই গোল বাঁচিয়েছে ভোম্বল। তাই বুঝেসুঝে খেলবি। উলটোপালটা একদম মারবি না। লাল কার্ড দেখলে আর রক্ষে নেই। সব শেষ হয়ে যাবে একেবারে। তা ছাড়া কোচ হিসেবে আমি বলছি কোনো প্লেয়ারকে মারাটা ঠিক না। তেমন ভাবে মারাত্মক মার খেলে প্লেয়ারের ভবিষ্যৎই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আমাদের লেফট ব্যাক খাজা—মানে খাজাউদ্দিন বলল—ডিফেন্সের দায়িত্ব অনেক বেশি। একটু এদিক-ওদিক হলে সব শেষ।

একবাক্যে খাজার কথায় সায় দিলাম আমরা সবাই।

ত্রিভুজদা বলল—এই কথাটাই তো আমি ভণ্ডুলকে বোঝাতে চাই।

গজা বলল—ভণ্ডুলদা ভীষণ উলটোপালটা পা চালায়।

—চুপ কর। ধমকে উঠল ভণ্ডুলদা, বিপক্ষের স্ট্রাইকার যখন রকেটের মতন ছুটে আসে তখন সামাল দিতে হয় তো এই ভণ্ডুল বোসকেই। তোরা তো জার্সি ধরে টেনেও সামলাতে পারিস না—

এদিক-ওদিক ছিটকে পড়িস। এই তো তোদের দৌড়! আমার আবার দোষ ধরছিস।

—নো একসাইটমেন্ট। একেবারে মাথা গরম করবি না। ত্রিভুজদা বলল, আজ ফাইনাল খেলা। বরফের মতন মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলতে হবে। জিততেই হবে আজ। শোন ভণ্ডুল, তোর উপর অনেক দায়িত্ব।

ভণ্ডুলদা বলল—সবই ঠিক আছে। কিন্তু গজা কেন এই ভাবে...

—বাদ দাও তো ও সব কথা। আমি বললাম, তুমি ছাড়া লিকলিকে-ঠেংগডিগেকে আটকাবে কে?

ত্রিভুজদা বলল—রাইট। তুই তো আমাদের ডিফেন্সের স্তম্ভ। তোর কি এই সব কথায় মাথা গরম করা শোভা পায়!

হালুয়া বলল—এখন কি মাথা গরম করার সময়! কাজের কথা বলো।

—ঠিক বলেছিস। হালুয়ার কথায় সায় দিলাম আমি।

ভোম্বলদা বলল—কয়েক ঘণ্টা পরে যুদ্ধ শুরু হবে। এখন যুদ্ধ জয়ের স্ট্রাটেজি কষতে হবে আমাদের। কী বলো, ত্রিভুজদা?

—ঠিক কথা।

হঠাৎ খাজা বলল—ওদের গোলকিপার হাঁদারাম হাঁড়ি কিন্তু সেই মাটির হাঁড়ি নেই, স্টিলের হাঁড়ি হয়ে গেছে। এ বছর দুর্ধর্ষ ফর্মে আছে ও। দেখলে না, সেমি ফাইনালে টাইব্রেকারে একটা গোলও খায়নি হাঁদারাম। হাঁদা তো সবার মুখে কাদা মাখিয়ে বিশ্ব-রেকর্ড করে ফেলল।

—কথাটা মিথ্যে বলিসনি। ত্রিভুজদা বলল, নতুন করে স্ট্রাটেজির কথা ভাবছি।

ঢোল গোবিন্দ বলল—তুমি যা-ই ভাবো ত্রিভুজদা, আজ কিন্তু ফক্স-ব্রাদার্স ছেড়ে কথা কইবে না। সহজে জিততে দেবে না আমাদের।

ভণ্ডুলদা বলল—রাখ তোর ফক্স-ব্রাদার্স। এমন তাড়া করব যে

জঙ্গলে ঢুকে যাবে।

—জঙ্গলে ঢোকার আগেই যদি খ্যাঁক করে কামড়ে দেয়, তা হলে তো সব শেষ। হালুয়া বলল, লি-ডি জুড়ি ছাড়াও আছে ওদের পটল-ভ্রাতৃদ্বয়। ওদের কাটিয়ে গোল করা...

কথা শেষ হওয়ার আগেই ভণ্ডুলদা আবার বলে উঠল—রাখ তোর আলু-পটল। ওদের পেনাল্টি-বক্সের মধ্যে ভুলোর পায়ে বল পড়লে আলু-পটলকে ইষ্টনাম জপ করতে হবে।

—শুধু ইষ্টনাম জপ! আমি বললাম, আলু-পটল গলে ঘ্যাঁট হয়ে যাবে। কী বলো ত্রিভুজদা?

বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়ল ভোম্বলদা—তোরা ভেবেছিস কী মনে? এখন কি এই সব ফালতু আলোচনার সময়! তুমিও তো দেখছি আচ্ছা লোক ত্রিভুজদা, চুপচাপ বসে খোস গল্প শুনছ। কিছুক্ষণ পরে খেলা। তুমি কোচ—আসল কথা বলো।

—ঠিকই বলেছিস ভোম্বল। ত্রিভুজদা শুরু করল, আজ তোদের হাতেই সেভেন-ইন-ওয়ানের মান-সম্মান। সবাই তোরা ক্লাবের মেম্বার। অন্ধকারে তোরাই আমার আলো। তোরাই আমাকে আশা-ভরসা দিবি, তোরাই আমাকে বিজয়ের বাণী শোনাবি। আজ আমরা 'ত্রিমুকুট' লাভ—থুড়ি, পর পর তিনবার বিজয়ী হয়ে হ্যাটট্রিক করব ত্রিশঙ্কু কাপে।

তেতেই ছিলাম আমরা। ত্রিভুজদার ভোকাল-টনিকে আরও তেতে উঠলাম। এ-ব্যাপারে ত্রিভুজদার জুড়ি খুঁজে পাওয়া দায়। কী করে প্লেয়ারদের তাতিয়ে তুলতে হয় তা ভোকাল-টনিক মাস্টার ত্রিভুজদা খুব ভালো করেই জানে।

ত্রিভুজদা আবার শুরু করল—প্রথম থেকেই আমরা ফক্স-ব্রাদার্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। 'ট্রায়ো মুভে' আক্রমণ শানাব। তবে আমিও এই খেলায় নতুন কৌশল অবলম্বন করব। দেখবি, বিপক্ষের নাভিশ্বাস

উঠবে।

হঠাৎ ঢোল গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল—কৌশলটার নাম কী ত্রিভুজদা?

—নাম-টাম পরে জানবি।

—তবুও...

—তবুও-টবুও ছাড়। আমি ফক্স-ব্রাদার্সের কোচ নই। নিজেকে জাহির করতে চাই না। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, মুখেন মারিতং জগৎ—এই নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। লম্বা-চওড়া কথা শুনতে আমার বিরক্ত লাগে। কাজের লোক আমি। কাজ বুঝি। কথার ফুলঝুরি দিয়ে কাজ হয় না। খেলার সময় টের পাবি কৌশলটা কী। তারপরই নাম শুনবি।

তপ্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল ত্রিভুজদা। উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার সুর আছে কথার মধ্যে। চোখে-মুখেও ফুটে উঠেছে অস্বস্তির ছাপ। আসলে বেলা যত বাড়ছে, ত্রিভুজদার মেজাজের পারাও চড় চড় করে তত উঠে যাচ্ছে উঁচুর দিকে।

আমরা আর কথা বাড়ালাম না। ভোম্বলদা শুধু বলল—নতুন কৌশলটা আমাদের বুঝিয়ে দাও ত্রিভুজদা।

—বোঝাতেই তো চাই। আর সেই জন্যেই তো মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

—কেন? গজা আর খাজা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

—তা-ও বুঝতে পারছিস না?

—না। গজা-খাজার সঙ্গে আমরাও মাথা নাড়ালাম।

—টুলো—ওই টুলোটার জন্যেই তো মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গেছে আমার। ত্রিভুজদা বলল, আক্কেল দেখেছিস ছোঁড়াটার? অনুশীলন শেষে 'একটু পরেই আসছি' বলে কোথায় চলে গেল, এখন পর্যন্ত তার পাত্তা নেই। কয়েক ঘণ্টা পরে খেলা শুরু হবে। আমাদের

স্ট্র্যাটেজি কী, তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে না?

সত্যি-ই তো। কয়েকঘণ্টা পরেই খেলা আরম্ভ হবে। আর এখনও টুলোর দেখা নেই। কথায় কথায় আমরা সেটা খেয়ালই করিনি।

বোমা ফাটার মতো ফেটে পড়ল ভোম্বলদা। বাজখাঁই গলায় সেকী চিৎকার! করবেই তো চিৎকার। করাটাই স্বাভাবিক। সে-ই তো টিমের ক্যাপ্টেন। আমরাও গজ গজ করতে লাগলাম।

ত্রিভুজদা বলল—টুলোর জন্যে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব? এবার আমি তোদের নতুন কৌশলটা বুঝিয়ে দিই।

—তাই ভাল। বলল ভোম্বলদা, আসুক আজ টুলো। টের পাবে মজাটা। ওকে আর খাতির নয়।

—ঠিকই বলেছিস ভোম্বল। ও ভাবে, ওকে ছাড়া বুঝি টিম অচল। তা না হলে ফাইনাল ম্যাচের দিনে কেউ কি এরকম করতে পারে? ভণ্ডুলদার সেকী তড়পানি!

—টুলোকে আজ শাস্তি পেতে হবে। আজ ওকে বসিয়ে দেব। বিরক্তি আর রাগের ব্লেন্ড-করা আওয়াজ ঝরে পড়ে ত্রিভুজদার কণ্ঠ থেকে।

—গোটা টিমটাকেই আজ বসিয়ে রাখতে হবে। বলতে বলতে ক্লাবে ঢুকল টুলো।

—তার মানে? চোখ পাকিয়ে উঠল ত্রিভুজদা।

—মানে শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

—কী বলতে চাস তুই? সারাটা সকাল আড্ডা মেরে এখন এসে ধানাই-পানাই বকতে শুরু করেছিস! তিরিক্ষি মেজাজে কথাগুলো বলল ত্রিভুজদা।

—অযথা আড্ডা মারা আর ফালতু কথা বলার মতন ছেলে আমি অন্তত নই—তা তোমরা সবাই ভালো করেই জানো। টুলোও বেশ উত্তেজিত।

ভুলো বলল—কয়েক ঘণ্টা পরে খেলা শুরু হবে। তোর দেখা নেই। বুঝতেই তো পারছিস ত্রিভুজদার মনের অবস্থা। কী হয়েছে ব্যাপারটা খুলে বল।

—হবে আবার কী! বিরক্তি প্রকাশ করে ত্রিভুজদা।

—বিরক্ত হয়ে কোনো লাভ নেই। হয়েছে—অনেক কাণ্ড হয়েছে।

—তা হলে কাণ্ডটা বলেই ফেল। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি শুনতে আমার ভালো লাগে না।

—ভালো লাগুক আর না-লাগুক, শুনলে কুপোকাত হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা জানার জন্যে আমরা তখন ছটফট করছি। হঠাৎ ভোম্বলদা বলে উঠল—ব্যাপারটা কী বলবি তো!

—আজকে মাঠে ফক্স-ব্রাদার্স নামেই থাকবে, কাজে থাকবে সুপার ডিভিশনের সব প্লেয়ার।

—তুই কী করে জানলি? আমরা অনেকে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

—কাল মাঝরাতে ছিঁচকে আমাকে ফোন করেছিল। বলল, এবার আর তোরা ত্রিশঙ্কু কাপ পাচ্ছিস না।

—কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ছিঁচকে বলল—ব্যাপারটা দারুণ কনফিডেনসিয়াল। তুই কাল সকালেই আমার কাছে চলে আয়। তাই অনুশীলন সেরেই ছিঁচকের বাড়িতে গিয়ে সব জানতে পারি। ফক্স-ব্রাদার্সের প্লেয়ারের মধ্যে থাকবে শুধু লিকলিকে-ডিগডিগে, পটল ভ্রাতৃদ্বয় আর গোলকিপার। বাকি ছটা প্লেয়ারই ভাড়া করা।

—আমাদের ভয়ে তা হলে ফক্স-ব্রাদার্সের এখন এমন দুরবস্থা! গজা বলে উঠল।

খাজা বলল—দুরবস্থা কী বলছিস? ওরাই তো আজ মাতিয়ে দেবে। মাঠে আমাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।

—চুপ কর। ধমক মারল ত্রিভুজদা, ছিঁচকের কথা যে সত্যি তার প্রমাণ কী?

—প্রমাণ আছে। ওদের কোচ বাগাড়ম্বর হাঁড়ি ছিঁচকের মামার শালা।

—ওঃ এই কথা। মামার শালা পিসের ভাই তার কথায় কোনো বিশ্বাস নাই। ত্রিভুজদার সেকী অট্টহাসি!

ভণ্ডুলদাও খ্যাঁকশিয়ালের মতো খিক-খিক করে হেসে উঠল।

বিরক্ত হয়ে টুলো বলল—যত হাসি তত কান্না, বলে দিচ্ছে এই শর্মা। মাঠে গেলেই টের পাবে আমার কথা সত্যি না মিথ্যে। তবে শুনে রাখো, ওই সব নামী প্লেয়ারদের আমি নিজের চোখেই সকালে ওদের ক্লাবে ব্রেকফাস্ট করতে দেখেছি। আরও শুনে রাখো, আজ মাঠে রেফারি-লাইন্সম্যান থাকবে বেকার, আকার আর সাকার।

—সর্বনাশ! ভোম্বলদা চমকে উঠল, ওই বেকার তো ভণ্ডুলকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। এমনকী গতবারের ফাইনালে হালুয়ার ব্যাক-ভলিতে করা ন্যায্য গোলটা নাকচ করে দিল এই রেফারি। বলে কিনা ডেনজারাস প্লে! আকার-সাকার দুই লাইন্সম্যানও তথৈবচ। ফক্স-ব্রাদার্সের প্রতি ওদেরও দুর্বলতা আছে।

ভণ্ডুলদাও সুর মেলাল ভোম্বলদার কথায়—ওরাই আজ আমাদের ডুবিয়ে দেবে।

—অন্যায়—ভারী অন্যায় এটা। ত্রিভুজদার সিংহনাদে কেঁপে উঠল ক্লাব ঘর, এইভাবে চালাকি করে আমাদের হারাবে! আমরা প্রতিবাদ জানাব। এটা কি মামাবাড়ির আবদার! যা খুশি তাই করলেই হল।

—ঠিক কথা। ক্ষোভে ফেটে পড়ে ভুলো, এ তো দেখছি আমাদের হারানোর জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। জোর করেই আমাদের হারাবে।

ঢোল গোবিন্দ বলল—ব্যাপারটা সন্দেহজনক। তলে-তলে কিছু লেনদেন হচ্ছে বলে মনে হয়।

—হতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়। ত্রিভুজদা বলল, যে দেশে বহু মন্ত্রীই ঘুষখোর সেখানে সবকিছুই সম্ভব। তা না হলে গতকাল পর্যন্ত ঠিক ছিল আজকের খেলায় রেফারি হবে আদেশ। লাইন্সম্যান থাকবে স্বদেশ আর বিদেশ। কী অদ্ভুত ব্যাপার, রাতারাতি সব পালটে গেল!

হঠাৎ খাজা বলে উঠল—ত্রিভুজদা, তোমার নতুন কৌশলটা তো বোঝালে না।

অতি দুঃখে হেসে ফেলল ত্রিভুজদা। বলল—তুই নামে খাজা, কাজেও খাজা। এত সব শোনার পরেও তুই আবার নতুন কৌশল জানতে চাস!

—নতুন কৌশলটা আমি জানাব। ভণ্ডুলদা বলল, শোনো ত্রিভুজদা! ভোম্বল আর তোমার সাথে আমার কিছু গোপন কথা আছে।

—আর গোপন কথা শুনে কী করব বল! আমার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। হতাশার সুর ত্রিভুজদার কণ্ঠে।

—কিস্যু হবে না ত্রিভুজদা। আমার মাথায় একখানা দারুণ প্ল্যান এসে গেছে। ভণ্ডুলদার মুখে মুচকি হাসি।

—নতুন কৌশলের? বলে উঠল খাজা।

—তোর মাথা। ত্রিভুজদা বলল, শুধু নতুন কৌশল—নতুন কৌশল। আমি মরছি আমার জ্বালায়, নগেন আমার গোঁফ রেখেছে—তোর হয়েছে সেই অবস্থা। এখন ম্যাচ বাঁচানো যায় কী করে, আমি ভাবছি তাই। আর তোর মাথায় দেখছি নতুন কৌশলের পোকা কিলবিল করছে।

—নতুন কৌশলেই ম্যাচ বাঁচবে ত্রিভুজদা। বীরের মতো আস্ফালন করে উঠল ভণ্ডুলদা।

—তোরও দেখছি খাজার মতন অবস্থা। দাঁত-মুখ খিঁচোল ত্রিভুজদা, নতুন কৌশলের তুই কী জানিস?

—জানি, অনেক কিছুই জানি।

—কৌশলটাই তো এখনও আমি জানাইনি। তুই জানলি কী করে?

—এটা আমার নতুন কৌশল, তোমার নয়।

—তোর নতুন কৌশল তো আগেও দেখেছি। অনেক কিছুই তোর নতুন কৌশলে ভণ্ডুল হয়ে যায়।

—এই জন্যেই তো আমার নাম ভণ্ডুল।

ত্রিভুজদা বলল—থাম। অনেক হয়েছে। আর স্পিকটি নট।

—ঠিক আছে। তুমি আর ভোম্বল আমার সঙ্গে ঘরের ওই কোণটায় চলো। আমার কথাটা আগে মন দিয়ে শোনো। যদি মনে হয় আমার কথা ঠিক নয়, তা হলে আজকের খেলার ব্যাপারে কোনো কথাই আর আমি বলব না। মৌনব্রত অবলম্বন করব চলো।

ত্রিভুজদা, ভোম্বলদা আর ভণ্ডুলদা তিনজনে উঠে ক্লাবরুমের এককোণে চলে গেল।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি আমরা ভণ্ডুলদার কৌশলটা শোনবার জন্যে।

হঠাৎ ফিসফিস করে গজা বলল—ওদের তো প্ল্যাটিনাম সিস্টেম। আমাদের সিস্টেমের নাম কী?

খাজা বলল—কোহিনূর-টোহিনূর কিছু একটা হবে।

আমি ধমকে উঠলাম—চুপ কর। বক বক করিস না। ভোম্বলদা শুনতে পেলে আস্ত রাখবে না। একে এই টেনশন, তারপর তোদের...

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই ওরা তিনজনে বেশ হাসি-হাসি মুখে চলে এল আমাদের কাছে। ত্রিভুজদা হাল্কা মেজাজে বলল—আর কথা নয়। এবার সবাই উঠে পড়ো। ঠিক সময়ে ক্লাবে হাজির হবে।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে হঠাৎ খাজা বলল—ত্রিভুজদা, নতুন কৌশলটা...

—মাঠে গিয়ে দেখবি।

—আমাদের সিস্টেমটার নাম কী? জিজ্ঞেস করল গজা।

—ভোম্বল-ভণ্ডুল সিস্টেম।

—সেটা আবার কী! আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

ত্রিভুজদা, ভোম্বলদা আর ভণ্ডুলদার মুখে মুচকি হাসি।

গজা আবার বলল—কৌশলটা তো আমাদের জানা দরকার। তা না হলে খেলব কী ভাবে?

—না জানলেও খেলার অসুবিধে হবে না।

বিকেলবেলা। মাঠ লোকে লোকারণ্য। দু-দলের প্রচুর সমর্থক এসে জড়ো হয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। ফাইনাল খেলা বলে কথা। বেলা চারটের সময় খেলা আরম্ভ হবে। তখনও চারটে বাজেনি। তবে বাজি-বাজি করছে। দু-দলের প্লেয়ার আর সমর্থকদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। ব্যস, দেখতে দেখতে এসে গেল জিরো আওয়ার। চারটে বাজল।

পি...পি...পি... বেজে উঠল রেফারির বাঁশি। শুরু হল ত্রিশঙ্কু কাপের ফাইনাল খেলা। টুলো মিথ্যে বলেনি। সত্যি-সত্যি সুপার ডিভিসনের ছজন প্লেয়ারকে ভাড়া করেছে ফক্স-ব্রাদার্স। কয়েকজন বেশ নামী প্লেয়ার রয়েছে তার মধ্যে। ওদের সামনে আমরা তো দাঁড়াতেই পারব না।

উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ। দর্শক-ঠাসা মাঠ। কাছেই নিমতলার ঘাট। কী জানি কপালে কী আছে! খাটে চড়ে ঘাটে না যেতে হয় শেষ পর্যন্ত।

তবুও আমরাই তাড়া করলাম ফক্স-ব্রাদার্সকে। 'ট্রায়ো মুভে' আক্রমণ শানিয়েছে ভুলো, হালুয়া আর ঢোল গোবিন্দ। ছোটো ছোটো পাস খেলে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে তিনজনে।

মাঠে আমাদের সমর্থকই বেশি। সেকী উল্লাস তাদের! গোল... গোল বলে চিৎকারও উঠল। কিন্তু না, হল না—গোল হল না। আটকে দিল ফক্স-ব্রাদার্সের গোলরক্ষক। দুরন্ত হাঁদা উড়ন্ত হয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ল বলের উপর।

তারপরই টের পেলাম ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে। কোথায় আমাদের ঝোড়ো আক্রমণ আর কোথায় কী! সব ঠাণ্ডা। একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা। দেখতে দেখতে ফক্স-ব্রাদার্সের সব প্লেয়ার টর্নেডোর গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপর। যেন একপাল মত্ত হাতি। সেকী অবস্থা! গেল...গেল রব উঠল। নাভিশ্বাস ওঠার যোগাড় আমাদের। মনে হল মাঠ আর নিমতলার ঘাট প্রায় কাছাকাছি। তবুও এ যাত্রা রেহাই পেলাম ভণ্ডুলদার জন্যে। ওদের দুরন্ত একটা সট উড়ন্ত হয়ে ভণ্ডুলদা কোনোক্রমে মাথা দিয়ে আটকে দিল। টুলো সেই বল ধরে এগিয়ে দিল আমাকে। বলটা ধরতে-না-ধরতেই পটল-ভ্রাতৃদ্বয়ের এক ভ্রাতা চিলের মতো মারল ছোঁ—আমার মাথাও তখন ভোঁ। মানে ছোঁ মেরে আমার পা থেকে বলটা নিয়ে নিল। আর ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল আমার মাথা। আজ যেন আমরা খেলার খেই হারিয়ে ফেলেছি। আর ফক্স-ব্রাদার্সের চার প্লেয়ার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে সুপার ডিভিশনের প্লেয়ারদের পাশে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। মুহুর্মুহু আমাদের গোলের সামনে আছড়ে পড়ছে ফক্স-ব্রাদার্সের আক্রমণের ঢেউ। আজ আর সেভেন-ইন-ওয়ান ক্লাবকে বাঁচাতে পারবে না কেউ। আমাদের লৌহ ত্রিভুজ ভেঙে চৌচির। দিশাহারা আমরা বল খেলাই যেন ভুলে গেছি। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে গোলের মালা পরিয়ে দেবে ওরা আমাদের। এই সব খেলা তো আর টিভিতে দেখানো হয় না। দেখানো হলে, এম চ্যানেলেই খেলাটা বেশ শোভা পেত। কারণ, ওরা নাচাচ্ছে আর আমরা নাচছি।

আমাদের সমর্থকদের কথা না-বলাই ভালো। কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা তাদের। কেন্নোর মতো কুঁকড়ে গেছে প্রায় সবাই। দু-চারজন সমর্থক আবার আমাদের শুধু গাল দিয়ে ঝাল মেটাচ্ছে। সে সব গালাগালি সহ্য করতে হচ্ছে।

আক্রমণের পর আক্রমণ শানাচ্ছে ফক্স-ব্রাদার্স। চোখে শর্ষেফুল দেখছি আমরা। এভাবে আমরা আর কতক্ষণ লড়ব!

বেশিক্ষণ আর লড়তে হল না। পি...বেজে উঠল রেফারির বাঁশি। পেনাল্টি। পেনাল্টি পেয়ে গেছে ফক্স-ব্রাদার্স। ভণ্ডুলদা যা করার করে বসে আছে। যথারীতি পেনাল্টি-বক্সের মধ্যে ফাউল। ব্যস, খেল খতম। কে জানে কতগুলো পেনাল্টি পাবে আজ ফক্স-ব্রাদার্স! এই তো সবে গোলের মালা গাঁথা শুরু করবে ওরা এখন।

আমাদের নজন প্লেয়ারের মুখে বর্ষার কালো মেঘ। ভোম্বলদা আর ভণ্ডুলদার মুখে দুঃখের কোনো ছাপ নেই। ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে পেনাল্টিটা যেন আমরাই পেয়েছি ফক্স-ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে।

হঠাৎ গজা আর খাজা একসঙ্গে বলে উঠল—আমরা যে কী সিস্টেমে খেলছি তা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঢোল গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল—এখনও বুঝতে পারিসনি?

—না।

—এক্ষুনি বুঝতে পারবি। ঢোল গোবিন্দ বলল, এটা ভণ্ডুলদার নতুন পদ্ধতি—গোলের মালা-পরা সিস্টেম।

—চুপ কর। ধমকে উঠল টুলো, বকবক করিস না। দেখছিস না, বল বসাচ্ছে পেনাল্টি কিক নেওয়ার জন্যে। সট মারল বলে। উলটোদিকে মুখ করে চোখ বন্ধ কর সবাই।

সবাই আমরা চোখ বন্ধ করে সেই ভাবে দাঁড়ালাম। একটা থমথমে পরিবেশ। কী হয়—কী হয় ভাব। মুড়ির মতো মিইয়ে গেছি আমরা।

বাঁশি বেজে উঠল পি...

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলির মতো আওয়াজ হল গুড়ুম। আমরা সবাই দুড়ুম। সেই সঙ্গে মড়-মড়...মড়াৎ...শব্দ ভেসে এল আমাদের গোলের কাছ থেকে।

কী ব্যাপার! এমন তো হওয়ার কথা নয়। গোল...গোল...বলে

চিৎকার শুনতে পাচ্ছি না। শুনতে পাচ্ছি এলোমেলো চেঁচামেচি।

চোখ খুলে ঘুরে দাঁড়ালাম আমরা নজন প্লেয়ার। না, গোল হয়নি। বাঁচা গেল। কিন্তু আমাদের গোলের দিকে তাকিয়ে আমরা সবাই অবাক। ফুটবলের ইতিহাসে এরকম দৃশ্য কেউ দেখেছে কিনা জানি না, তবে আমরা দেখিনি। সত্যি সে এক দৃশ্য! গোলপোস্ট ভেঙে জাল-টাল ছিঁড়ে গেছে। বল আর ভোম্বলদা মাটিতে পড়ে আছে পাশাপাশি। আমরা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম ভোম্বলদার কাছে। ওদিক থেকে রেফারি-লাইন্সম্যান ছুটে এল। ছুটে এল কোচ ত্রিভুজদাও। আমাদের গোলের সামনে জড়ো হয়েছে ফক্স-ব্রাদার্সের সব প্লেয়ার এবং কোচ। আর ঝাঁকে-ঝাঁকে জড়ো হচ্ছে দর্শক মাঠের মধ্যে। ভোম্বলদা মিটমিট করে তাকাচ্ছে আর কাতরাচ্ছে। আমরা রীতিমতো বিচলিত। হঠাৎ ভোম্বলদার চোখে চোখ পড়তেই চোখ মারল ভোম্বলদা। বুঝলাম এর পিছনে কোনো মতলব আছে। কমিটির লোকজন আর রেফারির বাঁশির পি... পি... শত চেষ্টাতেও মাঠ থেকে সরাতে পারল না দর্শকদের। তার চেয়েও বড়ো কথা গোলপোস্টের কী হবে—জাল ছিঁড়েছে, পোস্ট ভেঙেছে। ইচ্ছে করলেই তো গোলপোস্ট এক্ষুনি তৈরি করা যাবে না। সুতরাং রেফারির লম্বা বাঁশি বাজল পি... আমরাও সঙ্গে সঙ্গে হি—মানে হি-হি। হি-হি করে আমাদের সেকী হাসি! খেল খতম—পয়সা হজম। ফক্স-ব্রাদার্সের পয়সা হজম করল ভাড়া-করা প্লেয়াররা। ঝুলে থাকল ত্রিশঙ্কু কাপের ফাইনাল খেলা।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ক্লাবে ঢুকে সবার আগেই ত্রিভুজদা কথা বলল—সংবাদটা টুলো এনেছিল বলে রক্ষে। তবে এবার দেখাব মজাটা। হাড়ে-হাড়ে টের পাবে ফক্স-ব্রাদার্স। চালাকি! যেমন কাজ তেমন ফল।

—প্ল্যানটা কার বলো? ডাঁটের মাথায় বলে উঠল ভণ্ডুলদা।

ভোম্বলদা বলল—প্ল্যানটা তোর ঠিকই। কিন্তু আমিও বলেছিলাম

গোলপোস্ট ভেঙে দেব। দিয়েছি। ভাড়াটে প্লেয়ার নিয়ে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ত্রিশঙ্কু কাপ নিয়ে যাবে—আর আমরা বসে বসে দেখব। চালাকি!

—ঠিক বলেছ ভোম্বলদা। টুলো বলল, ওদের এ ভাবে ছাড়া জব্দ করা যেত না। সোজাসুজি খেলা হলে ফল যে-কোনো দিকেই যেতে পারত। কিন্তু ওরা সে পথে গেল না। বোঝ এবার!

—খেলাটা ভণ্ডুল হয়ে ভাল হয়েছে। আমি বললাম, ব্যাটাদের শিক্ষা হল।

ঢোল গোবিন্দ বলল—যেমন কর্ম তেমন ফল।

হালুয়া বলল—ভণ্ডুলদা আজ সেরা ভণ্ডুলগিরি দেখাল।

ভুলো বলল—ভণ্ডুলদা, তোমার নামকরণ কে করেছিল?

—সত্যি-সত্যি সবকিছু ভণ্ডুল করার রাজা আমাদের ভণ্ডুল। ত্রিভুজদা বেশ মেজাজে বলল, ব্যাটাদের ল্যাং মেরে একেবারে ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছে।

আমি বললাম—'ট্রায়োমুভে'ই শেষ পর্যন্ত আমরা জিতলাম।

—মানে? জিজ্ঞেস করল ত্রিভুজদা।

—টুলোর গোয়েন্দাগিরি, ভণ্ডুলদার বুদ্ধি আর ভোম্বলদার গায়ের জোর—এই তিন মিলেই আজ আমাদের সোর।

গজা আর খাজা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—এই সিস্টেমটার নাম কী?

ত্রিভুজদা বলল—শঠে শাঠ্যং।

ওরা দুজনেই হাঁ করে ত্রিভুজদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম।

রূপকথার মতো

সেদিন ছিল রবিবার। রবিবারেই বসে আমাদের ক্লাবে সাহিত্যের আসর। আমরা কয়েকজন সাহিত্য-প্রেমিক নিয়মিতভাবে এই দিনটিতে সাহিত্য-চর্চায় মগ্ন হই।

এক-একদিন এক-এক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কবিতাপাঠ, গল্প-পড়া, রূপকথা বলা—সবই হয় আমাদের রবিবাসরের সাহিত্য-আসরে। এক-একজন এক-এক বিষয় নিয়ে বলে। সাধারণত রূপকথা বলার ভার পড়ে ভোম্বলদার উপর। সত্যি-ই রূপকথা বলে আমাদের সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় ভোম্বলদা। হাঁ করে ওর কথা শুনি আমরা।

তা সেদিন ভোম্বলদার রূপকথাই বলার পালা। কিন্তু রূপকথার বদলে কার্গিল যুদ্ধের আলোচনায় মেতে উঠলাম আমরা সবাই।

ভুলো বলল—সত্যি এতগুলো তাজা প্রাণ অকালে শেষ হয়ে গেল। ভাবলে ব্যথা-বেদনায় বুকটা টনটন করে ওঠে।

টুলো বলল—পাকিস্তান আমাদের চিরশত্রু। মনে হয় আমাদের সাথে শত্রুতা ছাড়া মিত্রতার কথা ওরা ভাবতেই পারে না। কথায় কথায় মিথ্যে বলে আর দ্যাখ-না-দ্যাখ নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে ঢোকে। শুধু অভিনয় আর মিত্রতার ভান করে।

ঢোল গোবিন্দ বলল—কী শয়তান রে বাবা! সামনে এক, পিছনে আর এক। সামনে ফুল ছড়াবে আর পিছনে বোমা মারবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর লাহোর বাসযাত্রার সময় তাঁকে জানাচ্ছে উষ্ণ অভ্যর্থনা। আর তলে-তলে আমাদের দেশেই ঢোকাচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের। সত্যি কথা বলতে কি, পাকিস্তানকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ভণ্ডুলদা বলল—ডেনজারাস কান্ট্রি।

আমি বললাম—পাকিস্তানি সৈন্যরাও মায়া-দয়াহীন। ন্যায়-নীতি

কথাটা ওদের কাছে অর্থহীন।

হঠাৎ ভোম্বলদা বলল—পাকিস্তানি সৈন্যরা যে কী সাংঘাতিক নিষ্ঠুর সে কথা তো সেবার বাংলাদেশে গিয়ে শুনেছিস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার উপর যে অত্যাচার করেছে তা এক কথায় নৃশংস।

টুলো বলল—পাকিস্তানই তো জঙ্গি তৈরি করছে।

ভুলো বলল—ওদের সঙ্গে ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্ক ভালো হলেও লাভ কিছু হবে না।

ভোম্বলদা বলল—খাঁটি কথা। ওরা আমাদের ক্ষতি-ই চায়।

—সারা জীবনই ওরা আমাদের জ্বালাবে। ভণ্ডুলদা বলল, ওদের জন্যে কি কম ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে!

—এত বড়ো ক্ষয়-ক্ষতি কি ভাবা যায়! আমি বললাম, এর জন্যে সারা দেশের এখানে-ওখানে 'কার্গিল ফাণ্ড' খুলতে বাধ্য হল বিভিন্ন সংস্থা।

টুলো বলল—আমাদেরও উচিত একটি ফাণ্ড তৈরি করা।

ভুলো বলল—নিশ্চয়ই। নিজের দেশকে, দেশের মানুষকে কে না ভালোবাসে! 'কার্গিল ফাণ্ড' আমরা গড়ে তুলবই।

—কথাটা একেবারে ষোলোআনা ঠিক। ভণ্ডুলদা বলল, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের সেই আবেগ কোথায়?

ভুলো বলল—আবেগ আছে বৈকি! নিশ্চয়ই আছে।

ভণ্ডুলদা বলল—আমার তা মনে হয় না।

টুলো বলল—কেন মনে হয় না?

—কারণটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ভণ্ডুলদা বলল, আশানুরূপ ফল লাভ হয়েছে কি?

—মানে?

—মানে জলবৎ তরলং। দেশের সঙ্কট মুহূর্তে প্রতিটি নাগরিকেরই

এগিয়ে আসা উচিত। এসেছে কী?

—কে বলে আসেনি? আমি বললাম, না এলে এত টাকা উঠল কী করে?

—কত টাকা উঠেছে? ভণ্ডুলদা বলল, এত বড়ো দেশ, যেখানে প্রায় একশো কোটির উপরে লোক বাস করে, সেখানে কত টাকা উঠেছে?

ভোম্বলদা বলল—কথাটা কিন্তু মিথ্যে বলেনি ভণ্ডুল। সত্যি-ই তো কী এমন টাকা উঠেছে! আরও অনেক বেশি টাকা ওঠা উচিত ছিল। যারা দেশের জন্যে জীবন দেয় তারাই তো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। তাঁদের জন্যে আমাদের অনেক কিছু করা উচিত।

টুলো বলল—এখন তো লোকে নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।

ভুলো বলল—ঠিক। বিলকুল ঠিক। আগে লোকে দেশের জন্যে সর্বস্ব দিয়েছে আর এখন শুধু আখের গুছিয়ে নিচ্ছে।

ঢোল গোবিন্দ বলল—সেটা ছিল দেবার যুগ আর এটা নেবার যুগ।

—রাইট। ওদের কথায় সায় দিয়ে আমি বললাম, তখন ছিল দলের চেয়ে দেশ বড়ো। আর এখন হয়েছে দেশের চেয়ে দল বড়ো। তাই আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ হয়ে উঠেছে স্বার্থপর। ফলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের আবেগ আর নেই। দানের পিছনে থাকে উদ্দেশ্য আর প্রচার।

—একেবারে মনের কথাটা বলেছিস রে হুলো। ভণ্ডুলদা বলল, একটু আগে তোকে তো আমি এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম। তা কথা যখন উঠেছে তখন খবরটা দানের ব্যাপারেই। আনন্দবাজারে প্রকাশিত একটা খবর আমি পড়ছি। কাটিংটা আমার কাছেই আছে। তোরা মন দিয়ে শোন ঃ

'স্টাফ রিপোর্টার, পটনা, ৮ জুলাই—রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আর জে ডি) সভাপতি লালু প্রসাদ যাদব স্ত্রী রাবড়িদেবীকে সঙ্গে নিয়ে কার্গিল যেতে চান। তাঁদের ইচ্ছা, জওয়ানদের পাশে দাঁড়ান। এই ব্যাপারে সম্মতি পাওয়ার জন্য তিনি ও রাবড়িদেবী প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। এ ছাড়া, দিল্লিতে তিনি সেনা-কল্যাণ তহবিলে এক কোটি টাকা দিয়েছেন। বি জে পি-র সঙ্গে টক্কর দিতেই তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন।'

এই দানের ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার। অর্থাৎ, এই এক কোটি টাকা দান করলেন লালু প্রসাদ যাদব দেশের স্বার্থে নয়, নিজের দলের স্বার্থে। তা ছাড়াও আছে তাঁর মলিন ভাবমূর্তিকে স্বচ্ছ করার চেষ্টা। তোরাই বল, এ রকম উদ্দেশ্যমূলক দানের পিছনে কি প্রাণের আবেগ থাকে?

ভণ্ডুলদার কথা শুনে ভোম্বলদা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ভণ্ডুলদাকে জড়িয়ে ধরে বলল—সারা জীবন তুই সবকিছু ভণ্ডুল করেছিস। আজ কিন্তু সত্যি-সত্যি একখানা কাজের কাজ করলি। কথার মতন কথা বললি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—হঠাৎ তোমার এত উচ্ছ্বাসের কারণ কী ভোম্বলদা?

—কারণটা বুঝতে পারছিস না?

আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম—না।

ভোম্বলদা বলল—-আজ তো আমার রূপকথা বলার দিন, তাই না?

আমরা একবাক্যে বললাম—হ্যাঁ।

—সেই জন্যেই তো এত উচ্ছ্বাস। ভণ্ডুলের জন্যেই তো কথাটা মনে পড়ল। না হলে তো ভুলেই গেছিলাম।

—মানে? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—মানে লালুপ্রসাদ যাদব। ভোম্বলদা বলল, লালুপ্রসাদ যাদবের

দানের কথা শুনতেই আমার মনে পড়ে গেল বহু কাল আগের ব্যাঙ্কক-প্রবাসী যাদব-সম্প্রদায়ের সেই দানের ইতিহাস। সেই কথাই এখন বলব। তোরা শোন ঃ

সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। শুনলে রূপকথার মতনই মনে হয়। অথচ ষোলোআনাই সত্যি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কাহিনি এটা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে পরিচালনা করছেন নেতাজি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। আধুনিক যুদ্ধ মানে অজস্র অর্থের অকুণ্ঠ অপচয়। কিন্তু নেতাজির কাছে সে টাকা কোথায়! তাই তিনি গড়ে তুলেছেন আজাদ হিন্দ্ ফাণ্ড—মানে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের তহবিল। অর্থ সংগ্রহের জন্যে দুরন্ত ঘূর্ণির মতন ছুটে বেড়াচ্ছেন নেতাজি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত।

এমনি একদিনের কথা। নেতাজি তখন ব্যাঙ্ককে। আজাদ হিন্দ্ ফাণ্ডে দান করার জন্যে তিনি প্রতিটি ভারতীয়কে আহ্বান জানালেন। সেকী আগুনঝরা পাগলকরা ডাক! 'করো সব নিছোয়ার, বনো সব ফকির।' অর্থাৎ, সর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়ে যাও। পূর্ণ করে তোলো মুক্তিযুদ্ধের ভাণ্ডার।

নেতাজির ডাক শুনে এগিয়ে এল ধনী-দরিদ্র সবাই। এগিয়ে এল হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টান। এগিয়ে এল ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীর অসংখ্য মানুষ।

এমনি করে একদিন এগিয়ে এল বিহার আর উত্তরপ্রদেশের গোয়ালা সম্প্রদায়ের লোকজন। প্রথমেই এলেন সহজ সরল একটি গোয়ালা। তাঁর কাছে আছে দুশো ডলার। এটাই তাঁর শেষ সম্বল। পুরোটাই তিনি দিতে চান আজাদ হিন্দ্ ফাণ্ডে।

দান গ্রহণ করছিলেন নেতাজির সহকর্মী মেজর জেনারেল চ্যাটার্জি। তিনি বললেন—শেষ সম্বলের সবটা দিলে আপনার চলবে

কী করে ভাই? আপনি বরং একশো ডলার আজাদ হিন্দ্ ফাণ্ডে দিন, বাকি একশো নিজের জন্যে রাখুন।

চমকে ওঠেন লোকটি। বলেন—কী বলছেন আপনি! তা কী করে হয়! নেতাজি সর্বস্ব দিতে বলেছেন যে! সুতরাং আমি দুশো ডলারই দেব।

অনেক বোঝালেন জেনারেল চ্যাটার্জি। শেষমেষ রাজি হলেন লোকটি। রাজি হলেন মাত্র কুড়ি ডলার নিজের কাছে রাখার জন্যে। বাকি একশো আশি ডলার তিনি জমা দিলেন আজাদ হিন্দ্ ফাণ্ডে।

জমা দিলে কি হবে! একটু পরেই আবার কী ভেবে ছুটে এলেন সেই লোকটি। সারা মুখে তাঁর অপরাধ-বোধের চিহ্ন। নেতাজি সর্বস্ব দিতে বলেছেন—আমি সর্বস্বই দেব। বাকি বিশ ডলারও জমা দিলেন তিনি। ব্যস, এবার খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেলেন লোকটি।

—বলিস কী রে! অবাক হয়ে ভণ্ডুলদা বলল, নিজের কাছে ফুটো কড়িও রাখলেন না তিনি? সব দিয়ে দিলেন?

—তবে আর বলছি কী! ভোম্বলদা বলল, একেই বলে দেশপ্রেম, এই হল সত্যিকারের দান। যাদবদের কাহিনি এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। বাকিটা শোন। ভোম্বলদা শুরু করল ঃ

ওই লোকটি যথাসর্বস্ব দেওয়ার পর এগিয়ে এল পুরো গোয়ালা সম্প্রদায়। সবার হাতে পুরনো তেল-চিটচিটে পাস-বই। এগুলো সব তারা জমা দিল মেজর জেনারেল চ্যাটার্জির হাতে। এবার তাদের শান্তি।

কিন্তু একী! দেখা গেল পরের দিনই আবার তারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সবার মুখ ভার। কাল টাকা-পয়সা সব দিলেও গোরু-মোষগুলোর কথা তাদের একদম মনে হয়নি। আজ সঙ্গে এনেছে প্রচুর গোরু-মোষ। এই গোরু-মোষগুলো নেতাজিকে দিতে এসেছে তারা।

সেকী! এত গোরু-মোষ! বিস্ময়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন আজাদি

বাহিনীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বোঝাতে চেষ্টা করলেন জেনারেল চ্যাটার্জি। নানা ভাবে বোঝালেন। এগুলো আপনারা নিয়ে যান ভাই। আপনারা তো আপনাদের সব টাকা-পয়সাই দিয়েছেন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ওদের সেই এক কথা। নেতাজি বলেছেন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের জন্যে সর্বস্ব দিতে, আমরা সর্বস্বই দিতে চাই। গোরু-মোষগুলো থাকলে সর্বস্ব দেওয়া হয় কী করে? না, না। এগুলো আমরা নেতাজিকে দেবই। নেতাজির কথা অমান্য করা তো মহাপাপ।

বাধ্য হয়েই হাজার হাজার গোরু-মোষ গ্রহণ করতে হল নেতাজিকে। সহজ সরল প্রাণের দান। এ দান কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়! ভালোই হল। দুধটা সৈনিকরা খেতে পারবে। সবচেয়ে আগে দরকার তাদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর দেওয়া। এই দানই সত্যিকারের দান। এর পিছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই।

এই হল সেদিনের যাদব-সম্প্রদায়ের দানের কাহিনি। শুনলে রূপকথার মতন মনে হয় না?

আমি বললাম—নিশ্চয়ই। এই কাহিনি-ই তো আমরা শুনতে চাই তোমার কাছ থেকে। সত্যি সেদিনের সেই দানের সঙ্গে আজকের দানের কত তফাত! তবে নেতাজির পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল ভারতীয়দের মনে এই দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা।

ভোম্বলদা বলল—সেই জন্যেই তো নেতাজিকে রূপকথার রাজপুত্তুর বলা হয়।

ভণ্ডুলদা বলল—সত্যি তাই।

ভুলো বলল—ও রকম একজন মানুষ কি আর এদেশে জন্মাবে!

টুলো বলল—সত্যি কী যে হল নেতাজির, আজও জানা গেল না।

ঢোল গোবিন্দ বলল—রহস্যই রয়ে গেল।

ভোম্বলদা বলল—তাই আজও তিনি রূপকথার রাজপুত্তুর।

ভরতপুরে গোয়েন্দাগিরি

বর্ষাকাল। সন্ধ্যা নেমেছে। রুপোর গুঁড়োর মতো ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়ায়-দোলা ঝর্ণার জলের মতো মাঝেমধ্যে মৃদু বাতাসে বৃষ্টি দুলছে। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। আলোর উপরে বৃষ্টি পড়ছে। মনে হয় যেন সোনার উপরে রুপোর গুঁড়ো ঝরে পড়ছে। ভোম্বলদা আর আমি তখন ক্লাবে বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। ভোম্বলদা বলল—অনেক দিন বাইরে যাওয়া হয়নি, চল না হুলো, কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। বর্ষার সময় প্রকৃতির রূপই আলাদা।

আমারও মনের ইচ্ছে তাই। বললাম—বর্ষার সময় গাড়ি করে বেড়াতে দারুণ মজা লাগে।

—কোথায় যাওয়া যায় বল তো!

—ভুলো আর টুলোকে আসতে দাও। ওরা এলে আলোচনা করে দেখি কোথায় যাওয়া যায়।

—তবে যেখানেই যাওয়া ঠিক হোক, জল চাই। অর্থাৎ, সমুদ্র-নদী-টদির কাছে ভালো জায়গা দেখে যাওয়া ঠিক করবি। বর্ষার সময় জলের কাছে থাকার মজাই আলাদা।

—জলের কাছেই থাকব আমরা... বলতে বলতে টুলো ক্লাবে ঢুকল।

টুলোর এই আচমকা মন্তব্যে ভোম্বলদা আর আমি, দুজনেই অবাক।

আমি বললাম—আমরা তো বাইরে যাওয়ার কথা আলোচনা করছি। তুই না-জেনেশুনে হঠাৎ...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই টুলো বলল—আমিও তো বাইরে যাওয়ার কথাই বলছি।

ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—জলের কাছে কোথায় যাওয়ার কথা

বলছিস?

—মুর্শিদাবাদে।

ভোম্বলদা আড়চোখে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম—খুঁজে খুঁজে আর জায়গা পেলি না তুই! বর্ষার সময় মুর্শিদাবাদে যাব! বলিহারি তোর বুদ্ধি। মুর্শিদাবাদে কি পদ্মার পাড়-ভাঙা দেখতে যাব?

পাড়-ভাঙা দেখতে যাবি কোন দুঃখে। টুলো বলল, যাবি ভরতপুরে।

—ভরতপুর! ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল, সেটা আবার কোথায়?

—ভরতপুরেই তো আমার মামাবাড়ি। মুর্শিদাবাদের ভরতপুর গ্রাম ভারী সুন্দর।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—ওখানে সমুদ্র আছে বুঝি!

আমার কটাক্ষটা বুঝে টুলো ঠোকা দিল—সমুদ্র নেই, তবে জল আছে। প্রচুর জল। জল—জলই তো করছিলি তুই আর ভোম্বলদা।

ভোম্বলদা বলল—তোরা দুজনে ঠোকাঠুকি ছেড়ে এখন কাজের কথায় আয়। ঠিক করে বল তো ওখানে দর্শনীয় জিনিস কী-কী আছে।

—দর্শনীয় জিনিস তেমন কিছু নেই। টুলো বলল, তবে গাছগাছালিতে ভরা পাখি-ডাকা সুন্দর গ্রাম। আমার মামাবাড়ির চারপাশেই পুকুর-নালা, খাল-বিল। বর্ষার সময় চারদিকে জল থইথই করে।

—দুত্তোর, পুকুর-নালা, খাল-বিল দেখতে যাব বাইরে! ভোম্বলদা বলল, তুই হাসালি টুলো।

টুলো বলল—হাসি-টাসির ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস।

—তা বেড়াতে যাওয়ার সঙ্গে সিরিয়াস ব্যাপারের সম্পর্কটা কী? বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

—সম্পর্ক আছে। আসলে রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে

একসাথে।

—মানে? ভোম্বলদা আর আমি একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

—মানে ছাড়া কথা বলে না টুলো ভটচাজ। এতদিন গোয়েন্দাগিরি করেছি আমরা কলকাতায় আর হুলোর ভেড়ির অঞ্চলে এবার চলো ভরতপুরে।

আমি বললাম—হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বল তো আগে।

টুলো পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে বলল—এটা বড়োমামার চিঠি। আজই পেয়েছি। চিঠিখানা পড়ছি।

'স্নেহের টুলো,

কালবিলম্ব না করে সত্বর এখানে চলে এসো। সঙ্গে তোমার গোয়েন্দা বন্ধুদেরও নিয়ে আসবে। আমি খুব ঝামেলার মধ্যে পড়েছি। একটা রহস্যজনক ব্যাপার ঘটে চলেছে। রহস্যের কূলকিনারা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুনলে অবাক হয়ে যাবে।

তুমি জানো বর্ষার সময় এখানে ছোটো মাছের সঙ্গে প্রচুর বড়ো মাছও ধরা পড়ে। আমার বিত্তিতেও (মাছ-ধরার যন্ত্র) কয়েকবার বড়ো মাছ ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে বেশ বড়ো বড়ো রুই-কাতলা। কিন্তু ধরা পড়লে কি হবে! একটা মাছও আমি পাইনি। বড়ো মাছ যে বিত্তির মধ্যে ঢুকেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। কারণ, বিত্তির মধ্যে বড়ো মাছের প্রচুর আঁশ পাওয়া গেছে। তা ছাড়াও বিত্তির বাঁধন খোলা এবং কাঠি-ভাঙা।

প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম বড়ো রুই-কাতলা হয়তো বিত্তির কাঠি ভেঙে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই পরে এত মোটা ও শক্ত কাঠির বিত্তি বানাই যে, দশ কেজি ওজনের মাছের পক্ষেও তা ভাঙা সম্ভব নয়। কিন্তু যখন দেখলাম তা-ও ভেঙে গেছে এবং বড়ো বড়ো আঁশ বিত্তির মধ্যে আছে তখন বুঝলাম মাছ চুরি হয়ে যাচ্ছে। শত চেষ্টাতেও চোরকে ধরতে পারা যাচ্ছে না। মহা সমস্যায় পড়েছি। বাড়িতে সবার

সঙ্গেই আলোচনা হয়েছে। কিন্তু রহস্য যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। এমনকী এই অদ্ভুত রহস্যের জন্যে দু-চোখের পাতা এক করতে পারছি না।

তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে তোমার বাবা-মাকেও লিখেছি। পত্রপাঠ চলে এসো।'

চিঠিখানা পড়ার পর টুলো আমাদের দুজনের মুখের দিকে তাকাল। আমি বললাম—এ ক্ষেত্রে যেতেই হবে। ঠিকই বলেছিস। রথ দেখা কলা বেচা—দুই-ই হবে।

ভোম্বলদাও আমার কথায় সায় দিল।

টুলো বলল—তা হলে আর দেরি করা ঠিক নয়। কালই রওনা দেওয়া যাক। কী বলো ভোম্বলদা?

—জরুর। তবে এখান থেকে কজন যাবে সেটা আগে ঠিক কর।

আমি বললাম—মোট চারজন। আমরা তিনজন আর ভুলো।

—ঠিকই বলেছিস। ভোম্বলদা বলল, এ ক্ষেত্রে আর বেশি লোক বাড়িয়ে লাভ নেই। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

—আমি বললাম, ঠিক হ্যায়। চলো ভুলোকে খবরটা দিয়ে আসি।

তিনজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম ক্লাব থেকে। যেতে যেতে ভোম্বলদা বলল—এই মাছ-রহস্যটা সত্যি অদ্ভুত।

আমি বললাম—খুবই ইন্টারেস্টিং কেস।

পরের দিন। সাতসকালেই ক্লাবে এসে হাজির হলাম আমরা চারজন—আমি, ভোম্বলদা, টুলো আর ভুলো। ঠিক হল সন্ধের পর রওনা দেওয়া হবে ভরতপুরের উদ্দেশ্যে।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। গড়িয়াহাট মার্কেটে এসে টর্চের ব্যাটারি আর টুকিটাকি কিছু জিনিস কেনা হল। বাইরে গেলে সঙ্গে কিছু জরুরি ওষুধপত্তর রাখা আমার বরাবরের অভ্যেস। তাই

কিছু ওষুধও কিনলাম।

সন্ধের কিছু পরে রওনা হলাম আমরা ভরতপুরের উদ্দেশ্যে। আমার সাদা মারুতির স্টিয়ারিং-এ আমি, আমার পাশে বসেছে ভোম্বলদা। ভুলো আর টুলো বসেছে পিছনের সিটে। আমরা যখন রওনা দিই রাতের প্রথম প্রহর তখন যাই-যাই করছে। অর্থাৎ, ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে আটটা।

বর্ষার সময়। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। চাঁদ-তারার ছিটেফোঁটাও নেই। দু-এক পশলা ঝরেছে ইতিমধ্যে। ভিজে ভাঙ্গা রাস্তায় কোথাও কোথাও গর্তে জল জমা। চলছে মারুতি। তবে স্বচ্ছন্দে নয়, হোঁচট খেতে খেতে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে আলো-আঁধারির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। এসেও গেছি কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে।

রাত তখন অনেক। চারদিক সুনশান। দু-একটা রাতজাগা পাখির ডাক আর লরি চলার শব্দ ছাড়া সবকিছু স্তব্ধ।

স্তব্ধতা ভাঙে ভোম্বলদার কথায়। ব্যাপারটা নিয়ে তোরা কি কিছু ভেবেছিস?

টুলো বলল—ভেবেছি বই কী!

—কী মনে হয় তোর?

—মনে হয় মাছ চুরিটা কাজের লোকজনদের কাজ।

ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—কী করে বুঝলি?

টুলো বলল—বড়োমামার বয়েস হয়েছে। একসময় তাঁর মাছ ধরার শখ ছিল। এখনও আছে। কিন্তু থাকলে কী হবে! সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। এই বয়েসে জলে নেমে বিত্তি-টিত্তি পাতা, মাছ-ঝাড়া—এ সব আর তাঁর পক্ষে এখন সম্ভব নয়। তাই মাছধরার সব দায়িত্বই ছেড়ে দিয়েছেন কাজের লোকদের উপর। নিজে খাল-বিলের পাড়ে বসে শুধু দেখেন।

—কেন? ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল, তোর তো আরও তিন মামা

আছেন। তাঁরা মাছ ধরেন না?

—না। তাঁরা মাছ-টাছ ধরার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নন।

—ভুলো, তোর কী মনে হয়? জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

আমার মনে হয় কাজের লোকদের সঙ্গে ষড় করে বাইরের চোরেরাই চুরি করে। মাছ বিক্রির পয়সা বখরা হয়ে যায়।

এবার ভোম্বলদা আমাকে বলল—হুলো, তুই তো ভেড়ি করিস। মাছ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিস। তোর কী ধারণা?

—এটা চুরির ব্যাপার নয় ভোম্বলদা। আমি বললাম, ওই ভাবে মাছ চুরি হয় না।

টুলো বলল—কেন?

আমি বললাম—ওতে রিস্ক আছে।

টুলো জিজ্ঞেস করল—রিস্ক কেন?

আমি বললাম—প্রথমত, জলে মাছের জোর সাঙ্ঘাতিক। বিত্তি ভেঙে চুরি করতে গেলে বড়ো মাছের পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দ্বিতীয়ত, জল থেকে মাছ তুলতে গেলেই মাছ লাফালাফি করে। বিশেষ করে বড়ো মাছ তো খুব জোরেই লাফালাফি করে। নিশুতি রাতে সেই আওয়াজ বহু দূর পর্যন্ত চলে যায়। আর তখনই থাকে বিপদের আশঙ্কা। চোর ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই এই ভাবে চুরি করার ঝুঁকি নেবে, এমন বোকা চোর আছে বলে তো মনে হয় না।

—ঠিক বলেছিস। ভোম্বলদা বলল, তোর সঙ্গে আমি একমত হুলো। এ ভাবে মাছ চুরি হয় না। তা ছাড়া বড়োমামার চিঠিতে যা লেখা আছে তাতে বুঝলাম বিত্তির কাঠি ভেঙে মাছ পালিয়ে যায়নি।

—তা হলে ব্যাপারটা কী? অবাক হয়ে টুলো জিজ্ঞেস করল।

ভোম্বলদা বলল—ব্যাপার তো একটা কিছু আছেই। ভালো কথা মনে পড়েছে। আগে থেকেই তোকে বলে রাখি টুলো, তোর মামাবাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গাড়ি রাখা আর আমাদের থাকার ব্যবস্থা করতে

পারবি?

—আজই?

ভোম্বলদা বলল—না-না, আজ না। তবে দু-একদিনের মধ্যেই করতে হতে পারে।

টুলো বলল—ঠিক আছে। হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। ভোম্বলদা বলল, ব্যবস্থাটা কিন্তু খুব গোপনে করতে হবে। জানাজানি হয়ে গেলে সব ভেস্তে যাবে।

—ঠিক আছে। জানাজানি হবে না।

এই ভাবে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছি আমরা। একে বেহাল রাস্তা, তার উপর আবার বৃষ্টিতে ভেজা। তাই গাড়ি চলেছে আস্তে-আস্তে নাচতে-নাচতে। না হলে অনেকক্ষণ আগেই হয়তো টুলোর মামাবাড়িতে পৌঁছে যেতে পারতাম। তবুও অনেকটা পথই পেরিয়ে এসেছি। রাতের অন্ধকারও বেশ কিছুটা ফিকে হয়ে গেছে। ভোর হল বলে।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমরা ভরতপুরে টুলোর মামাবাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

রাস্তার গায়ে বিরাট বাড়ি। বাড়ির সামনে বিশাল পুকুর। চারপাশে নানারকম গাছগাছালির বাগান। বাগানের গা ঘেঁষে চারধারের খেত-খামারের বুকে থইথই জল। পাশেই বর্ষার ভরা নদী। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে তার সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে পাখি-ডাকা এই গ্রামে। টুলো মিথ্যে বলেনি, জায়গাটা ভারী সুন্দর।

মামাবাড়িতে টুলোর আদর সাত রাজার ধন এক মানিকের মতো। হবেই বা না কেন! চার মামার একটামাত্র ভাগ্নে।

মামা-মামিদের আদরে-আপ্যায়নে আমরাও মুগ্ধ, অভিভূত। টুলো মামাবাড়িতে আমাদের কথা এত বলেছে যে, মনে হল আমরা যেন তাঁদের কতকালের পরিচিত। এই যে ভোম্বল... এই ভুলো... আর এই তো হুলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাত-মুখ ধুয়ে আমরা প্রাতভোজনে বসলাম। প্রাতরাশের বহর দেখে বুঝলাম দুপুর ও রাতের আহার-পর্ব কীরকম হতে পারে।

খেতে বসে ভোম্বলদা তো আহ্লাদে আটখানা। হবেই বা না কেন! একাই তো খান পঞ্চাশেক লুচি, গোটা পনেরো মিষ্টি আর একবাটি হালুয়া শেষ করল।

জলখাবারের পর আমরা বড়োমামার সঙ্গে তাঁর ঘরে গেলাম।

ঘরে ঢুকে চারদিকে চোখ বুলিয়ে ঘরখানা ভালো করে দেখে নিল ভোম্বলদা। তারপর বড়োমামার কাছে এসে বসল। হঠাৎ কী যেন ভেবে বড়োমামাকে বলল—বড়োমামা, কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।

—বেশ তো!

—আপনি যে আমাদের এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন, তা কি বাড়ির সবাই জানে?

—না। আমি ছাড়া কেউ জানে না। এমনকী তোমাদের বড়োমামিমাকেও জানাইনি।

—আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?

—না। কাজের লোকেরা সবাই পুরনো। তারা এমন কাজ করবে বলে মনে হয় না।

—আপনাদের পুকুরে কি বড়ো রুই-কাতলা আছে?

—হ্যাঁ। মাঝেমধ্যেই তো ধরা হয়।

—আপনি চিঠিতে লিখেছেন যে, এমন মজবুত বিত্তি তৈরি করেছেন যা দশ কেজি ওজনের মাছও ভাঙতে পারে না। কিন্তু কখনও কি দশ কেজি ওজনের মাছ বিত্তিতে পড়েছে?

—না, না। ওটা একটা কথার কথা। আসলে বিত্তিটা যে কত শক্ত সেটাই আমি বোঝাতে চেয়েছি। তিন-চার কেজির বেশি ওজনের মাছ বড়ো একটা বিত্তিতে পড়ে না। অন্তত আমার বিত্তিতে পড়েনি

কখনও।

—আপনার বিত্তি পাতে এবং তোলে তো কাজের লোকেরা। আপনি কি রোজ পাতা-তোলার সময় সেখানে থাকেন?

—অবশ্যই। বিত্তি পাতা-তোলা আমি নিজে বসে থেকে দেখি।

—ব্যস, আর কিছু জানার নেই বড়োমামা। এবার আমরা একটু ঘুরে-টুরে দেখি।

—বাবা ভোম্বল, চোর ধরতে পারবে তো?

—চেষ্টা তো করবই। দেখা যাক না শেষ পর্যন্ত কি হয়!

বড়োমামার ঘর থেকে বেরিয়ে ভোম্বলদা বাড়ির প্রতিটি ঘর-বারান্দা খুঁটিয়ে দেখল। তারপর আমরা একসঙ্গে ঘুরতে বেরোলাম। এদিক-ওদিক ঘুরে-টুরে বিত্তিটা যেখানে পাতা আছে সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থাকলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি বনমালী পুকুরে জাল ফেলে বিরাট একটা রুই মাছ ধরেছে। ভোম্বলদার সেকী আনন্দ! মাছটা কোটার সময় সারাক্ষণ সেখানে বসে থাকল।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ভোম্বলদা বড়োমামার ঘরে গিয়ে তাঁকে কী যেন বলে এল। হঠাৎ আমাদের তিনজনকেও আড়ালে ডেকে নিয়ে ভোম্বলদা বলল—আজই আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। শোন টুলো, তুই বেরিয়ে পড়। সব ব্যবস্থা পাকা করে তাড়াতাড়ি ফিরে আয়। বেলায় বেলায় আমরা বেরিয়ে পড়ব।

টুলো বলল—তুমি যে তখন বললে আজ যাবে না।

ভোম্বলদা বলল—ক্লু পেয়ে গেছি। আজই যেতে হবে। দেরি করা চলবে না।

টুলো সব ঠিকঠাক করে ফিরে এল। সন্ধের আগেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে মামাবাড়ির সবাই অবাক।

সন্ধের পর শুরু হল বর্ষণ। বেশ কোমর বেঁধেই নেমেছে বৃষ্টিটা। তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে খ্যাপা বাতাস। সাঁই-সাঁই করে ছুটে চলেছে

সে। এই দুর্যোগের মধ্যেই শালতিতে চেপে পৌঁছে গেলাম আমরা বড়োমামার সেই বিত্তির কাছে। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে টর্চের আলোয় ভালো করে দেখে নিলাম সবকিছু। এখন টর্চের আলো ফেললে অসুবিধে কিছু নেই। এই সন্ধেবেলায় লোকজনই টর্চের আলোয় যাতায়াত করে। তা ছাড়া চোর বা পাহারাদার—কেউ-ই এত তাড়াতাড়ি এখানে আসবে না।

শালতির উপর বসে আছি আমরা চারজন। ঝোপের আড়ালে। রাত যত বাড়ছে ততই অন্ধকারের কালির পোঁচ গাঢ় হচ্ছে। দু-হাত সামনের জিনিসও এখন অস্পষ্ট। বৃষ্টিও পড়ছে একই ভাবে। গাছগাছালির মধ্যে জ্বলছে-নিভছে জোনাকির আলো। চলছে একটানা ঝিঁঝির ডাক আর ব্যাঙের চিৎকার। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে মাছের লাফালাফির শব্দ। পুরো অঞ্চলটাই ভয়াল মূর্তি ধারণ করেছে। কেমন যেন একটা গা ছমছম করা অপার্থিব পরিবেশ। হঠাৎ একটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ উঠতে চমকে উঠলাম সবাই। পরে বুঝলাম ওটা বাঁশের শব্দ। বাঁশঝাড়ে হাওয়ায় অনেক সময় বাঁশে-বাঁশে ঘষাঘষিতে এরকম শব্দ হয়।

ঠিক ক'টা বাজে না জানলেও বুঝতে পারছি রাত এখন অনেক। আমাদের চারপাশে জল। মিশকালো জল। এরকম একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশে ভয়-ভয় ভাব তো আমাদের মনের মধ্যে সব সময়ই আছে। হঠাৎ বিশ্রী সুরে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। চমকে উঠে মনে মনে বললাম—প্যাঁচা ডাকার আর সময় পেল না!

এবার কিন্তু অন্য ব্যাপার। মনে হচ্ছে জল ভেঙে কেউ এদিকে আসছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁতে দাঁত চেপে রইলাম আমরা।

হ্যাঁ, ঠিকই মনে হয়েছে। জলের মধ্যে হাঁটার শব্দ থেকে টের পেলাম লোকটা বিত্তির কাছে এসে পড়েছে। একেবারে কাছে। মনে হয় এখন বিত্তিটাতে হাত দিয়েছে।

ব্যস, আর দেরি নয়। মারো টর্চ। চারজনই একসঙ্গে টর্চের আলো জ্বালালাম। চারটে টর্চের আলো একসঙ্গে বিত্তির উপর গিয়ে পড়ল।

কিন্তু একী! এ যে মেজোমামার ছেলে বিচ্ছু। অতটুকু ছেলের এই কাণ্ড! ভয়-ডর বলে কিছু নেই ওর। মাঝরাতে এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে...

টুলো চেঁচিয়ে উঠল—তুই-ই তা হলে এতদিন এই কাজ করেছিস! তুই নামে বিচ্ছু, কাজেও বিচ্ছু। চল বাড়িতে।

মাঝরাতে বিচ্ছুকে নিয়ে মামাবাড়িতে এলাম আমরা। সবাইকে ডেকে তুললাম। আমাদের সঙ্গে বিচ্ছুকে দেখে সবাই অবাক। ব্যাপারটা খুলে বললাম। মেজোমামা বিচ্ছুকে এই মারে তো সেই মারে।

বড়োমামি বিচ্ছুকে কাছে ডেকে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন—তুই কেন এই কাজ করেছিস বিচ্ছু?

কাঁচুমাচু হয়ে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বিচ্ছু বলল—জেঠু কেন ছিপ থেকে একশো গ্রামের মাছ ছুটে গেলে এক কেজির মাছ বলে? তাই আমি রাত্তিরবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড়ো মাছের আঁশ বিত্তির মধ্যে ঢুকিয়ে বিত্তির কাঠি ভেঙে দিতাম। জেঠু এসে বলত বড়ো মাছ বিত্তি ভেঙে পালিয়ে গেছে। আমার ভারী মজা লাগত।

—লাগাচ্ছি মজা... বলে মেজোমামা তেড়ে আসতেই আমরা তাঁকে থামালাম।

বড়োমামি বললেন—বারো বছরের ছেলের আর দোষ কি! বড়োদের কি উচিত অযথা তিলকে তাল করে বলা? বাচ্চারা তো বড়োদেরই দেখে শেখে।

বড়োমামা চুপ। একেবারে স্পিকটি নট।

বড়োমামি বড়োমামার দিকে চেয়ে আবার বললেন—শিক্ষা হল তো এবার! আর কোনোদিনও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কথা বোলো না।

বড়োমামা লজ্জিত হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন।

বিচ্ছুকে কাছে ডেকে নিয়ে বড়োমামি বললেন—ছিঃ বিচ্ছু, বড়োদের সঙ্গে এ রকম করতে নেই। বড়োরা তোমার গুরুজন। গুরুজনদের সম্মান করতে হয়। তা ছাড়া কারও কোনো ক্ষতি হয় এমন মজা করতে নেই।

বিচ্ছু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ বড়োমামি হাসতে হাসতে আমাদের কাছে এসে বললেন—এবার শোনাও তো তোমাদের গোয়েন্দা-কাহিনি।

ভোম্বলদা শুরু করল ঃ

বড়োমামা চিঠি দিয়ে আমাদের এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন। সেই চিঠির মধ্যেই বড়ো মাছের আঁশ আর বিত্তি-ভাঙার কথা রয়েছে। তাই রুইমাছটা কোটার সময় সারাক্ষণ আমি সেখানে বসে ছিলাম। দেখলাম মাছটা কুটে আঁশগুলো পুকুরের উত্তর দিকের পাড়ের এক কোণে ফেলে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পরে সেখানে গিয়ে দেখি আঁশগুলো হাওয়া। তখনই বুঝলাম বাড়িরই কেউ বিত্তির মধ্যে আঁশ রেখে দেয়। এ-ও বুঝলাম আমরা এখানে থাকলে এ কাজ কেউ সাহস করে করতে যাবে না। সুতরাং এখানে থেকে এ রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। তাই সঙ্গে সঙ্গে পাশের গাঁয়ে টুলোর বন্ধু মানসের বাড়িতে চলে যাই। সেখান থেকে চলে আসি আপনাদের পুকুরের পিছনে বিত্তির কাছে। গা ঢাকা দিই ঝোপটার আড়ালে। বৃষ্টির রাত। নানা রকম আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। হঠাৎই কারও জল ভেঙে বিত্তির কাছে আসার শব্দ শুনতে পাই। মুহূর্তমধ্যে আমরা চারজনই একসঙ্গে টর্চের আলো ফেলি বিত্তির উপর। বিচ্ছু মূর্তিমানকে দেখে আমরা অবাক। সঙ্গে সঙ্গেই ওকে নিয়ে বাড়িতে চলে আসি। তার পরের ঘটনা তো সবই জানতে পারলেন।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনাদের বাড়ির লোকজনেরা ঠিকমতো রাত জেগে পাহারা দেয় না। ঘুমিয়ে পড়ে। আর আপনারাও কেউ রাত জাগেন না। তাই শত চেষ্টাতেও বড়োমামা রহস্যটা ভেদ করতে পারেননি।

বাড়ির সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন—সাবাস গোয়েন্দা!

হঠাৎ বিচ্ছু বলল—বড়ো হলে আমিও গোয়েন্দা হব।

আমরা সকলে হো-হো করে হেসে উঠলাম।

ভোম্বলদার পুরস্কার

ছুটির দিন। সকালবেলায় ভণ্ডুলদা আর আমি ক্লাবে বসে বেশ মৌজ করে চা-বিস্কুট খাচ্ছিলাম। হঠাৎ 'মার দিয়া কেল্লা'—'মার দিয়া কেল্লা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঢোল গোবিন্দ এসে হাজির।

—কেল্লা মেরেছিস? মুখে মুচকি হাসি এনে জিজ্ঞেস করল ভণ্ডুলদা।

—আলবাৎ।

—তো বল, শুনি তোর কেল্লা মারার গপ্পো। ব্যঙ্গ করে ভণ্ডুলদা বলল, তোর কাজই তো হচ্ছে ঢোলে কাঠি মারা।

—তোমার কাজও তো শুধু লোকের পিছনে লাগা আর সবকিছু ভণ্ডুল করা।

সাপের মতো ফোঁস করে উঠল ভণ্ডুলদা। চোখ পাকিয়ে বলল—কী বললি?

ঢোল গোবিন্দও কিছু একটা বলতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিয়ে বললাম—খামোকা নিজেদের মধ্যে তক্কাতক্কি করছিস কেন?

—আমি কোথায় তক্কো করলাম? ঢোল গোবিন্দ বলল, ভণ্ডুলদাই তো আগে আমাকে ঢোলে কাঠি মারার কথা বলল।

—ছাড় ও সব কথা। ব্যাপারটা খুলেই বল না।

বিজয়ী বীরের মতো ঢোল গোবিন্দ বলল—ভোম্বলদা সাহিত্য-পুরস্কার পাচ্ছে।

—সত্যি? বলে আমি ঢোল গোবিন্দর দিকে তাকালাম।

—হ্যাঁ রে।

—সত্যি-ই তা হলে শেষ পর্যন্ত পুরস্কার পেল ভোম্বলদা। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলাম আমি।

—কেন পাবে না? ভণ্ডুলদা বলল, ইদানীং ও তো বেশ ভালোই লিখছে। কিন্তু তুই খবরটা জানলি কী করে গোবিন্দ?

ঢোল গোবিন্দ বলল—সবার আগে খবরটা আমিই জানতে পারি। হাসি-হাসি মুখ করে আমাদের দিকে তাকাল।

এবার আমি বিরক্ত হয়ে বললাম—তোর এই স্বভাবটা পালটা আগে। সব ব্যাপারেই ওস্তাদি। আসল কথাটা বল—তুই জানলি কী করে?

—ঠিক আছে। ব্যাপারটা খুলেই বলি তা হলে। সকালে বাজারে যাওয়ার পথে ভাবলাম ভোম্বলদার বাড়িতে ঢুঁ মেরে যাই। যাহা ভাবা, তাহা কাজ। ভোম্বলদার বাড়িতে ঢোকার মুখে দেখি এক ভদ্রলোক ভোম্বলদাকে খুঁজছেন। কী ব্যাপার, কেন খুঁজছেন—সবকিছু জানতে চাইলাম। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলদার পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ। কালবিলম্ব না করে ভদ্রলোককে নিয়ে সোজা ভোম্বলদার কাছে হাজির হলাম। ঢোল গোবিন্দ থামল।

—থামলি কেন? বলে যা—কী পুরস্কার, কোথায় পুরস্কার, কবে পুরস্কার—সবকিছু চটপট বল। আনন্দে অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম আমি।

ঢোল গোবিন্দ আবার শুরু করল—যে ভদ্রলোক পুরস্কারের খবরটা নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নাম সীতাপতি ভড়। থাকেন গোবরগণেশপুরে। ওখানকার বিখ্যাত পত্রিকা 'রঙিন ফানুস'-এর সম্পাদক। পত্রিকার তরফ থেকেই পুরস্কৃত করা হচ্ছে ভোম্বলদাকে। ভোম্বলদা পুরস্কার পাচ্ছে তাঁর 'হোঁৎকার হোঁচট খেয়ে চলা' কাব্যগ্রন্থের জন্যে। আজ রবিবার। আগামী শনিবার গোবরগণেশপুরে পুরস্কার দেওয়া হবে।

—গোবরগণেশপুর! সেটা আবার কোথায়? জিজ্ঞেস করল ভণ্ডুলদা।

—তোর মামাবাড়ির কাছে... বলতে বলতে হাসিমুখে ভোম্বলদা ক্লাবে ঢুকল।

—তার মানে? রীতিমতো অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করল ভণ্ডুলদা, তুই আমার মামাবাড়ির কথা তুললি কেন?

—কারণ আছে বলেই তুলেছি।

—কারণটা কী, শুনি। গম্ভীর হয়ে ভণ্ডুলদা জিজ্ঞেস করল।

—সেবার তোর মামাবাড়ি যাওয়ার কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বাপরে বাপ, সেকী জার্নি! বাস-ট্রেন-রিক্সা-নৌকো—এত কিছুতে চেপে তোর মামাবাড়িতে পৌঁছেছিলাম। আর গোবরগণেশপুর যেতে হলে প্রথমে বাসে চেপে হাওড়া স্টেশন—হাওড়া থেকে ট্রেনে পঞ্চাশ কিলোমিটার পরে আরেক স্টেশনে নেমে অটোরিক্সা করে ফেরিঘাট—ফেরিঘাট থেকে নৌকোয় চেপে আরেক ঘাট—সেখান থেকে ভ্যানরিক্সায় চৌরাস্তার মোড়—চৌরাস্তা...

—থাক, থাক। ভণ্ডুলদা বলল, বুঝে গেছি। আর বলতে হবে না। ঠিকই বলেছিস। তবে কি জানিস, এ রকম জার্নি কষ্টের হলেও খারাপ না। একটা অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার ব্যাপার থাকে এর মধ্যে।

—অ্যাডভেঞ্চার! মৃদু হেসে বললাম, এই গরমে ঝাঁ-ঝাঁ রোদে এত সব পালটা-পালটি করে যেতে হলে জান কয়লা হয়ে যাবে। অ্যাডভেঞ্চার তখন মাথায় উঠবে।

—তাই বলে তো আর যাওয়া বন্ধ করা যায় না। ভোম্বলের জীবনে প্রথম পুরস্কার। তা সে জান কয়লা আর জামা-কাপড় ময়লা, যা-ই হোক—যেতেই হবে। তবে কজন যাবে, সেটা তো আগে জানা দরকার। পুলকিত হয়ে কথাগুলো বলল ভণ্ডুলদা।

—তোদের তিনজনকে ধরে মোট চারজন যাব আমরা। ভোম্বলদা বলল, ভুলো আর টুলো থাকলে কত ভাল লাগত বল তো! ওরা আর বাইরে যাওয়ার সময় পেল না।

—ওরা জানবে কী করে যে তুমি এই সময়ই পুরস্কার পাবে। আমি বললাম, জানলে কি আর যেত!

ভোম্বলদা বলল—তা ঠিক।

ভণ্ডুলদা বলল—এ সব এখন আলোচনা করা মানে অযথা সময় নষ্ট করা। দার্জিলিং থেকে তো আর ওদের ধরে আনা যাবে না। তার চেয়ে বরং কাজের কথা বল। গোবরগণেশপুর যাওয়ার রুটটা ভালো করে বুঝে নিয়েছিস তো?

—মাথা খারাপ! ভোম্বলদা বলল, ওখানে যাওয়ার রুট বুঝতে হলে একজন জিওগ্রাফির টিচারের দরকার। কী বুঝলি?

—যা বোঝার ঠিকই বুঝলাম। তা হলে যাবি কী করে?

—আমি কি অত কাঁচা নাকি? নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ওঁদের।

হঠাৎ ঢোল গোবিন্দ বলল—থাক এখন এ সব কথা। আসল কথাই বলা হয়নি।

—কী কথা, কী কথা? ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

—খাওয়ার কথা। তুমি পুরস্কার পাচ্ছ, খবরটা আমিই তোমাকে আগে জানাই। তা তুমি আমাদের খাওয়াবে না?

—এই কথা! ধুর—এটা কি একটা কথা হল! আমি এক্ষুনি খাবার নিয়ে আসছি।

—কী খাবার আনবে? আমরা তিনজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

—ফ্রায়েড রাইস আর স্পেশাল ওনিয়ন পাকোড়া উইদ ইংলিশ ব্রিনজল স্যস।

—সকালবেলায় ফ্রায়েড রাইস! কোথায় পাবে তুমি? জিজ্ঞেস করল ঢোল গোবিন্দ।

—ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, সময়মতো দেখতে পাবে। হেসে হেসে কথাটা বলেই ধাঁ করে বেরিয়ে গেল ভোম্বলদা।

দু-হাতে খাবার ভর্তি পেল্লাই দুটি কাগজের ঠোঙা নিয়ে মিনিট দশেক পরে ভোম্বলদার আবির্ভাব। কিন্তু একী! এ যে মুড়ি আর পিয়াজি—তার সঙ্গে একটু টম্যাটো স্যাস।

ভোম্বলদা বলল—কী দেখছিস? শুরু কর। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকালাম। গম্ভীর হয়ে বললাম—জানো তো ভোম্বলদা, একটা কথা আছে—স্বভাব যায় না মলে। চিরকালের কিপটে তুমি—তোমাকে চিনতে বাকি আছে কারও! তুমি খাওয়াবে ফ্রায়েড রাইস!

—কেন তুই আজেবাজে বকছিস হুলো! এটা কি ফ্রায়েড রাইস নয়?

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

—তোকে একটা কথা বলি হুলো। তুই আর টুলো বরাবরই পড়াশুনায় ভালো। টুলোর ইংলিশ স্পিকিং পাওয়ার তোর চেয়ে ভালো হলেও ইংরেজি লেখালেখিতে টুলো তোর কাছে স্রেফ নট কিচ্ছু নাথিং। আর তোর কিনা সেই ইংরেজিতেই আজ এই দুরবস্থা!

—তা তো বলবেই। বিরক্ত হয়ে বললাম, তোমার মুখে সবই শোভা পায়। মুড়ি আর পিয়াজি এনে অনেক বাতেলা মারবে এখন। ইংরেজিতে জ্ঞান দেবে—দরকার হলে ফরাসি-জার্মান সব ভাষা শোনাবে। তোমার মতো পণ্ডিত ভূ-ভারতে আর আছে বলে তো মনে হয় না।

—কেন যা-তা বকে চলেছিস? আমার ভুল কোথায় বল? ফ্রায়েড রাইস মানে কি ভাজা চাল নয়? তা হলে মুড়িকে ফ্রায়েড রাইস বলতে দোষ কী?

আমি বললাম—অনেক ওস্তাদি দেখিয়েছ ভোম্বলদা। তার ফলও পেয়েছ।

—পড়াশুনায় ভাল ছিলি বলে তোরা যা-খুশি তাই বলবি! আমার

ভুলটা কোথায় সেটা বল আগে। এত বড়ো সাইজের পিয়াজিকে স্পেশাল ওনিয়ন পাকোড়া বলাটা কি ভুল? আমি ইংরেজি বললেই যত দোষ। বল, টম্যাটোকে কি বাংলায় বিলিতি বেগুন বলে না? বহু লোকই বলে। তাই ইংরেজিতে ইংলিশ ব্রিনজল বলেছি। তা ভুলটা কী বলেছি বল।

বিরক্ত হয়ে বললাম—ও সব চালবাজি ছাড়ো। মনে রেখো, অপরকে ঠকালে নিজেকেও ঠকতে হয়।

—মাইরি বলছি, বিশ্বাস কর হুলো, তোদের ঠকাতে চাইনি। এটা স্রেফ আমার বোকামি। একজনের কথা শুনে মাথায় ভূত চেপেছিল।

ভণ্ডুলদা বলল—এবার তো আরও এক ধাপ উপরে উঠলি রে ভোম্বল।

—সত্যি বলছি।

ভণ্ডুলদা বলল—কী আশ্চর্য! আসলে বোকা বানালি আমাদের। আর মুখে বলছিস তুই বোকামি করেছিস।

ঢোল গোবিন্দ বলল—তোমার ব্যাপার-স্যাপার বোঝা দায় ভোম্বলদা। করছ এক, বলছ আর এক।

—তোরা আমার কথা শুনলে আর এ কথা বলবি না।

আমি বেশ রেগেই বললাম—সারা জীবনই তো তোমার কথার কারসাজি শুনে আসছি। বেশিরভাগ সময়ই তো তুমি বক্তা, আমরা শ্রোতা। এ আর নতুন কথা কী!

ভোম্বলদা বাংলার পাঁচের মতো মুখ করে বলল—হ্যাঁ, নতুন কথাই।

ভণ্ডুলদা বলল—তা হলে বল। শোনা যাক তোর নতুন কথা।

ভোম্বলদা বলল—এক উকিলের জন্যেই তোদের কাছে আমাকে আজ এত কথা শুনতে হল।

আমি অবাক হয়ে বললাম—এ আবার কী কথা! এর মধ্যে উকিল

ঢুকল কোত্থেকে।

ঢোল গোবিন্দ হাসতে হাসতে বলল—সেই উকিল বুঝি তোমাকে এরকম ফ্রায়েড রাইস আর স্পেশাল ওনিয়ন পাকোড়া উইদ ইংলিশ ব্রিনজল স্যাস খাইয়েছিল?

—ধুর-ধুর। খাওয়া-টাওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই এর মধ্যে।

—তবে? ভণ্ডুলদা জিজ্ঞেস করল।

ভোম্বলদা বলল—সে এক অদ্ভুত ঘটনা।

আমি বললাম—খাওয়ানোর ব্যাপার হলেই তোমার শুধু আবোল-তাবোল কথা। মুড়ি আর পিয়াজি এনে অদ্ভুত ঘটনা শোনাচ্ছ। চালাকি মারার জায়গা নেই। তুমি খাও তোমার মুড়ি-পিয়াজি। আমরা কেউই খাব না ওই সব ফালতু জিনিস।

—তুই অযথা রাগ করছিস হুলো।

অবাক হয়ে বললাম—অযথা!

—নয় তো কী?

ভোম্বলদার কথা শুনে ঢোল গোবিন্দ বলল—তা তো তুমি বলবেই। আমরা রাগ করলে সেটা হয় অযথা, আর তুমি...

বাধা দিয়ে ভোম্বলদা বলল—আগে তোরা আমার কথাটা শোন। তারপর যা বলবি আমি তাই মেনে নেব।

ভণ্ডুলদা বলল—ঠিক হ্যায়। তা হলে শোনা যাক তোর কথা।

ভোম্বলদা শুরু করল—আমাদের বিশেষ পরিচিত একজন উকিল আছেন। গতকাল সন্ধেবেলায় তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। মা তাঁকে চা-টা খেতে বললে তিনি জানালেন তাঁর পেট ভর্তি। একফোঁটা জায়গা নেই পেটে। কিচ্ছু খেতে পারবেন না।

মা জিজ্ঞেস করলেন—এই অসময়ে কী খেয়ে পেট ভরালেন?

মুচকি হেসে উকিলবাবু বললেন—ফ্রায়েড রাইস আর স্পেশাল ওনিয়ন পাকোড়া উইদ ইংলিশ ব্রিনজল স্যাস।

মা বললেন—বিকেলে আপনি এত সব খেলেন?

উকিলবাবু বললেন—এ তো বিকেলেরই খাবার। আমি তো প্রায়ই খাই।

—বলেন কী! মা অবাক হলেন। এবং আমরাও।

উকিলবাবু তখন কথাটার বাংলা করে আমাদের বললেন। সবাই আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম। ঘরসুদ্ধ লোক ব্যাপারটা বেশ এনজয় করে উকিলবাবুকে বাহবা দিল।

আমি বললাম—তুমিও বাহবা পাওয়ার জন্যে এই বাজে কাজ করলে। তাই না?

—বাজে কাজ বলসি না হুলো। মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে ভোম্বলদা বলল, হাজার হোক খাবার বলে কথা।

—রাখো তোমার খাবার। মেজাজে বললাম, উকিলবাবুর কথার রসটাই তো বুঝতে পারোনি তুমি।

—মানে? জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

আমি বললাম—তিনি তামাসা করেছেন। এটা স্রেফ জোকস। আর তুমি এই জোকস বুঝতে না পেরে আমাদের সাথে এই কারবার করলে!

ভণ্ডুলদা বলল—উকিলবাবু তো মজা করেছিলেন। তা হলে কি তুইও আমাদের সাথে মজা করলি? খাওয়ানোর নাম করে...

—না, না। বিশ্বাস কর, ব্যাপারটা যে এরকম হবে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

ঢোল গোবিন্দ বলল—বলিহারি তোমার বুদ্ধি! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি করছ গোয়েন্দাগিরি! এতদিন কপালের জোরে বেঁচে গেছ, এখন থেকে গোয়েন্দাগিরি বন্ধ করে দাও।

মওকা পেয়ে ঢোল গোবিন্দ একহাত নিল। বেকায়দায় পড়ে ভোম্বলদাও বড়ো একটা কিছু বলল না। আমার দিকে চেয়ে বলল—

যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। প্লিজ খেয়ে নে তোরা। পিয়াজিটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অগত্যা খেতেই হল। তারপর পুরস্কারের আগের দিন পর্যন্ত আমাদের মুখে শুধু ভোম্বলদার পুরস্কারের কথা। সেই সঙ্গে মাঝেমধ্যে ফ্রায়েড রাইস আর ওনিয়ন পাকোড়ার গল্পও।

অবশেষে এল সেই শনিবার—মানে গোবরগণেশপুর যাওয়ার দিনটা। কাকভোরে রওনা হলাম আমরা গোবরগণেশপুরের উদ্দেশ্যে। কমিটির লোক সঙ্গে ছিল বলে রক্ষে—তা না হলে পুরস্কারের দিন আর পৌঁছতে হত না। অবশ্য পৌঁছেও কিছু লাভ হয়নি। কারণ, পুরস্কার আর ভোম্বলদার হাতে এল না। এমন দুর্ভাগ্য যে মানুষের হতে পারে—চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। এ ধরনের বেদনাদায়ক ঘটনা এর আগে আর কোথাও ঘটেছে বলে আমার মনে হয় না।

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। কাঠফাটা রোদে শুকিয়ে আমসি হয়ে যখন আমরা গোবরগণেশপুরে অনুষ্ঠানের জায়গায় পৌঁছলাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। বিরাট এক বাগানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আম-জাম-কাঁঠাল গাছে ভরা সুন্দর সাজানো বাগান। মস্ত বড়ো একটা আম গাছের নীচে মঞ্চ তৈরি হয়েছে। ঠিক মঞ্চের সামনেই পুকুর। পুকুরপাড়ে রান্না হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়েছে রান্নার সুগন্ধ চারদিকে। গোটা বাগান পাঁঠার মাংসের গন্ধে ম-ম। ভোম্বলদা নোলার জল টানল। সেটা লক্ষ্য করে ফিসফিস করে ভোম্বলদাকে বললাম—এখানে কিন্তু ও রকম রাক্ষসের মতো খেয়ো না। কথাটা শুনে রোদে পোড়া ভোম্বলদার শুকনো মুখখানা আরও শুকিয়ে গেল।

সত্যি একটা সুন্দর পরিবেশ। গাছের ডালে-ডালে পাখিদের কূজন আর পুকুরের জলে মৃদু ঢেউয়ের মিষ্টি আওয়াজ আমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিল। কর্মকর্তাদের আপ্যায়নে আর আয়োজনে রীতিমতো

মুগ্ধ হলাম আমরা।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে অনুষ্ঠানের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল তাঁরা হলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি সীতাপতি ভড়, প্রধান অতিথি লঙ্কাপতি ধর এবং বিশেষ অতিথি গণপতি সর। প্রথমে এঁরা মঞ্চে উঠলেন। তারপরই সদ্য ফোটা ফুলের মতো মুখে হাসি এনে মঞ্চে উঠল ভোম্বলদা। ভোম্বলদার পরে পর পর আরও দুজন পুরস্কার প্রাপক। অতিথি বরণ আর উদ্বোধন-সঙ্গীতের পরে বক্তৃতা শুরু করলেন প্রধান অতিথি লঙ্কাপতি ধর। তিনি তাঁর ভাষণে প্রথমেই উল্লেখ করেন ভোম্বলদার কথা। কবি ভোম্বল ঘোষের বায়োডাটা মুগ্ধ করেছে আমাদের। কী অপূর্ব বায়োডাটা! ভোম্বল ঘোষ শুধু একজন খ্যাতিমান কবিই নন—ক্যারাটে, কুস্তি ও বক্সিং চ্যাম্পিয়ানও। একদিকে কলমের জোর আরেক দিকে গায়ের জোর—এই দুই মহাশক্তির মহা আবির্ভাব দেখা যায় ভোম্বল ঘোষের মধ্যে। অর্থাৎ, একসঙ্গে মসি আর অসি হাতে নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন কবি ভোম্বল ঘোষ। আজকালকার দিনে এই তো চাই—এই তো হওয়া উচিত। কবি ভোম্বল ঘোষের কবিতায় আমরা দেখতে পাই নতুন জোয়ারের কলতান—নতুন হাওয়া...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই হাওয়া—মানে ঝোড়ো হাওয়া উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম আম পড়তে লাগল। সেকী অবস্থা! আকাশে মেঘ ডাকছে কড়-কড়—বাগানে গাছের ডাল ভাঙছে মড়-মড়। মুহূর্তে মঞ্চে রাখা ট্রফি-মানপত্র উড়ে পড়ল পুকুরের জলে। রান্নার হাড়ি-কড়া-গামলা-টামলা—কোনটা যে কোন দিকে উড়ে গেল কেউ বুঝতে পারল না। হইহই রইরই কাণ্ড। টর্নেডো-টর্নেডো বলে সবাই ছুটতে আরম্ভ করল। মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়লেন সীতাপতি ভড়, লঙ্কাপতি ধর আর গণপতি সর। বাবা গো—টর্নেডো বলে ছুটতে

লাগলেন ভড়-ধর-সর। দেখতে দেখতে বাগান ফাঁকা। দাঁড়িয়ে আছি শুধু আমরা চারজন। পুকুরটার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভোম্বলদা বলল—ভণ্ডুল, সত্যিই তোর নামটা সার্থক।

সঙ্গে সঙ্গে ঢোল গোবিন্দ বলে উঠল—সাধে কি আর আমি বলি, ভণ্ডুলদা যেখানে সবকিছু ভণ্ডুল হয় সেখানে।

বেজার মুখে ভণ্ডুলদা বলল—দেখছি, যত দোষ নন্দ ঘোষ।

—ছাড়ো তো এ সব কথা। আমি বললাম, এখানকার কিছুই চিনি না আমরা। এখন কোথায় থাকব, কী খাব—সেটা আগে ভাবো। পাঁচ-সাত মিনিটের একটা দুরন্ত হাওয়া সবকিছু শেষ করে দিল এই ভাবে!

—থাকার কথা ভাব আগে, খাওয়ার কথা পরে ভাবা যাবে। ঢোল গোবিন্দ বলল, ভোম্বলদার ফ্রায়েড রাইস আর স্পেশাল ওনিয়ন পাকোড়া এখানেও পাওয়া যাবে।

মুখে মুচকি হাসি এনে ঢোল গোবিন্দ ভোম্বলদার দিকে তাকাল।

ভোম্বলদার করুণ মুখ আরও করুণ হল। আস্তে আস্তে বলল—ফল ভোগ তো করলামই। আর কেন!

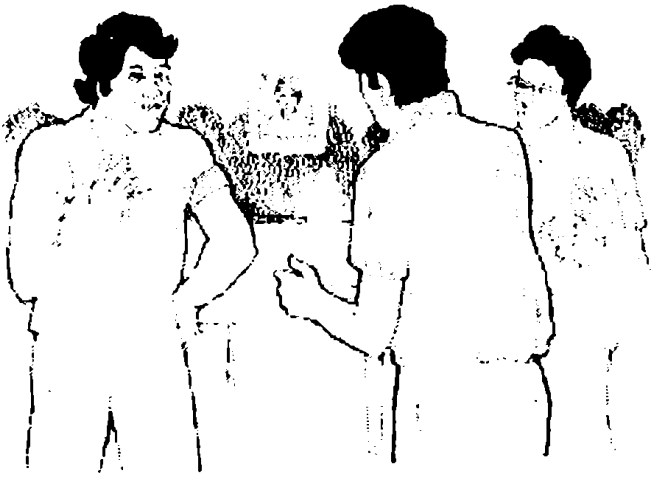

রাক্ষস আছে

মে মাস। পথে-ঘাটে যেন আগুন জ্বলছে। সূর্যের গনগনে আঁচের মধ্যে লোক চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। কী গরম-কী গরম! কলকাতার মতো শহরেও রাস্তাঘাট ফাঁকা—ধূ-ধূ। বেলা না পড়লে বড়ো একটা কেউ রাস্তায় বেরোয় না। তাই আমরা আমাদের ক্লাবে সাতটা-সাড়ে সাতটার আগে কেউ আসি না।

আজ রবিবার। আমাদের রবিবাসরীয় সাহিত্য-আসর বসবে সাড়ে সাতটায়। এখন সবে চারটে। সূর্যের তাপ কিছুটা কমলেও রাস্তার গরম বড়ো একটা কমেনি। তবুও আমাকে এখনই বেরোতে হবে। কারণ, বাড়ি-ভর্তি লোকের মধ্যে লেখালেখি অসম্ভব। অথচ কালই গল্পটা জমা দিতে হবে। তাই ছাতা আর খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ক্লাবের উদ্দেশ্যে। ক্লাবে বসেই গল্পটা লিখব।

কিন্তু ক্লাবে ঢুকে আমি অবাক। একী কাণ্ড! ক্লাব-সেক্রেটারি ভোম্বল ঘোষ মানে আমাদের বিখ্যাত ভোম্বলদা এই অসময়ে ক্লাবে! এ যে চিন্তার বাইরে। এখন তো ক্লাবে কারও আসার কথা নয়। এ সময়ে ক্লাবে ভোম্বলদার আসা মানে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। চমক-চটক-নাটক মানেই তো ভোম্বলদা। কে জানে কী উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছে এখানে।

ভোম্বলদা আমাকে দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল—তা তুই... তুই এই ভরদুপুরে এখানে কেন রে হুলো?

—আমারও তো ওই একই প্রশ্ন। তুমি এই অসময়ে এখানে কী করছ?

ভোম্বলদা আমার কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলল—শোন হুলো, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। একমাত্র তোকেই

আমি বলতে পারি। কিন্তু তার আগে তুই আমায় কথা দে, কাউকে বলবি না।

—কথা দিলাম। আমার মুখ থেকে কথা বেরোবে না।

—তবে শোন। আমি রানাঘাটের পানতুয়া এনেছি। ওই দ্যাখ, আলমারির পাশে হাঁড়িটা।

—তুমি কি রানাঘাট থেকে এলে?

—না রে। এই কাঠ-ফাটা রোদে রানাঘাট যাব কোন দুঃখে! আমি এলাম শিয়ালদা থেকে।

—শিয়ালদায় রানাঘাটের পানতুয়া! অবাক হয়ে ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকালাম।

চিনিমাখা মুখে ভোম্বলদা বলল—আমি একজনের একটা কাজ করে দিয়েছিলাম। তাই তিনি...

—খাওয়াচ্ছেন। বাকি কথাটা আমার মুখ থেকেই বেরিয়ে গেল।

—ঠিকই ধরেছিস। ভদ্দরলোক রানাঘাট থাকেন। তিনি-ই এনে দিয়েছেন।

—তা কি বুঝতে পারিনি! পরস্মৈপদী না হলে তুমি কিনবে এক হাঁড়ি পানতুয়া! গাঁটের কড়ি ব্যয় করার পাত্র তুমি! যাক গে সে কথা। আসল ব্যাপারটা খুলে বলো দিকি।

—মানে?

—পানতুয়ার হাঁড়িটা বাড়িতে না নিয়ে এখানে আনলে কেন?

—সে কথা শুনলে পাষাণেরও বুক ফেটে যাবে রে হুলো। করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বুক-ফাটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভোম্বলদা।

—সেকী!

—আর বলিস কেন! সাধে কি আর পানতুয়ার হাঁড়িটা এখানে নিয়ে এসেছি!

—তা বেশ করেছ। তবে এমন একটা মারাত্মক ঘটনা তোমার চেপে রাখাটা ঠিক হয়নি। আমাদের জানাতে পারতে।

—তোদের জানালেও কোনো সুরাহা হত না।

—বলেই দেখতে।

—বললে আরও বেশি ক্ষতি হত।

—তোমার হেঁয়ালি ছাড়ো তো। আসল ব্যাপারটা খুলে বলো।

—আসল ব্যাপার! অসহায়ের মতো মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে ভোম্বলদা বলল, বাবা আমাকে শেষ করে দিয়েছেন রে হুলো। আমি একেবারে শেষ হয়ে গেছি।

—বাবা মানে মেসোমশাই-এর কথা বলছ?

—তা ছাড়া আর কার কথা বলব!

অবাক হয়ে বললাম—মেসোমশাই-এর মতো ভালো মানুষ গোটা কলকাতায় আর কজন আছেন তা আঙ্গুলে গোনা যায়। আর সেই মানুষটি একেবারে শেষ করে দিয়েছেন তোমাকে? কী যা-তা বলছ ভোম্বলদা!

—যা-তা নয়, ঠিকই বলছি। সেই প্যাথেটিক-কাহিনি শুনলে তোর চোখেও জল আসবে রে হুলো।

ভোম্বলদার কথা শুনে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। আস্তে-আস্তে বললাম—তা হলে ব্যাপারটা খুলেই বলো না!

—তবে শোন। ভোম্বলদা বলল, বাবার জানাশোনা একটা ছেলে নাকি নেমন্তন্ন বাড়িতে খুব বেশি খেয়ে ফেলেছিল। ফলে...

—তাতে কী হল? ভোম্বলদার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার জিজ্ঞাসা।

—যা হওয়ার নয় তাই হল।

—মানে?

—ছেলেটা মারা গেল।

—আহা, বেচারা! বলে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু সেই ছেলেটার খাওয়ার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

—তা-ও বুঝতে পারলি না?

—না।

—ছেলেটা বেশি খেয়ে মরে গেল। তাতে বাবা আমার খাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

—কেন?

—যাতে আমি বেশি না-খাই তার জন্যে বাবা আমার খাবারের একটা 'চার্ট' করে মা-র হাতে দিয়েছেন। মা তার বাইরে একফোঁটাও আমাকে দেন না। আর সেই 'চার্টে' আছে সারাদিনে মাত্র দুটো মিষ্টি। এ বেলা একটা, ও বেলা একটা।

—তা তুমি তো ইচ্ছে করলে বাইরেও খেতে পারো।

—বাইরে খাব... মানে... আমতা-আমতা করতে লাগল ভোম্বলদা।

ব্যাপারটা বুঝে সঙ্গে সঙ্গে বললাম—ভুল বলেছি। তুমি তো আবার পকেটের পয়সা ব্যয় করে কখনও কিছু খাও না। তা এখন থেকে একটু-আধটু প্র্যাকটিস করো। সারা জীবন কি আর অন্যের উপর বডি থ্রো করা যায়?

—তুই-ও আমার দুঃখটা বুঝতে পারলি না রে হুলো! আমার কপালটাই খারাপ।

—এতে আবার কপাল খারাপের কী হল?

—কী হয়নি বল? এই এক মাসে আধপেটা খেয়ে আমার চেহারাই তো অর্ধেক হয়ে গেছে।

কথাটা শুনে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। দৈত্যের মতো চেহারা যেমন ছিল তেমনি আছে। তাই ভোম্বলদার দিকে চেয়ে ঠোকা দিলাম—এর মধ্যে ওজনটা নিয়েছ কি?

—এবার নিতে হবে।

—আগে নাও। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে—আচ্ছা ভোম্বলদা, তোমার 'ডায়েট চার্টে'র কথা আমাদের বললে ক্ষতিটা কী হত তা তো বুঝতে পারলাম না।

—বুঝতে পারলি না?

—না।

—'ডায়েট চার্টে'র কথা শুনলে তোরাও তো খাওয়ার ব্যাপার-ট্যাপার চেপে যেতিস আমার কাছে। তাতে আমার ক্ষতি হত না? ঘরে-বাইরে দুই জায়গাতেই আমার খাওয়া বন্ধ।

—ধুর ঘোড়াড্ডিম, এই কথার জন্যে এত ভূমিকা! তোমার এই খাই-খাই রোগটা এবার কমাও।

—তোরা শুধু আমার খাওয়াটাই দেখিস। কী নজর রে বাবা তোদের! তোদের নজরের জন্যেই আজ আমার এই দুরবস্থা। না হলে নিজের বাবা ছেলের খাওয়া বন্ধ করে! মা-ও পুত্রস্নেহ ভুলে যায়!

মনে মনে হেসে বললাম—কথার মতন কথা একখানা বলেছ সত্যিই দারুণ প্যাথেটিক ব্যাপার।

—তা হলে বুঝে দ্যাখ।

—বুঝলাম। বেশ ভালো করেই বুঝলাম।

—কী বুঝলি?

—বুঝলাম মাসিমা-মেসোমশাইয়ের ভয়ে তুমি পানতুয়ার হাঁড়িটা বাড়িতে নিয়ে যেতে পারোনি। তা বেশ। তবে কতগুলো পানতুয়া আছে হাঁড়িতে?

—বেশি না। নোলার জল টানতে টানতে ভোম্বলদা বলল, একশোটা।

—মাত্র! একশোটা পানতুয়ায় তোমার পেট ভরবে?

—এর বেশি তো আর একজন লোকের কাছে চাওয়া যায় না।

অবাক হয়ে বললাম—খাওয়ার ব্যাপারে তোমার...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ভোম্বলদা বলল—হাজার হোক ভদ্দরলোকের সঙ্গে তো নতুন আলাপ। একবারেই বধ করতে চাই না। তা হলে পালিয়ে যাবে। কী বুঝলি?

—তা ঠিক। তবে এ তো স্রেফ তোমার কাছে নস্যি।

—তা হলেও তোকে দুটো দেব। আরে হ্যাঁ, তুই হঠাৎ এই অসময়ে ক্লাবে এলি কেন?

—একটা রাক্ষসের গল্প লিখব বলে। আজ ছুটির দিন। বাড়িভর্তি লোক। লেখার খুব অসুবিধে হচ্ছে দেখে চলে এলাম। কালকেই গল্পটা জমা দিতে হবে। ভালোই হলো। প্লটের জন্যে আর চিন্তাভাবনা করতে হবে না।

—কেন?

—কল্পনার রাক্ষসের আর দরকার কী! বাস্তবের জীবন্ত রাক্ষস তো পেয়েই গেলাম। কথাটা বলেই আমি ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকালাম। মুখে আমার মৃদু হাসি।

ভোম্বলদা গম্ভীর মুখে কটমট করে আমার দিকে তাকাল। ব্যস, ওই পর্যন্তই। অন্য সময় হলে আর রক্ষে ছিল না। গাট্টা মেরে আমার ঠাট্টা একেবারে ভোঁকাট্টা করে দিত। এখন কিন্তু পারল না। তাই একেবারে চুপচাপ, ঠাণ্ডা। আগুন হতে গিয়েও জল হয়ে গেল। তা ছাড়া উপায় কী! এখন আমাকে গাট্টা-ফাট্টা মারা তো দূরের কথা, উলটে খাতির করতে হবে। আমি যে আসল রহস্যটা জেনে ফেলেছি—ভোম্বলদার 'ডায়েট-চার্ট'-রহস্য। ফাঁস হলেই ভোম্বলদার খাওয়া শেষ। চোখের সামনে রানাঘাটের পানতুয়ার হাঁড়ি। হাঁড়িতে একশো পানতুয়া। বার বার জুল জুল করে হাঁড়িটার দিকে তাকাচ্ছে ভোম্বলদা। ভুলেও এখন আমাকে চটাবে না। তাই চিনিমাখা মুখে ভোম্বলদা বলল—তোকে কিন্তু আমি একটা দারুণ রাক্ষসের গল্প বলতে পারি হুলো।

এবার আমি সত্যি আনন্দে নেচে উঠলাম। গল্প বলায় ভোম্বলদার

জুড়ি মেলা ভার। আমাদের সাহিত্যের আসরে রূপকথা বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় ভোম্বলদা। তাই আমিও গলায় মধু ঢেলে বললাম—সত্যি ভোম্বলদা, গল্প বলায় তোমার ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পারে না। প্লিজ, গল্পটা বলো।

—ঠিক হ্যায়। কিন্তু তার আগে যে একটা কাজ করতে হবে।

—বলো, কী কাজ?

কথার জবাব না দিয়ে ভোম্বলদা একটু হাসল। বুঝলাম কোনো মতলব আছে। তাই কুঁকড়ে গিয়ে বললাম—কাজটা কী বলো না!

—না, তোদের নিয়ে আর পারি না। পানতুয়ার হাঁড়িটার সামনে বসে কাজ জিজ্ঞেস করছিস! পানতুয়াগুলোর গতি করতে হবে না? রানাঘাটের পানতুয়া বলে কথা। আহা, কী জিনিস!

হাঁড়িটা খুলে ভোম্বলদার চোখ দুটো চিকমিক করে উঠল। সত্যি-সত্যি আমাকে দুটো পানতুয়া দিয়ে বাকি অষ্টানব্বইটা নিজেই সাবাড় করল ভোম্বলদা। কয়েক মিনিটের মধ্যে অতগুলো পানতুয়া শেষ। চোখে না দেখলে ভোম্বলদার এই খাওয়া বিশ্বাস করা যায় না। এ যেন পি. সি. সরকারের ম্যাজিক। মুহূর্তে সব হাওয়া।

ভোম্বলদার এই খাওয়া আমার কাছে অবশ্য নতুন কিছু নয়। বহু বার দেখেছি। দেখবও বহু বার। তাই খাওয়ার কথা এখন থাক। শোনা যাক রাক্ষসের গল্প।

পানতুয়াগুলো শেষ করে ভোম্বলদা শুরু করল ঃ

অনেক, অনেক বছর আগের কথা। আমার ঠাকুর্দার বাবার বাবা মানে ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার আমলের কথা। ওই সময়ে মঙ্গলগড় নামে একটা দুর্গ ছিল। দুর্গটার কাছেই ছিল এক বিশাল জঙ্গল। অসংখ্য গাছগাছালিতে ভরা দারুণ সুন্দর জঙ্গল। মঙ্গলগড়ের জঙ্গলের কথা তখন সবার মুখে-মুখে ঘোরাফেরা করত।

গাছে-গাছে মেশামেশি... ডালে-ডালে গলাগলি... লতায়-লতায়

জড়াজড়ি... জীবজন্তুর নাচানাচি... পাখিদের ওড়াউড়ি... এই সবই ছিল মঙ্গলগড়ের জঙ্গলে।

আর ছিল একটা সাজানো বাগান জঙ্গলের মাঝখানে। বাগানের ভিতরে ছিল ফুল-ফলের গাছ। রঙ-বেরঙের ফুল আর নানা রকমের ফল গায়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকত গাছগুলো। বাগানের মাঝখানটায় ছিল সবুজ নরম ঘাসের জাজিম।

আর ছিল একটা পুকুর। পুকুরটা ছিল ঠিক ফুল-ফলের বাগানের দক্ষিণ দিকে। রুই-কাতলা-মৃগেল খেলা করে বেড়াত জলের মধ্যে। ঝাঁকে-ঝাঁকে ইলিশ ঘুরত জলের তলায়।

অবাক হয়ে ভোম্বলদার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে খাবি খেলাম। বললাম—পুকুরে ইলিশ!

—ডিস্টার্ব করলি তো। ভোম্বলদা বলল, এর পর গল্পের খেই হারিয়ে ফেলব।

—খেই আমি ধরিয়ে দেব। কিন্তু পুকুরে ইলিশ...

—হয়, হয়। সব হয়। পুকুরটার সঙ্গে যে নদীর একটা যোগ ছিল।

—তাই বলে পুকুরে ইলিশ!

—ধুত্তোর! ইলিশ-ইলিশ করে তো মাথা খারাপ করে দিলি। শুনতে চেয়েছিস রাক্ষসের গল্প—আর চিল্লাচ্ছিস ইলিশ-ইলিশ করে। তুই থাক তোর ইলিশ নিয়ে, দরকার নেই আমার তোকে গল্প শুনিয়ে।

ভুল হয়ে গেছে। আর ইলিশের কথা তুলব না, তুমি রাক্ষসের গল্প বলো ভোম্বলদা। কাঁচুমাচু হয়ে কথাটা বললাম।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম—পুকুরে এই সব মাছের খেলা লোকে দেখত, কিন্তু একটা মাছও ধরত না কেউ। তা ছাড়া পুকুরের কাকচক্ষু জলে মৃদু ঢেউয়ের সঙ্গে দোলা খেত কয়েক ডজন রাজহাঁস। শিস দিতে দিতে পাখিরা উড়ে যেত পুকুরের এ-পার থেকে ও-পারে। এ-গাছ থেকে ও-গাছে। এ-ডাল থেকে ও-ডালে। বিশাল জঙ্গলের নানা

রকম গাছগাছালির সেকী মিষ্টি হাওয়া! নাচতে-নাচতে সে হাওয়া ঢুকে যেত মঙ্গলগড়ের রাজপ্রাসাদে।

ভোম্বলদা থামল। মুখে বিজয়ীর হাসি এনে আমাকে জিজ্ঞেস করল—কী বুঝলি?

—বুঝলাম মঙ্গলগড়ের জঙ্গলটা মঙ্গলময়।

—রাইট। ভোম্বলদা বলতে লাগল—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। হঠাৎ সুন্দর জঙ্গলটার রূপ-রঙ পালটাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে মাছগুলো হাওয়া হয়ে গেল। হাওয়া হল গাছের ফল-টলও। উধাও সব পাখিরা। জীব-জন্তুগুলোও যে কোথায় চলে গেল কে জানে! পর পর তিন দিন তিনটি মানুষ মারা গেল জঙ্গলের সামনে। মৃত মানুষ তিনটির শুধু হাড়ই পাওয়া গেল। ব্যস, মঙ্গলগড়ের জঙ্গলের কাছেপিঠে আর কেউ ঘেঁষে না। জঙ্গলের সেকী ভয়াল রূপ!

রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকে নিস্তব্ধ গাছগুলো। জ্বলে-নেভে শুধু জোনাকির আলো। রাত্রির বুক চিরে ভেসে আসে শুধু একটানা ঝিঁঝির ডাক। গা ছম্‌ছম্‌-করা জঙ্গলে এক অপার্থিব নিস্তব্ধতা। মনে হয় কোথাও যেন প্রাণের এতটুকু স্পন্দন নেই। মৃত্যু যেন ওত পেতে বসে আছে।

এমন সুন্দর জঙ্গলের হঠাৎ একী রূপ! দুশ্চিন্তায় রাজামশাইয়ের চোখে ঘুম নেই। সারাক্ষণ মনে একই প্রশ্ন। কী ব্যাপার? এর পিছনে রহস্যই বা কী? জঙ্গলটা এরকম কেন হল?

দু-চার দিনের মধ্যেই রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল। জঙ্গলে ঢুকেছে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস। সে নাকি বিরাট লম্বা। কম-সে-কম পঁচিশ ফুট। ভীষণ জোরে ছোটে সে। তার জন্যেই জঙ্গলের এই অবস্থা। সেই রাক্ষসটাই জঙ্গলের সবকিছু শেষ করে দিয়েছে। শত চেষ্টাতেও তাকে ধরা যাচ্ছে না। গোটা মঙ্গলগড়ে তখন আতঙ্কের ছায়া। ভয়ে-ভয়ে সবাই দিন গুজরায়। কখন যে রাক্ষসটা কোথায় ঢুকে পড়বে বলা মুশকিল।

আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা ছিলেন রাজামশাই-এর বন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল রাজামশাই-এর। কালবিলম্ব না করে তিনি ডেকে পাঠালেন আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাকে।

আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা ছিলেন বিরাট চেহারার মানুষ। তাঁকে দেখলে বাচ্চারা ভয়ে পালাত। বড়োরাও চমকে উঠত। তিনি ছিলেন ত্রিশ ফুট লম্বা। আর...

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। চমকে উঠে ঢোক গিলতে গিলতে বললাম—কত ফুট লম্বা বললে?

—ত্রিশ ফুট। জলের মতো কথাটা বলল ভোম্বলদা।

—মানুষ ত্রিশ ফুট লম্বা হয় নাকি?

—হয়, হয়। ত্রিশ ফুট কেন, ইচ্ছে করলে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুটও হতে পারে।

চেয়ার উলটে ধপাস করে পড়লাম।

ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—কী হল?

—কিছু না। আমতা-আমতা করে বললাম—মানুষ অত লম্বা হতে পারে?

—পারে।

—পারে! অবাক হয়ে বললাম, ইচ্ছে করলে লম্বা হওয়া যায়?

—যায়। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা লম্বা হতে পারতেন।

—সেকী! এমন অদ্ভুত কথা তো আজ পর্যন্ত শুনিনি।

—তুই শুনবি কোত্থেকে? এটা আমার পূর্বপুরুষের ব্যাপার। তোর তো জানার কথা নয়।

—তা ঠিক। তোমার পূর্বপুরুষের ব্যাপার তুমি ছাড়া কে-ই বা জানবে। তবুও তো আমরা অনেক মিথ-টিথ শুনে থাকি। কিন্তু এরকম কথা তো কখনও শুনিনি। তাই...

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই ভোম্বলদা বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে উঠল—তখন থেকে শুধু ফট্‌ফট্‌ করে যাচ্ছিস। বেশি

পণ্ডিতি ফলাতে যাস নে হুলো, বিপদে পড়বি।

—পণ্ডিতি ফলাতে গেলাম কোথায়?

—নয় তো কী? মিথ-টিথ বলছিস কেন? তুই কি সবজান্তা?

—না।

—তা হলে এত কথা বলছিস কেন? কথার মাঝখানে কথা বলতে তোকে বারণ করেছি না?

—ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না। তুমি বলে যাও।

—ফের যদি বাধা দিবি তো বিপদে পড়বি।

—মাথা খারাপ! আর বাধা দিই। তোমার পূর্বপুরুষের কেউ ত্রিশ ফুট কেন, তিনশো ফুট লম্বা হলেও আমার মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোবে না। একেবারে স্পীকটি নট হয়ে থাকব।

—তবে শোন। আগেকার দিনে লোকে রণপা পরে যুদ্ধ করত, ডাকাতি করে পালিয়ে যেত। কারণ, রণপা পরে খুব জোরে ছোটা যায়। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাও রণপা পরতেন। কী বুঝলি?

—বুঝলাম তুমি ঠিকই বলেছ। রণপা পরে লম্বা হওয়া যায়। তোমার ঠাকুর্দার ঠার্কুদা রণপা পরে লম্বা হতেন।

—রাইট। এই সোজা কথাটা তোর মাথায় ঢোকে না?

—ভুল হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে তা হলে আর ডিস্টার্ব না করে চুপ করে শুনে যা গল্পটা।

আমি বললাম—তথাস্তু।

ভোম্বলদা আবার শুরু করল ঃ

রাজ-অতিথি হয়ে আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা এলেন মঙ্গলগড়ে। রাজামশাই রাক্ষসের দৌরাত্ম্যের পুরো কাহিনি জানালেন আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাকে। সব শুনে আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা বললেন—তিন দিন... মাত্র তিনটে দিন আমাকে সময় দিন। তিন দিনেই কিস্তিমাত করব।

রাজামশাই জিজ্ঞেস করলেন—কিস্তিমাত মানে?

—কিস্তিমাত মানে আমার জয়। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা বললেন, তিন দিনের মধ্যে আমি রাক্ষসটাকে এমন টাইট দেব যে ও জঙ্গল ছেড়ে পালাবার পথ পাবে না। আমার নাম দৈব ঘোষ। দৈব ঘোষ যে কী চিজ হাড়ে-হাড়ে টের পাবে শয়তানটা। একবার মুখোমুখি হলেই ও বুঝবে কার সামনে পড়েছে।

কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল ভোম্বলদা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—থামলে কেন? আমি তো কথার মধ্যে কথা বলিনি। চুপ করেই আছি।

মনে হল ভোম্বলদা যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি। আর শুনতে পেলেও জবাব দেওয়াটা দরকার মনে করেনি। ভাবখানা এমন যে বিরাট কিছু একটা করে ফেলেছে সে। তাই বোধহয় আমার মুখের দিকে চেয়ে শুধু হাসতে লাগল।

—যা-বাব্বা, কী হল তোমার? হাসছ কেন?

—বলিস কী তুই! হাসব না? আমি তো এখন আনন্দে আত্মহারা। গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠেছে রে হুলো।

—কেন, কেন? হঠাৎ কীসের গর্বে তোমার বুকটা ফুলে উঠল?

—আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা দৈব ঘোষ রাক্ষসটাকে ল্যাং মেরে ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছিলেন। পূর্বপুরুষদের এত বড়ো কৃতিত্বে কার না বুক ফুলে ওঠে রে!

ভোম্বলদার কথায় হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না। তাই বেকুবের মতো হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভোম্বলদার মুখে কিন্তু অস্বস্তির কোনো লক্ষণ নেই। ভাবান্তরের লেশ নেই। কোনোদিকে দৃকপাত না করে সে বলে চলল—সে এক অদ্ভুত ঘটনা। যেমন রোমহর্ষক তেমনি বিস্ময়কর। অমাবস্যার রাত। চারদিক শুনশান। সারা বিশ্বপ্রকৃতি যেন থমথম করছে। কালো মেঘে ঢাকা আকাশ। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই। মঙ্গলগড়ের জঙ্গলের সেকী

ভয়ঙ্কর রূপ! ঘুটঘুটে অন্ধকার... গা ছম্‌ছম্‌ করা পরিবেশ... বড়ো বড়ো গাছগুলো অতিকায় দৈত্যের মতো ভয়াল মূর্তি ধারণ করেছে... দেখলে মনে হয় জঙ্গল তো নয়, যেন যমপুরী। জঙ্গলের চারপাশে মানুষের ঢল নেমেছে। সবার মনেই আশঙ্কা। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা দৈব ঘোষ একাই জঙ্গলে ঢুকবেন রাক্ষসটার সঙ্গে লড়াই করার জন্যে। একটা থমথমে পরিবেশ। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

রাত তখন অনেক। দারুণ কিছু ঘটতে চলেছে। দৈব ঘোষ মুখোশ পরলেন। ভয়ঙ্কর মুখোশ। মুখে একটু কেরোসিন নিলেন। দুচোখের উপর দুটো টুনি-বাল্ব লাগালেন। ব্যস, তারপরই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। ব্যাটারির সাহায্যে দু-চোখের টুনি-বাল্ব দুটো জ্বলছে-নিভছে। তাঁর হাতে ছিল একটা মশাল। মশালটাকে মুখের কাছে নিয়ে তিনি ফুঁ দিলেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। একটু পরে আবার আগুনের তেজ কমে গেল। শুধু মশালটাই জ্বলতে লাগল। আবার ফুঁ দিলেন। আবারও সেই একই দৃশ্য। অর্থাৎ, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। দৈব ঘোষের মুখে তো কেরোসিন তেল ছিলই। ফুঁ দিয়ে তিনি যখন সেই তেল মশালের উপর ফেলছিলেন তখন খুব জোরে আগুন জ্বলে উঠছিল। আসলে আগুনে কেরোসিন তেল পড়লে এরকমই হয়। সবাই এই দৃশ্য দেখল।

এবার দৈব ঘোষ জঙ্গলে ঢোকার জন্যে তৈরি হলেন। রণপা পরে তিরিশ ফুট লম্বা হয়ে গেলেন। এক হাতে মশাল ধরলেন আরেক হাতে তলোয়ার। সেই সঙ্গে একটা শিশিতে কিছুটা কেরোসিন তেল নিলেন। মুখোশ আর টুনি-বাল্ব তো মুখে-চোখে লাগানোই ছিল। অদ্ভুত এক ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করলেন আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা দৈব ঘোষ। এরকম চেহারা দেখলে কার না রক্ত ভয়ে হিম হয়ে যায়! মানুষ কেন রাক্ষসেরও বুক কেঁপে ওঠে। উঠেও ছিল।

এরকম ভয়াল মূর্তি ধারণ করে ঘুটঘুটে অন্ধকারে মঙ্গলগড়ের জঙ্গলে ঢুকলেন দৈব ঘোষ। বাইরে অসংখ্য মানুষের মনে তখন বিরাট

আতঙ্ক। কী হয়—কী হয় ভাব।

রাক্ষসটা আগে থেকেই টের পেয়েছিল রাতে জঙ্গলে কেউ ঢুকবে। তাই সে ওত পেতে ছিল দৈব ঘোষকে ধরার জন্যে।

দৈব ঘোষও জঙ্গলে ঢুকে আগুনের খেলা শুরু করলেন। একে মুখোশ-পরা ওই ভয়ঙ্কর রূপ। তার উপর আবার মুখের সামনে জ্বলছে-নিভছে আগুন। হাতে চকচক করছে তলোয়ার। বিরাট লম্বা একটা প্রাণী।

রাক্ষসটাও এই সব দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল—তুই কে রে?

আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাও জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমার নাম দৈব ঘোষ। তোর যম।

—আমার জঙ্গলে কেন ঢুকেছিস?

—তোকে এখান থেকে তাড়াব বলে।

ব্যস, আর কোনো কথা নেই। সব চুপচাপ। বাইরে সবাই তখন আতঙ্কে কাঁপছে। হঠাৎ দেখা গেল জঙ্গলের অনেক গাছ মড়-মড় করে ভেঙে পড়ছে। ছোটাছুটির আওয়াজ বাইরে ভেসে আসছে। বোঝা গেল আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার সঙ্গে রাক্ষসের লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ শোনা গেল করুণ আর্তনাদ। জঙ্গলের বাইরে যারা ছিল তাদের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। তারপর দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। রাক্ষসটাকে টেনে নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেন আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা দৈব ঘোষ। রাক্ষসটার অবস্থা তখন রীতিমতো সঙ্গিন। সবাই অবাক। রাক্ষসকেই ল্যাং মেরে ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছেন দৈব ঘোষ। কী বুঝলি?

—যা বোঝার ঠিকই বুঝেছি।

—তবুও বল না।

আমি বললাম—বলার আর কী আছে! গুলের ফোয়ারা ছোটালে।

ভোম্বলদা হনুমানের মতো দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল—গুল তো

হবেই। রাক্ষসের গল্প আবার সত্যি হয় নাকি?

—কে বলেছে সত্যি হয় না... বলতে বলতে টুলো ক্লাবে ঢুকল।

ভোম্বলদা আর আমি অবাক হয়ে টুলোর মুখের দিকে তাকালাম।

—এতে অবাক হওয়ার কী আছে? টুলো মৃদু হেসে বলল, সারা দেশ জুড়েই তো আজ রাক্ষসেরা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—তুই কি গুণ্ডা-মস্তান বা জঙ্গিদের কথা বলছিস?

হো-হো করে হেসে উঠল টুলো। ভোম্বলদার মুখের দিকে চেয়ে বলল—বলিহারি তোমার বুদ্ধি। ওই সব চুনোপুঁটিদের কেউ রাক্ষস বলে?

আমি বললাম—তুই বা কথাটা পরিষ্কার করে বলছিস না কেন?

টুলো বলল—আমি যা বলতে চাই তা তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। রক্ষকরাই আজ ভক্ষক। মুষ্টিমেয় কিছু ভালো নেতা ছাড়া বাকিরা সব ঘুষখোর অসৎ অযোগ্য লোভী। তাদের জন্যেই তো আজ দেশটা শেষ হতে চলেছে। গল্পের রাক্ষস তো আর মানুষ খায় না। তারা শুধু কল্পনা। কিন্তু বাস্তবের এই রাক্ষসগুলোই কোটি কোটি মানুষকে শেষ করে দিচ্ছে। সুতরাং রাক্ষস আছে। রাক্ষসের গল্পও থাকবে।

ভোম্বলদা বলল—রাইট। সত্যিই তো এই রাক্ষসদের জন্যে আজ দেশের এই হাল।

আমি বললাম—পেয়ে গেছি।

ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—কী পেয়েছিস?

—গল্পের নাম।

—ভেরি গুড। ভোম্বলদা বলল, তা হলে নামটা বল। শোনা যাক!

বললাম—'রাক্ষস আছে'।

টুলো বলল—দারুণ একখানা নাম!

ছোটোমামার কাণ্ড

কাজের চাপে বছর দুয়েক কলকাতার বাইরে পা ফেলতে পারিনি। যাই-যাই করেও কোথাও যাওয়া হয়নি। তবে গত বছর যাওয়ার সুযোগ এলেও আমি যাইনি। অবশ্য না যাওয়ার কারণ ছিল।

বাড়ির সবাই যাচ্ছিল ধর্মকর্ম করতে। আমার মতো ঘোর নাস্তিকের ওই দলে ঢোকা মানে তাদের অস্বস্তিতে ফেলা। অস্বস্তিতে পড়ত তাদের সঙ্গীরাও। ভালো লাগত না আমারও। তা ছাড়া যাওয়ার দিনতিনেক আগে হঠাৎই ছোটোমামা বিনা নোটিসে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। ছোটোমামাকে পেলে আমি সবকিছু ভুলে যাই। সেও আমার মতো নাস্তিক। বাবা বললেন—তোমরা দুই নাস্তিক তো আমাদের মতন আস্তিকের দলে ভিড়বে না। তাই এখানেই থাকো।

ছোটোমামা আমার চেয়ে মাত্র বছর দেড়েকের বড়ো। বলতে গেলে প্রায় সমবয়সী। তাই বন্ধুর মতোই। আমাদের দুজনের মতের মিল প্রচুর। মনেরও। চেহারা-চরিত্রেরও। অনেকে মনে করে, আমরা দুই ভাই। মামাবাড়িতে তাই ছোটোমামার সঙ্গে আমার ভাব বেশি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। তবে বেশিরভাগ সময় কাটে আমাদের ধর্মব্যবসার আলোচনা নিয়ে। ধর্মের নামে অধর্ম করে কী ভাবে আমরা রসাতলে যাচ্ছি, সে সব কথা ছোটোমামা আমাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলে। আমি অবাক হয়ে শুনি। মোদ্দা কথা, এই সব কারণে গত বছর আমার বাইরে যাওয়া হয়নি।

এবার কয়েক দিন পরেই পুজো। তাই ঠিক করেছি বাইরে যাবই যাব। কলকাতার বদ্ধ জীবনযাত্রার একঘেয়েমি আর ভালো লাগছে না।

কোথায় যাওয়া যায় ভাবছি, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে

উঠল। ফোনটা তুলে হ্যালো বলতেই ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল ছোটোমামার কণ্ঠস্বর।

—হুলো, কেমন আছিস?

—ভালো। তুমি কেমন?

—একদম ভালো নেই।

—কেন, কী হয়েছে ছোটোমামা?

--হয়েছে অনেক কিছু। শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

—সেকী!

—হ্যাঁ রে। তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

—বলো।

—সে সব কথা এ ভাবে ফোনে বলা যাবে না। তোকে এখানে আসতে হবে। পারিস তো আজই চলে আয়।

—আজ কী করে হবে ছোটোমামা?

—কেন, অসুবিধে কী? এখন তো সবে সকাল সাতটা। কাঁথি আসতে কতক্ষণই বা লাগে।

—আসলে দিন পাঁচেক পরেই তো পুজো। সব গুছিয়ে-টুছিয়ে যেতে হবে তো। পাশেই দিঘা। দিঘায় পুজোর ছুটিটা কাটিয়ে আসব। তুমি তো জানো দু-বছর আমি কোথাও বেড়াতে যাইনি। তাই...

আমার কথার মধ্যেই ছোটোমামা বলল—দিঘায় পুজোর ছুটি কাটিয়েই যাবি, তোর সঙ্গে আমিও থাকব। তুই আজই চলে আয় হুলো।

—ঠিক আছে ছোটোমামা। তোমার যখন এতই জরুরি ব্যাপার তখন আমি নিশ্চয়ই যাব। তবে আমাকে একটা দিন সময় দাও। আমি কালই তোমার কাছে চলে আসছি।

—তা হলে ছাড়ি... বলে ছোটোমামা ফোন ছেড়ে দিল।

পরের দিন। মামাবাড়ি যাওয়ার জন্যে তৈরি হলাম। গড়িয়াহাট

মার্কেটে এসে টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনলাম। বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি অফিসে পৌঁছে অফিসের বাকি কাজ শেষ করলাম। ম্যানেজারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আমি যখন বাড়ির দিকে পা বাড়াই বেলা তখন চারটে। বাড়িতে পৌঁছতে-না-পৌঁছতে মা আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন—পড়।

চিঠিটা দিদিমা লিখেছেন মাকে।

—স্নেহের অমলা,

তুই শুনে অবাক হবি যে তোর ছোটোভাই বাবলু সাধন-ভজন নিয়ে ব্যস্ত। সে এখন গেরুয়া পরে। দু-চারজন শাগরেদও জুটেছে তার। তাদের নিয়ে দিনরাত ঘরে থাকে। নাম-সংকীর্তন করে। নিরামিষ আহার করে। লোকের সঙ্গে বড়ো একটা দেখাসাক্ষাৎ করে না। আমাদের সঙ্গেও তেমন কথাবার্তা বলে না। তার মতো নাস্তিকের এই অদ্ভুত পরিবর্তন আমাদের বিস্মিত করে তুলেছে। তোর বাবা তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছেন। ছেলে পাগল-টাগল হয়ে যাবে না তো! আমরা সকলেই ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালবিলম্ব না করে হুলোকে এখানে পাঠিয়ে দে। হুলো ছাড়া কারও পক্ষে এ-রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়।

হুলো এখানে পৌঁছলে আমরাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি। তোমরা আমার আশীর্বাদ নিও।

ইতি—মা।

চিঠি পড়ে আমি অবাক। সকালে ছোটোমামার ফোন। বিকেলে দিদার চিঠি। দুজনেরই আমাকে দরকার। ব্যাপারটায় কেমন যেন রহস্যের আভাস।

তাই মাকে বললাম—ব্যাপারটা বেশ জটিল বলে মনে হচ্ছে আমার।

মায়ের চোখে প্রায় জল আসার উপক্রম। ছলছল চোখে মা

বললেন—কাল সকালেই তুই ফার্স্ট বাস ধরে চলে যা হুলো। কাঁথিতে পৌঁছেই ফোন করবি।

—তা না হয় করলাম। কিন্তু ব্যাপারটা তো বুঝতে হবে। দুজনেই আমাকে চাইছে কেন। এর পিছনে রহস্যটা কী।

—রহস্য-টহস্য যা দেখার তুই দ্যাখ বাপু। আমার একটাই কথা, কোনো ক্ষতি যেন না হয়। তা হলে এই বুড়ো বয়সে মা আর বাঁচবেন না।

—ঠিক আছে। তুমি এ নিয়ে কোনো চিন্তা কোরো না মা।

পরের দিন সাতসকালেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। চান-টান সেরে চটপট তৈরি হয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি কাঁথির উদ্দেশ্যে।

বাসে বসে নানা কথা ভাবছি। ছোটোমামার হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণটা কী, এই কথাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে বেশি। আমার দুরন্ত মন তখন উড়ন্ত হয়ে উঠেছে ছোটোমামার কাছে পৌঁছনোর জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাস কাঁথিতে পৌঁছল। বাস থেকে নেমে আমি জোরে পা চালালাম। পাশেই মামাবাড়ি। মিনিট তিনেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম।

মামাবাড়ি এলে সবার আগে আমি যাই দাদু-দিদার কাছে। আর সব শেষে যাই ছোটোমামার কাছে। ছোটোমামার সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠি। প্রাণ খুলে আমরা আড্ডা দিই। আগেই বলেছি, ছোটোমামা আমার বন্ধুর মতো। তাই সবার সঙ্গে আগে দেখাসাক্ষাৎ করে শেষে ছোটোমামার কাছে এসে জমে যাই। এবার কিন্তু আগে এলাম ছোটোমামার কাছে। ছোটোমামা আমাকে তো দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। বলল—তুই এসেছিস! বাঁচালি! বোস এখানে।

—কী ব্যাপার বলো তো? আমি বললাম, এই সব গেরুয়া বসন

পরেছ কেন? সত্যি-সত্যি তুমি সাধু হয়েছ নাকি?

—ধুত, সাধু হব আমি! তোর মাথা খারাপ হয়েছে?

—সেটাই তো ভাবছি। মাথা খারাপ কার হয়েছে—আমার, না তোমার। খুলে বলো তো ব্যাপারটা।

—ব্যাপারটা খুব প্যাথেটিক। বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ফেরত দিতে পারছি না। আর টাকা-পয়সার ব্যাপারে বাবাকে তো জানিস...

—জানি, মানে ভালো করে জানি। দাদুর মতো কিপটে লোক ভূ-ভারতে খুব কমই আছে।

—তা হলে এবার ভেবে দ্যাখ আমার অবস্থাটা।

—সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু টাকাটা গেল কোথায়? তা ছাড়া তোমার এই বেশ ধারণের কারণটাই বা কী?

—বলছি। সব বলছি। টাকাটা গেল আমারই দোষে। এক বোকা ব্যবসায়ীর পাল্লায় পড়ে।

—যেমন?

—একদিন এক বিয়েবাড়িতে তার সঙ্গে আলাপ। সে ছিল কেটারার। দারুণ রান্না হয়েছিল। খেয়ে তারিফ করতে গিয়েই বিপত্তি।

—কেন, কেন?

—লোকটি আমার সঙ্গে ব্যবসার কথা নিয়ে আলোচনা শুরু করল। ওর কথায় আমি মুগ্ধ হলাম। আর তুই তো জানিস চাকরি-বাকরিতে আমার উৎসাহ বরাবরই কম। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই ঝোঁকটা বেশি। তাই ওর সঙ্গেই লেগে পড়লাম। চুপচাপ আর কত কাল বসে থাকা যায়! বয়েস তো বাড়ছে।

—ব্যস, তারপরেই গণেশ উলটে গেল। এই তো তোমার ব্যাপার?

—না। গণেশ ঠিক ওল্টায়নি। ওর জন্যেই উল্টে গেল।

—মানে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করল?

—তা-ও ঠিক নয়। প্রতারণা করার বুদ্ধিও ওর নেই।

—তবে?

—ওর বোকামি আর চালবাজিতে ব্যবসা লাটে উঠল।

—কী রকম?

—কেটারিংয়ের ব্যবসায় পনেরো পার্সেন্টের বেশি লাভ হয় না। ও পুরো টাকাটা অগ্রিম পাওয়ার জন্যে দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিতে লাগল পার্টিকে। ফলে লাভের অঙ্ক কোথায় গিয়ে পৌঁছোল তা বুঝতেই পারছিস। তবুও অল্প লাভে ব্যবসাটা চলছিল। তা ছাড়া আমিও তো আবার তোদের ভোম্বলের মতন পেটুক। ভালোমন্দ খেয়ে কিছু পুষিয়েও যাচ্ছিল আমার।

—বুঝেছি। খাওয়ার লোভেই তোমার এই দশা।

—না রে হুলো, তা ঠিক নয়। ব্যবসাটা ডুবল ওই ব্যাটার চালবাজির জন্যে।

—লোকটার নাম কী বলো তো?

—কবীর দীক্ষিত। তোদের কলকাতার লোক।

—ও হরি, ওকে তো আমি চিনি। একখানা চিজ বটে।

—চিজ বলে চিজ। পার্টি এলেই শুরু হয় গুলের ফোয়ারা। চোখ-কান বুজে বলতে শুরু করে সারা কলকাতায় 'দীক্ষিত কেটারার্স'-এর দশটা ব্রাঞ্চ আছে। পাঁচ খানা ডেলিভারি ভ্যান। সাতটা নতুন প্রাইভেট এ. সি. কার। আরও কত কী!

—মাত্র?

—মানে!

—অনেককে এর ডবলও বলে। তা তুমি আমাকে ব্যবসার কথাটা জানাওনি কেন?

—খানিকটা ইচ্ছে করেই বলতে পারিস।

—কারণ?

—আগে দু-দুবার তুই বাধা দিয়েছিস। এবারও যদি...

—বাধা দিই। সেই জন্যে তুমি জানাওনি। এখন তো হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছ বাধা দিয়ে ভালো করেছি না মন্দ করেছি। যাক গে। তুমি সাধুর বেশটা ধারণ করলে কেন ছোটোমামা?

—তা ছাড়া উপায় কী? বাবা তো পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যে চাপ শুরু করেছে। এই অবস্থায় দেখলে হয়তো আপাতত কিছুদিন চুপ করে থাকবে।

—পরে কী করবে?

—সেই পরের জন্যেই তো তোকে ডেকে পাঠিয়েছি।

—বুঝলাম। কিন্তু কবীর দীক্ষিতের ব্যবসা লাটে উঠে তোমার টাকাটা চোট হল কী করে—সে কথা তো এখনও বলোনি।

—সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। সবার সঙ্গে যেমন চালাকি করে তেমন চালাকি করতে গিয়েই বাবু কুপোকাত। ইনকাম-ট্যাক্সের লোকেদের পার্টি ভেবে মোক্ষম চাল চেলেছিল।

—যেমন?

—ওই একই গল্প শুরু করেছিল। অর্থাৎ, পাঁচখানা নতুন গাড়ি। দশটা ব্রাঞ্চ। সাতটা বাড়ি। ইত্যাদি—ইত্যাদি...

—তারপর?

—তারপর যা হয় তা-ই হল। তারা সব নোট করে নিয়ে নোটিস পাঠাল। গাধাটা কোনো নোটিসেই হাজির হল না। ফলে ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট-ট্যাকাউন্ট সব সিজ করে দিল। ব্যস, ওর সঙ্গে আমিও ডুবলাম। এখন বাবার হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর দায়িত্ব তোর। বাবা তোকে ভীষণ ভালোবাসেন। তোর কথা ছাড়া উনি কারও কথাই শোনেন না। একমাত্র তুই পারিস বাবাকে ম্যানেজ করতে।

শেষ পর্যন্ত আমিই দাদুকে ম্যানেজ করলাম। ছোটোমামাকে

শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে ছোটোমামা আর আমি হাজির হলাম দাদু-দিদার কাছে।

দাদু আমাকে তার পাশে বসিয়ে বললেন—বলো হে বিজনেস-ম্যাগনেট, তোমার ভেড়ির বাগদার খবর কী?

—সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এলাম দাদু। এবার পুজোর পরই ওই অঞ্চলের সব ভেড়ি অকশান হবে। হাজার পঞ্চাশেক টাকার দরকার। তোমাকে দিতে হবে।

—বলিস কী রে! স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দাদু বললেন, এত টাকা এখন আমার কাছে কোথায়! সবই তো ব্যাঙ্কে ফিক্সড-ডিপোজিট। তা ছাড়া তোর টাকার দরকার হল কেন?

—এবার ভেড়িটা আরও বড়ো হচ্ছে।

—বুঝলাম। কিন্তু কী করা যায় এখন বল তো!

—কোই বাত নেহি। আমি বললাম, ছোটোমামার কাছে তোমার যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে আপাতত সেটা দিয়ে আমি কাজ চালিয়ে নিই।

ঢোক গিলে দাদু বললেন—তুই জানলি কী করে?

—ছোটোমামার কাছ থেকে। ছোটোমামা তোমাকে টাকাটা ফেরত দেবে বলছিল।

—ঠিক আছে। তবে এবার কিন্তু বড়ো সাইজের বাগদা খাওয়াতে হবে।

—অবশ্যই।

—তা হলে ছোটোমামার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নাও।

ছোটোমামার মুখের দিকে চেয়ে দেখি তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। দিদাকে আলাদা ডেকে বললাম—চিন্তার কিছু নেই। আমি ছোটোমামাকে নিয়ে দিঘায় যাচ্ছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। দু-চারদিনের মধ্যেই এখানে ফিরে আসব। দিদার দুশ্চিন্তা হয়তো কিছুটা কমল।

তবুও আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

ছোটোমামার ব্যাপারটা ম্যানেজ হলেও গল্পটা কিন্তু শেষ হল না।

পরের দিন বেলা বারোটা নাগাদ দিঘার উদ্দেশ্যে আমরা বেরিয়ে পড়ব-পড়ব করছি, এমন সময় পিওন এসে ছোটোমামার হাতে একখানা চিঠি দিল। খামটা খুলে চিঠিটা পড়ে ছোটোমামা বলল—লোকটা খুব খারাপ নয় রে হুলো।

—কার কথা বলছ?

—কবীর দীক্ষিতের।

—কেন, কী লিখেছে?

—হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়েছে। আমার কাছে ক্ষমাও চেয়েছে। নিজের ভুলের জন্যে অনুশোচনাও করছে। আর কোনোদিন এ রকম মিথ্যে অভিনয় করবে না। আমি যেন তাড়াতাড়ি একবার দেখা করি। তা হলেই ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

—চলো তা হলে কলকাতায় যাওয়া যাক। কিন্তু কোন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, সেটা কি লিখেছে?

—ভবানীপুরের শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে।

কলকাতায় পৌঁছে ভিজিটিং আওয়ার্সে আমরা গেলাম সেই হাসপাতালে। সেই সময় কেউ কবীর দীক্ষিতের পাশে ছিল না। আমাদের দেখে ও উঠে বসল। ছোটোমামা জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে?

—কেটারিংয়ের অর্ডার পেয়েছি। বিরাট অর্ডার। এক হাজার লোক খাবে।

—তার সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তির কী সম্পর্ক?

—হাতে টাকা নেই। যদি কাজটা করতে না পারি তা হলে...

কথাটা শেষ হওয়া আগেই ছোটোমামা বলল—বিপদ। সেই জন্যে

এই কৌশল। তাই চিঠিতে মিথ্যে লিখে এখানে আমাকে আনিয়েছেন।

—মিথ্যে ঠিক নয় বাবলুবাবু। বাঁচার জন্যে আপনি যেমন গেরুয়া পরেছিলেন, আমিও তেমনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি।

—গেরুয়া বেশও তো আপনার জন্যেই ধারণ করতে হয়েছিল আমাকে। চিজ বটে আপনি একখানা! টাকাটা এখনও ফেরত দেননি। তারপর আবার...

ছোটোমামার কথার মাঝখানেই আমি বললাম—স্বভাব যায় না মলে। এই সব লোকের স্বভাব জীবনেও পালটায় না ছোটোমামা। চলো, যাওয়া যাক।

কবীর দীক্ষিত বলল—হুলোবাবু, আপনি আমাকে ঠিক বুঝতে পারলেন না।

কবীর দীক্ষিতের দিকে তাকিয়ে বললাম—আপনাকে আর বুঝে দরকার নেই। এবার আপনি অভিনয়-জগতে ঢুকে পড়ুন।

আমাদের দিকে তাকিয়ে কবীর দীক্ষিত চোখ মারল। আমরা দুজনে অবাক।

হ্যাটট্রিক

সাতসকালেই অনুশীলন সেরে সোজা বাড়ি চলে এল অভিরূপ। ড্রয়িংরুমে ঢুকে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে চমকে উঠল। আঘাত পেল। হতাশ হল। ভাবল, মানুষ আজ কোথায় নেমে গেছে।

খবরের কাগজের পুরো একটা পাতা জুড়ে মানুষের নৈতিক অধঃপতনের চাঞ্চল্যকর খবর। খুনি কিংবা চোর-ডাকাতের খবর নয়, খবরটা খেলার মাঠের। খেলার মাঠের কেলেঙ্কারির এমন সব খবর—যা ভাবাও যায় না।

আজ বঙ্গলক্ষ্মী কাপ ফাইনাল। ফাইনালে উঠেছে অর্জুনতলার তরুণ সমিতি আর মহারাজপুরের বিবেক সঙ্ঘ। দুটো টিমই ভাল। দু-দলেরই জেতার সম্ভাবনা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।

এই অঞ্চলে এই দুটি ক্লাব খুবই জনপ্রিয়। চির প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুটি টিমের লড়াই ঠিক যেন লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুনের লড়াইয়ের মতো। খেলার দিন অঞ্চল জুড়ে সাজো-সাজো রব, টানটান উত্তেজনা। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের যেমন প্রচুর ভক্ত-সমর্থক আছে, এই দুটি ক্লাবেরও তেমনই প্রচুর সমর্থক আছে এই অঞ্চলে। তাই খেলার সময় প্লেয়ারদের স্নায়ুযুদ্ধ তুঙ্গে ওঠে।

আজ ফাইনাল। আর আজই বের হয়েছে এই খবরটা।

অভিরূপ চিন্তিত। বিচলিতও বটে। কী করবে বুঝতে পারছে না। অনুশীলনে যাওয়ার আগে অভিরূপের চোখের সামনে ঢেউ খেলেছে স্বপ্নের পর স্বপ্ন, অনুশীলন করার সময়ও তাই। এখন কিন্তু খবরটা পড়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। তাই সে ভাবছে।

অভিরূপ ভাবছে খেলার ব্যাপারে এমন জটিল পরিস্থিতি জীবনে এর আগে কখনও আসেনি। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। এগোলে বিপদ,

পিছলেও বিপদ। ম্যাচ জিতলেও যা, হারলেও তাই। প্রাণ দিয়ে খেললেও স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না। যথাযোগ্য মর্যাদা আর কে দেবে! লোকে ভাববে 'গট-আপ'। অর্থাৎ, ম্যাচ গড়াপেটা। হারলে ভাববে টাকা খেয়েছে, জিতলে ভাববে প্রতিদ্বন্দ্বী টিমকে টাকা দিয়েছে। প্লেয়ারদের যোগ্যতা, মর্যাদা বলে আর কিছু থাকল না।

দর্শক-সমর্থকরা প্লেয়ারদের প্রেরণা-উৎসাহ জোগায়। কিন্তু আজকের এই খবর জানার পর তারা তো প্লেয়ারদের আর বিশ্বাসই করতে চাইবে না। খেলার ব্যাপারে তাদের আগ্রহও কমে যাবে। খেলাও হয়ে উঠবে গুরুত্বহীন। ছি, ছি। খেলার জগৎটা আজ কোথায় চলে গেল! খেলার মাঠ এখন আর প্লেয়ারদের নয়, জুয়াড়িদের। বহু কোচ-প্লেয়ার আজ বুকিদের সঙ্গে যুক্ত। বেটিং করে ম্যাচ গড়াপেটা চলছে। বুকিদের অদৃশ্য হাত খেলার মাঠে কলকাঠি নাড়াচ্ছে। যে-মাঠ অভিরূপের কাছে স্বর্গের সমান—সেই মাঠই এখন জুয়াড়িদের জন্যে হয়ে উঠছে নরক।

অভিরূপ আর ভাবতে পারছে না। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। ব্যথা-বেদনায় বুকটা টনটন করছে। তাই খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ছুটে চলে এল ক্লাবে। ক্লাবে তখন কোচ ছাড়া বলতে গেলে প্রায় সব প্লেয়ারই উপস্থিত।

সুন্দর ঝকঝকে চকচকে চেহারার অভিরূপের মুখে সব সময় মিষ্টি হাসি লেগেই থাকে। কিন্তু এখন সে গম্ভীর। ভীষণ গম্ভীর। এই গাম্ভীর্য দেখে ক্লাবের সবাই অবাক।

রতন জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে রে অভিরূপ? হঠাৎ তুই এত গম্ভীর হয়ে ক্লাবে ঢুকলি?

—গম্ভীর হওয়ার মতো কারণ নিশ্চয়ই হয়েছে। অভিরূপ বলল, তোরা কি আজকের কাগজ দেখেছিস?

গৌতম বলল—আজ ফাইনাল খেলা। আজ কি আর কাগজ-

টাগজ দেখার সময় আছে! এখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। কী করে বিবেক সঙ্ঘের স্ট্রাইকার রহিমকে আটকানো যায়, আমি শুধু তাই ভাবছি। কাগজ আর দেখলাম কখন। কেন, কাগজে কী আছে?

—কিছু আছে বলেই তো মনমেজাজ খারাপ।

সুনীত জিজ্ঞেস করল—আমাদের সম্বন্ধে কি কিছু বেরিয়েছে?

অভিরূপ বলল—আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের সম্বন্ধে কী আর বেরোবে! বেরিয়েছে রুই-কাতলাদের বিষয়ে। কিন্তু তাতে তো জড়িয়ে যাচ্ছি আমরাও।

—মানে?

—খেলার দুনিয়াটা শেষ হতে চলেছে। অভিরূপ বলল, টাকার লোভে মানুষ বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছে। খেলার মাঠ এখন জুয়ার মাঠ হয়ে উঠছে।

রতন বলল—ও সব ফালতু কথা ছাড়। জন্ম থেকেই এ রকম কথা শুনে আসছি। এ সবের কোনো মানে হয় না।

গৌতম বলল—টিম জিতলে সব ঠিক, হারলেই বেঠিক। তখনই ম্যাচ গড়াপেটার কথা ওঠে।

অভিরূপ বলল—আমিও এতদিন তাই জানতাম। কিন্তু তথ্য প্রমাণ দিয়ে যে খবর বেরিয়েছে সেটা কি মিথ্যে?

—দেখি, দেখি... বলে অভিরূপের হাত থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিল গৌতম। কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে বলে উঠল—সত্যিই তো! ক্যাসেটে বহু রথী-মহারথী ধরা পড়েছে। এ তো মিথ্যে নয়। আরও কত রহস্য আছে কে জানে!

—খবরটা পড়। অভিরূপ বলল, সবাই শুনুক।

জোরে জোরে পুরো খবরটা সকলের সামনে পড়ল গৌতম। সকলে অবাক। প্রত্যেকের মুখে একই কথা—এ রকম হলে সত্যিই খেলার আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

অভিরূপ বলল—তোরাই বল না, এর পর কি আর খেলায় মন থাকে?

ডিফেণ্ডার তনু অর্থাৎ তন্ময় বলল—সত্যিই তো, যত ভালো ডিফেন্স করি না কেন, হঠাৎ মিস করতেই পারি। আর করাটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো প্লেয়ার জন্মায়নি, যে কখনও কোনো ভুল করেনি। কিন্তু এখন তো দেখছি একটু এদিক-ওদিক হলেই বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে রব উঠবে টাকা খেয়েছে।

—রাইট। এক্কেবারে খাঁটি কথা। বলল গোলকিপার মলয়।

মিডফিল্ডার রতন বলল—খেলার বারোটা বেজে গেল। লোকে আর প্লেয়ারদের বিশ্বাস করবে না।

অভিরূপ বলল—আন্তরিকতার, ভালো খেলার কোনো মূল্যই রইল না। দর্শকরা তো ভাববে সবকিছু গট-আপ।

—ঠিকই বলেছিস। বলল স্ট্রাইকার গৌতম, দর্শকদের আনন্দ দেওয়াই খেলার উদ্দেশ্য। তারাই যদি বিশ্বাস না করে তা হলে তো সবকিছু মাঠে মারা যাবে।

অভিরূপ বলল—মনে আছে তোদের গতবারের বঙ্গলক্ষ্মী কাপের সেমিফাইনালের কথা?

মলয় বলল—মনে নেই আবার! তোর হ্যাটট্রিক। গৌতমের বল সাপ্লাই। সারা মাঠ জুড়ে জামালের খেলা। ৫-০ গোলে গোবিন্দপুর ইউনিয়নকে হারানো। সব এখনও ছবির মতন চোখে ভাসে।

তনু বলল—আমাদের সমর্থকদের থ্রি চিয়ার্স ফর তরুণ সমিতি—হিপ হিপ হুররে বলে সেকী চিৎকার!

রতন বলল—শুধু চিৎকার! পিলপিল করে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল হাজার হাজার সমর্থক। দর্শক-সমর্থকদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের জোয়ারে সেদিন ভেসে গিয়েছলাম আমরা।

অভিরূপ বলল—তার মানে আনন্দ দেওয়া আর আনন্দ পাওয়াই বড়ো কথা। অর্থাৎ, দর্শকদের আনন্দ দেব, নিজেরা আনন্দ পাব—সেটাই কিন্তু খেলার প্রকৃত ফল।

রতন বলল—ঠিক কথা।

অভিরূপ বলল—ম্যাচ গড়াপেটার এই সব কেলেঙ্কারির পর তা কি আর সম্ভব? পাঁচ গোল কেন, সাত গোল দিলেও লোকে ভাববে ম্যাচ গড়াপেটা করেছি। এর পরে কি আর উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে?

—নিশ্চয়ই থাকে... বলে ক্লাবে ঢুকলেন কোচ অরুণ বিশ্বাস।

অনেকেই প্রায় একসঙ্গে কোচকে জিজ্ঞেস করল—আজকের কাগজটা পড়েছ অরুণদা?

—পড়েছি বই কী! মনে রাখিস, পৃথিবীতে সব মানুষই খারাপ নয়। খারাপ যেমন আছে, ভালোও তেমনই আছে। সবাই জুয়াড়ি আর ঘুষখোর নয়।

অভিরূপ বলল—তোমার কথা ঠিক অরুণদা। তবে এই খবরের পর মানুষ তো দিশাহারা হয়ে যাবে। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে সেটাই তো বোঝা মুশকিল হয়ে পড়বে।

কোচ বললেন—সত্যি চিরদিনই সত্যি—মিথ্যে চিরকালই মিথ্যে।

—এটা তো একটা নীতিকথা। গৌতম বলল, বাস্তবে এর মূল্য আর কতটুকু!

—ষোলোআনা। কোচ বললেন, সব কোচ আর সব প্লেয়ারই তো ম্যাচ গড়াপেটার সঙ্গে যুক্ত নয়। অল্প কয়েকজনকে দিয়ে সকলের বিচার করা যায় না। তা ছাড়াও এটা একটা সাময়িক ব্যাপার। এ জিনিস চলতে পারে না। তোরা এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? মন দিয়ে খেল।

রতন বলল—আজ ফাইনাল খেলা। আর আজই খবরটা বেরোল!

কোচ বললেন—তাতে হয়েছেটা কী?

অভিরূপ বলল—এবার আমাদের মনের অবস্থাটা চিন্তা করো। প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে কি প্লেয়াররা ভালো খেলতে পারে?

—কেন পারে না? এতে চাপেরই বা কী আছে? নিজে ঠিক থাকলে জগৎ ঠিক। তোরা মন দিয়ে খেলবি। দেখবি ফল পাবি।

অভিরূপ বলল—তবুও...

—এর মধ্যে তবুও-টবুও কিছু নেই। উপদেশের সুরে কোচ বললেন, সকলে আজ তোর মুখ চেয়ে আছে অভিরূপ। গোল তোকে করতেই হবে।

সত্যিই অভিরূপ একমাত্র প্লেয়ার, যে দু-দলের ব্যবধান গড়ে দিতে পারে। দিয়েছেও কয়েকবার। এই তো মাস তিনেক আগের কথা। মহামায়া শিল্ড ফাইনালে কী খেলাটাই না খেলল! ছবির মতো। একাই চার-চারটে গোল করে টপ স্কোরার... টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়ার... ফাইনালে ম্যান অব দ্য ম্যাচ... বলতে গেলে প্রায় সব—সব পুরস্কারই পেয়েছিল অভিরূপ। তাকে নিয়ে দর্শক-সমর্থকদের সেকী উল্লাস! তারা তাকে ঘিরে ধরে ভালোবাসার স্পর্শে ভরিয়ে দিয়েছিল। অনেকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। আনন্দের জোয়ারে ভেসেছিল সে সেদিন। ভেসেছিল তরুণ সমিতির সমস্ত প্লেয়ার। গোটা অঞ্চলও।

চোদ্দ বছরের অভিরূপ অসাধারণ প্লেয়ার। পায়ে দারুণ সূক্ষ্ম কাজ। সে বল ধরলেই দর্শক-সমর্থকদের চিৎকারে মাঠ ফেটে যায়। অসাধারণ টাচ প্লে, অমায়িক ব্যবহার আর অনবদ্য গোল করার ও করানোর দক্ষতার জন্যে এই বয়সেই সে দারুণ জনপ্রিয়। কে জানে জনপ্রিয়তার দিক থেকে ভবিষ্যতে চুনী-বলরাম-বাইচুং-বিজয়নকে ছাড়িয়ে যাবে কি না! এই বয়সেই সে আই. এফ. এ.-র অনেক বড়ো বড়ো ক্লাবের নজরে পড়েছে। নজরে পড়েছে নামীদামি কোচেরও।

অভিরূপ স্বপ্ন দেখে। বড়ো হওয়ার স্বপ্ন। অনেক বড়ো হতে হবে। কিন্তু এখন তার মনের অবস্থা খুবই খারাপ। এই বেটিংয়ের যুগে তার

স্বপ্ন কি আর সফল হবে! খেলা আর খেলোয়াড়দের সেই সম্মান কি আর ফিরে আসবে! রাশি-রাশি ভাবনা ঢেউ তুলছে তার মনের মধ্যে। মাথা এখন একদম কাজ করছে না। কিছুই ভাবতে পারছে না সে।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল অভিরূপ—এমন সময় হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে অম্লান এসে হাজির।

—হাঁপাচ্ছিস কেন রে অম্লান? কী হয়েছে? জিজ্ঞেস করলেন কোচ।

—মারাত্মক খবর অরুণদা। অম্লান বলল, বিবেক সঙ্ঘ এবার বঙ্গলক্ষ্মী কাপ পাওয়ার জন্যে মরিয়া।

ধমক দিলেন কোচ অরুণ বিশ্বাস—মরিয়া তো আমরাও। তাতে মারাত্মক খবরের কী হল?

—কিছু হয়েছে বলেই তো বলছি।

কোচ বললেন—ভূমিকা ছেড়ে কাজের কথাটা আগে বল তো।

—বলছি, বলছি। জল খেতে খেতে অম্লান বলল, অভিরূপকে আজ ওরা কিছুতেই গোল করতে দেবে না। ওর পিছনে পুলিশ-মার্কিং ছাড়াও থাকবে ডবল-মার্কিং।

—থাকুক। এতক্ষণ ধরে কেন্নোর মতো কুঁকড়ে থাকা অভিরূপ হঠাৎই জ্বলে উঠল। বলল, ওই সব মার্কিং-টার্কিং আমি কেয়ার করি না। এতদিন কি আমাকে সব টিম ফাঁকায় গোল করার চান্স করে দিত? বোগাস।

অম্লান বলল—বোগাস নয় রে অভিরূপ। ওরা ছলে-বলে-কৌশলে তোকে আটকাবেই আটকাবে।

—দেখি না কেমন আটকায়।

আনন্দে আবেগে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন কোচ—এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। একেই তো বলে স্পোর্টসম্যান-স্পিরিট।

অম্লান বলল—সবই ঠিক আছে। কিন্তু...

কোচ অরুণ বিশ্বাস প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—এর মধ্যে কোনো কিন্তু-টিন্তু নেই।

অম্লান বলল—আছে অরুণদা, আছে। আজ খেলার রেফারি কে, জানো?

—না।

—ধর্মদাস বটব্যাল।

সঙ্গে সঙ্গে গৌতম বলে উঠল—ও তো অধর্মের গোঁসাই। আমাদের টিমকে সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে অভিরূপকে তো একদমই না।

রতন বলল—কেন, গতবারে বঙ্গলক্ষ্মী কাপ ফাইনালের কথা মনে নেই? অভিরূপের প্রথম গোলটা অফসাইডের অজুহাতে নাকচ করে দিল।

মলয় বলল—ধর্মদাস বটব্যাল একনম্বর ঘুষখোর।

অম্লান বলল—ও আজ মোটা টাকা ঘুষ খেয়েছে।

কোচ বললেন—ঘুষ তো গত বছরও খেয়েছিল। পেরেছিল কি আমাদের আটকাতে? বঙ্গলক্ষ্মী কাপ তো আমরাই ঘরে তুলেছিলাম।

সুনীত বলল—চেষ্টা তো করেছিল। অভিরূপের ন্যায্য একটা গোল অফসাইডের অজুহাতে বাতিল করেছিল। আমাদের বিরুদ্ধে জোর করে পেনাল্টি দিয়ে অভিরূপের দেওয়া গোল শোধ করিয়েছিল। হঠাৎ খেলা শেষ হওয়ার দশ সেকেন্ড আগে অভিরূপ গোলটা না করলে খেলা তো শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হত।

গৌতম বলল—টাইব্রেকার মানেই তো কপাল। কপালে যা থাকবে তাই হবে। ভালো খেলার কোনো মূল্যই থাকে না। দারুণ খেলেও টাইব্রেকারে হারতে হতে পারে। তাই টাইব্রেকারে খেলা গড়ানো মানেই যে কোনো পক্ষ জিততে পারে।

রতন বলল—খাঁটি কথা। পৃথিবীর বহু সেরা প্লেয়ারও টাইব্রেকারে

গোল করতে পারেনি। মারাদোনা, জিকো, প্লাতিনিদের মতন প্লেয়াররাও পেনাল্টি মিস করেছে।

কোচ বললেন—তাতে কী হল? তা নিয়ে অযথা আলোচনা করে লাভ কী?

গৌতম বলল—লাভ-লোকসানের কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে ঘুষখোর রেফারির জন্যে কী হতে পারত।

—হতে পারত অনেক কিছু। সে সব ভেবে লাভ কী! আমরা জিতেছিলাম। দর্শক-সমর্থকরা খেলা দেখে আনন্দ পেয়েছিল। এটাই তো সবচেয়ে বড়ো কথা। আজও সেই একই কথা তোদের বলছি। তোরা মনপ্রাণ দিয়ে খেলবি। সবাইকে আনন্দ দিবি। নিজেরাও আনন্দ পাবি। এর মূল্য তোরা পাবি। জয় তোদের হবেই হবে।

—কিন্তু অরুণদা... মনমরা হয়ে অভিরূপ বলল, খেলার মাঠে রেফারিই সব। তার সিদ্ধান্তই শেষ কথা। সে ক্ষেত্রে এক-আধবার হয়তো দারুণ খেলে জেতা যায়। কিন্তু বার বার তো তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া একটা প্লেয়ারের খেলার বারোটাও বাজিয়ে দিতে পারে রেফারি।

—জানি। সব জানি। আমি তোদের কোচ। তাই বলছি তোরা যদি মাঠে নিজেদের উজাড় করে দিস, তোদের হারায় কার সাধ্য। রেফারি আর বিবেক সঙ্ঘ তো দূরের কথা, সুপার ডিভিশনের অনেক টিমও হিমশিম খেয়ে যাবে।

রতন বলল—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক অরুণদা। আমরা জান লড়িয়ে খেলব আজ। কথা দিলাম।

অম্লান বলল—আজ আমরা মাঠে জান লড়িয়ে দেব ঠিকই। কিন্তু আমার চিন্তা অভিরূপের জন্যে।

—কেন? জিজ্ঞেস করলেন কোচ।

অম্লান বলল—শুনেছি মার্কিং-টার্কিং করে অভিরূপকে আটকাতে না পারলে ওদের ওই মারকুটে ভীম নাকি পা চালাবে। দরকার হলে

মেরে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেবে। অভিরূপের মতন প্লেয়ারের কিছু হয়ে যাওয়া মানে জাতীয় ক্ষতি।

—ঠিকই বলেছিস। কোচ বললেন, ও অনেকে বড়ো প্লেয়ার হবে। ওর জন্যে সবাইকে ভাবতে হবে। বিবেক সঙ্ঘের কি বিবেক বলে কিছু নেই?

রতন বলল—আসল ব্যাপারটা হচ্ছে রেফারি। ওই ঘুষখোর রেফারিকে তো বিশ্বাস নেই। ও সব পারে। না হলে ভীম-টীম কোনো ফ্যাক্টরই নয়। পা চালাতে আমরাও জানি। কিন্তু সেটা কি খেলা?

গৌতম বলল—রতন ঠিকই বলেছে। পা চালিয়ে ম্যাচ জেতা যায় না। তবে রেফারির উপর ম্যাচের ভাগ্য নির্ভর করে। কে জানে আজকের কাগজ দেখে বটব্যাল হয়তো মোটা টাকা খেয়ে বসে আছে বিবেক সঙ্ঘের কাছ থেকে।

মলয় বলল—এবার যদি গতবারের মতো রেফারিং হয়, আর আমরা হেরে যাই তা হলে বটব্যালের মুণ্ডুপাত করে ছাড়ব।

হঠাৎ আবার অম্লান বলে উঠল—একটা দারুণ খবর আছে।

অভিরূপ জিজ্ঞেস করল—কী খবর?

—মাঠে আজ ক্রীড়ামন্ত্রী আসছেন। উপস্থিত থাকবেন নামী-দামি কয়েকজন কোচও।

কথাটা শুনে কোচ অরুণ বিশ্বাস বললেন—আজ শুধু তোদের নয়, আমারও অগ্নিপরীক্ষা। আর কিছু বলতে চাই না। শুধু একটা কথাই বলছি, আমার মুখ রাখিস।

বেলা তিনটেয় খেলা শুরু। আড়াইটে নাগাদ তরুণ সমিতি এবং বিবেক সঙ্ঘ—দু-দলই মাঠে পৌঁছে গেছে। পৌঁছে গেছে দু-দলের প্রচুর সমর্থকও। দর্শক-সমর্থকদের মুখে নানা কথা, নানা গুঞ্জন। প্লেয়ারদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। দু-দলের মধ্যেই করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ভাব। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়!

তিনটে বাজতে মিনিট দশেক আগে পৌঁছলেন ক্রীড়ামন্ত্রী। ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন কয়েকজন নামী কোচ আর বিশিষ্ট কয়েকজন অতিথি। সকলে বসেছেন মাঠের ধারে ভি. আই. পি.-দের জন্যে সংরক্ষিত আসনে।

তিনটে বাজল। খেলা শুরু হল। প্রথমেই আক্রমণ শানাল বিবেক সঙ্ঘ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনবার ঢুকে পড়ল তরুণ সমিতির পেনাল্টি সীমানায়। গোলে শটও নিল। কিন্তু গোল হল না।

একটু পরেই আবার তরুণ সমিতি ঝাঁপিয়ে পড়ল বিবেক সঙ্ঘের উপর। এই ভাবে আক্রমণে-প্রতি আক্রমণে খেলা জমে উঠল। দর্শকরা রীতিমতো উপভোগ করছে খেলা। কিন্তু একী! যাকে কেন্দ্র করে বঙ্গলক্ষ্মী কাপ ফাইনালের উচ্ছ্বাস উত্তেজনা উন্মাদনা, সে যে একেবারে ফ্লপ। অভিরূপ তো খেলতেই পারছে না। একবার ভীমের সামনে পড়ে মুড়ির মতো মিইয়ে গেল। আরেকবার গৌতমের একটা সুন্দর ডিফেন্স-চেরা পাস ধরতেই পারল না। যাতে পা ছোঁয়ালেই গোল ছিল। আরও একবার গোলকিপারকে একা পেয়েও বল বাইরে মারল। অভিরূপের এই খেলা! অনেকেই অবাক। হতাশায় ডুবে গেল কেউ কেউ।

বিরতির বাঁশি বেজে উঠল। খেলার ফলাফল তরুণ সমিতি শূন্য—বিবেক সঙ্ঘ শূন্য। অর্থাৎ, দর্শকরা এখন পর্যন্ত কোনো গোল দেখতে পায়নি।

বিরতির বাঁশি বাজার সময় অভিরূপ ছিল রেফারি ধর্মদাস বটব্যালের কাছাকাছি। হঠাৎ রেফারি বললেন—তোর কাছে শুধু এই অঞ্চলই নয়, সারা দেশই অনেক কিছু আশা করে অভিরূপ। কিন্তু একী করছিস তুই! তুই যে আমাদের গর্ব।

অভিরূপ অবাক। সবাক যখন হল তখন দেখে আনন্দে রেফারির চোখ-মুখ চিকচিক করছে। বলল—ধর্মদাসদা, তুমি!

—হ্যাঁ, আমি। তুই আমার স্বপ্ন। তাই তোর খুঁত ধরে তোকে নিখুঁত করার চেষ্টা করছি। তুই যে একজন মস্ত বড়ো টাচ-প্লেয়ার হবি, তা আমি জানি। কিন্তু এর চেয়েও বেশি কিছু তোর কাছ থেকে আশা করি। আমি চাই তুই একজন শিল্পী হয় ওঠ, প্রকৃত ফুটবল-শিল্পী। তোর খেলায় যেন শিল্পের সৌন্দর্য থাকে।

—তুমি আশীর্বাদ করো আমি যেন তোমাদের আশা পূরণ করতে পারি।

ব্যস, আর কোনো কথা হল না। কারণ, দুজনেই প্রায় লোকজনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তখন।

পিঁ... পিঁ... পিঁ... শুরু হল দ্বিতীয়ার্ধের খেলা। দু-দলই দারুণ খেলছে। দর্শক-সমর্থকরা সত্যি খেলা দেখে আনন্দ পাচ্ছে। আনন্দ পাচ্ছে বিশিষ্ট অতিথিরাও। অভিরূপের খেলা সকলের নজর কাড়ছে। সে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে একাই একশো।

দেখতে দেখতে পাঁচ... দশ... পনেরো করে পঁচিশ মিনিট দ্বিতীয়ার্ধের খেলা হয়ে গেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অর্থাৎ, কোনো পক্ষই গোল করতে পারেনি। ফল সেই শূন্য-শূন্য। তবে চাপ বেশি তরুণ সমিতির। তাদের পায়েই বেশিরভাগ সময় বল। ইতিমধ্যে ভীম অভিরূপকে অন্যায়ভাবে বাধা দেওয়ার জন্যে রেফারি তাকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

হঠাৎই গোল..... গোল করে চিৎকার উঠল। হ্যাঁ, গোল। পঁয়ত্রিশ মিনিটের মাথায় খেলার গতির বিরুদ্ধে গোল করে এগিয়ে গেল বিবেক সঙ্ঘ। দেখতে দেখতে আরেক গোল। ২-০ গোলে এগিয়ে গেল বিবেক সঙ্ঘ। নেমে এল শোকের ছায়া তরুণ সমিতির সমর্থকদের মধ্যে। ভি. আই. পি. আসনের দর্শকদেরও কেমন যেন একটা মনমরা ভাব। কারণ, খেলছিল ভাল তরুণ সমিতি-ই। খুবই ভালো খেলছিল।

চল্লিশ মিনিটের মাথায় অভিরূপের পা থেকে গোলা ছুটে বিবেক সঙ্ঘের জালে জড়িয়ে গেল। তরুণ সমিতির সমর্থকদের গোল...গোল বলে সেকী চিৎকার! খেলার বাকি পাঁচ মিনিট তারা শুধু চিৎকার করার পর ঝাঁকে-ঝাঁকে নেমে এল সবাই মাঠের মধ্যে। কারণ, এরই মধ্যে আরও দুবার বিবেক সঙ্ঘের গোলে বল ঢুকিয়ে দিয়েছে অভিরূপ। অর্থাৎ, অভিরূপের হ্যাটট্রিক। বিবেক সঙ্ঘকে ৩-২ গোলে হারিয়ে তরুণ সমিতি বঙ্গলক্ষ্মী কাপ চ্যাম্পিয়ান হল। সব পুরস্কার তুলে নিল অভিরূপ। তার সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে ক্রীড়ামন্ত্রী বললেন—আজ মাঠে তুমি ফুল ছড়িয়েছ অভিরূপ। তোমার খেলা দেখে আমি মুগ্ধ। জাতীয় কোচ তাকে দেখা করতে বললেন। রেফারির প্রশংসায় অনেকেই পঞ্চমুখ। তরুণ সমিতির কোচ অরুণ বিশ্বাস অভিরূপকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। রেফারির চোখও আনন্দে ছলছল করে উঠল।

সেভেন-ইন-ওয়ান ক্লাবের আমরা সবাই খেলা দেখতে এসেছিলাম। ভোম্বলদা বলল—সামনের বছর আমরা বঙ্গলক্ষ্মী কাপে নাম এন্ট্রি করব। কী বুঝলি?

ভণ্ডুলদা বলল—বুঝলাম তরুণ সমিতির সঙ্গে আমাদের দারুণ একটা ফাইট হবে।

ভুলো বলল—তুমি যেন আবার সব ভণ্ডুল করে দিও না।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

কঞ্চিবাবু

লেটার-বক্সটা খুলে চিঠি বের করলেন কঞ্চিবাবু। একটিমাত্র চিঠি এসেছে—পোস্টকার্ডে নয়, খামে। খামটা খুলে চিঠিখানা পড়ে চমকে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে। একী! এ যে রক্ত হিম করা চিঠি। মুহূর্তে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায় তাঁর। শুরু হয় কাঁপুনি। সেকী কাঁপুনি! ম্যালেরিয়া জ্বর এলে লোকে যে ভাবে কাঁপে অনেকটা সেই ভাবে কাঁপতে থাকেন কঞ্চিবাবু। কাঁপুনির ঠেলায় হাত থেকে চিঠিটা পড়ে যায়। চিঠিখানা তুলে নিয়ে আবার পড়েন। না, কোথাও কোনো কুয়াশার জাল নেই। এই তো চোখের সামনে দিনের আলোর মতো জ্বল জ্বল করছে অক্ষরগুলো ঃ 'আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই। যদি বাঁচতে চান তো সুবোধ বালকের মতো টাকাটা দিয়ে দেবেন। চালাকি করতে গেলে বিপদে পড়বেন। আমরা আপনার সম্বন্ধে সব জানি। আপনার গতিবিধির উপর সব সময় আমাদের নজর আছে। টাকাটা কার হাতে কী ভাবে দিতে হবে সে সব ফোনে জানিয়ে দেব।

ইতি—

শ্রীকৃষ্ণ।'

শ্রীকৃষ্ণ! নামটা পড়ে আরও ঘাবড়ে যান কঞ্চিবাবু। কেন ঘাবড়ে গেলেন কে জানে! হয়তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথাও মনে পড়তে পারে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢোকেন তিনি। চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। মনে উদ্দাম ঝড়। কিছুই যেন আর ভাবতে পারছেন না। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে পা যেন আর মাটিতে নেই। মহাশূন্যতা এসে তাঁকে গ্রাস করছে। ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন। এই অবস্থার মধ্যেও তাঁর মনে হতে লাগল এ রকম

চিঠি কে লিখতে পারে। এ তো হিন্দি ফিল্মের মুক্তিপণ আদায়ের কায়দায় লেখা। ভয়-টয় দেখাচ্ছে না তো! নাকি সত্যি-সত্যিই টাকাটা গচ্ছা যাবে। এ রকম সাতপাঁচ চিন্তা যখন কঞ্চিবাবুর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ঠিক তখনই বেজে ওঠে টেলিফোনটা। সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস ধড়াস করে কেঁপে ওঠে কঞ্চিবাবুর বুকটা। শিথিল হাতে ভয়ে ভয়ে টেলিফোনটা তোলেন—হ্যালো...

অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে আসে অচেনা কণ্ঠস্বর—ভালো আছেন, কঞ্চিবাবু?

—আপনি কে বলছেন?

—নাম জেনে কী করবেন?

—আপনি আমাকে ফোন করছেন। কথা বলছি। নামটা জানব না?

—নামের কী দরকার? কাজটা হওয়া নিয়ে কথা।

এবার কঞ্চিবাবু বুঝলেন ফোনটা তাঁর জানাশোনা কোনো লোকের নয়। শ্রীকৃষ্ণ বা তার দলের কারও হবে। তাই আরও ঘাবড়ে গিয়ে সাবু-খাওয়া গলায় বললেন—কী কাজ বলুন স্যার?

—চিঠিখানা পড়েছেন?

কঞ্চিবাবু যা ভেবেছেন তাই। ওদেরই ফোন। এবার কঞ্চিবাবুর অবস্থা আরও সঙ্গিন। কোনোক্রমে গলা দিয়ে ক্ষীণ আওয়াজ বেরোয়—হ্যাঁ স্যার।

—টাকাটা কাছে রাখবেন।

—মানে... মানে...

—মানে নয়, মানি। কবে কখন কোথায় কার হাতে টাকাটা দিতে হবে তা ফোনে জানিয়ে দেব।

—কিন্তু...

—এর মধ্যে কোনো কিন্তু-টিন্তু নেই।

—আপনি কে স্যার?

—আগেই তো বলেছি নাম জানার দরকার নেই।

—আপনি কি স্যার শ্রীকৃষ্ণ?

—ধরুন তাই।

—স্যার, আমার মতন গরিব...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল—যা বলছি তাই করুন। ফোন ছেড়ে দিচ্ছি।

অনেকক্ষণ ধরে হ্যালো... হ্যালো করলেন কঞ্চিবাবু। কিন্তু ও-প্রান্ত থেকে কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

কে এই কঞ্চিবাবু? কেনই বা তাঁর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এই ভাবে চাওয়া হল?

কঞ্চিবাবু একজন ব্যবসায়ী। বড়োবাজারে ব্যবসা করেন। বড়োবাজারে কালোবাজারি করে অনেক পয়সা কামিয়েছেন তিনি। এবং এখনও কামিয়ে যাচ্ছেন। সুদেও মোটা টাকা খাটে তাঁর। তা ছাড়া আছে বহু টাকার কোম্পানির কাগজ। এ সব থেকেও মোটা টাকা আসে। এক কথায় কঞ্চিবাবু টাকার কুমির। জোয়ারের মতো হু-হু করে টাকা আসছে তাঁর কাছে। কিন্তু ভাটার টান একেবারে নেই। অর্থাৎ, টাকাটা বেরিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। কারণ, কঞ্চিবাবুর তিনকুলে কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু মনোরঞ্জন। সে শুধু কঞ্চিবাবুর মনোরঞ্জনই করে চলে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করাই তার কাজ। মানে কঞ্চিবাবুর বাড়ির যাবতীয় কাজ থেকে শুরু করে দোকানের দোকানদারিও তাকে করতে হয়। মনোরঞ্জনের পিছনে খরচ শুধু তার খাওয়া-দাওয়া, বছরে দুখানা ধুতি, দুটো হাফ-শার্ট, আর দুশো টাকা মাসে মাইনে। এতেই সে পড়ে আছে কঞ্চিবাবুর কাছে। কীসের টানে কে জানে!

একনম্বরের কিপটে কঞ্চিবাবুর নাম সকালে করলে নাকি সারা দিন উপোসের আশঙ্কায় থাকতে হয়। নামমাত্র আহার তাঁর। তা ছাড়াও

আছে নানা রকম উপোস-টুপোস পালনের ব্যাপার। পাঁজিতে যত রকমের উপোস আছে—সবই পালন করেন কঞ্চিবাবু। তাই বলতে গেলে এক রকম না খেয়ে-খেয়েই কঞ্চির মতো সরু লিকলিকে তাঁর চেহারা। মনে হয় সেই জন্যেই সবাই তাঁকে কঞ্চিবাবু বলে ডাকে। ফলে কঞ্চিবাবু এই নামটির আড়ালে তাঁর আসল নামটা চিরদিনের মতো চাপা পড়ে গেছে। পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও কঞ্চিবাবুর কিপটেমির শেষ নেই। আজকালকার দিনে অত সস্তার পোশাক কলকাতার কোনো গরিবেও পরে কিনা সন্দেহ। আর সেই পোশাক কিনতেও কঞ্চিবাবুর বুক ফেটে যায়। তা-ও আবার কেনেন ফুটপাথ থেকে। মোদ্দা কথা, খরচের নাম শুনলেই কঞ্চিবাবুর বুকটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে—রাতের ঘুম চলে যায়। এই ভাবেই তাঁর লাখ-লাখ টাকা জমে কোটির অঙ্কে পৌঁছে গেছে।

কঞ্চিবাবু ভুল করেও কোনোদিন কাউকে ফুটো কড়িও দান করেননি। দান-টান তাঁর কোষ্ঠিতে লেখা নেই। আশ্রমের সন্ন্যাসীর দল থেকে শুরু করে সমাজসেবী, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতা, গরিব ছাত্র-ছাত্রী—কে না এসেছে তাঁর কাছে! একটি পয়সাও কাউকে দেননি তিনি। উল্টে নানান উপদেশ-বাণী বর্ষণের সঙ্গে সাম্যবাদের নতুন ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন। বলেছেন কেউ খেটে রোজগার করবে আর কেউ তা ফোকটে ভোগ করবে—আজকাল এই সাম্যবাদের যুগে সেটা কি হওয়া উচিত? তাই যারা আশা নিয়ে এসেছে ফিরে গেছে আশাহত হয়ে। এমনকী পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের কাছেও নিজের আর্থিক অসুবিধের গীত গেয়েছেন কঞ্চিবাবু। ফিরে গেছে তারা শূন্য হাতে। পুজোর চাঁদাটা না দিলে নয়, তাই সামান্য কিছু দেন। এটাও মন থেকে দেন না, দেন ধর্মের ভয়ে।

এই হলেন কঞ্চিবাবু। আর এটাই তাঁর আসল পরিচয়।

এ হেন হাড়কিপটে মক্ষিচুষ কঞ্চিবাবু চিঠি আর ফোন পেয়ে সারা

রাত জেগে চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে টাকাটা বাঁচানো যায়। মনোরঞ্জনের সঙ্গে আলোচনা করেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। তাই মনের দুঃখে রাতে কিছুই মুখে দিলেন না তিনি। মাত্র কয়েক গ্লাস জল খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন কারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা বলে কথা। এতগুলো টাকা এই ভাবে চোট হয়ে গেলে তিনি তো হার্ট-ফেল করবেন। সুতরাং কার কাছে যাওয়া যায়—কী করা যায়—এ রকম নানান চিন্তা যখন তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ঠিক তখনই হঠাৎ পাড়ার একজনের নাম মনে পড়ে গেল কঞ্চিবাবুর।

পরের দিন সকাল হতে-না-হতেই তার কাছে গিয়ে হাজির হলেন তিনি। যার কাছে এলেন, সে আর কেউ নয়, পাড়ার বিখ্যাত ভোম্বল ঘোষ। মানে আমাদের ভোম্বলদা। কঞ্চিবাবুকে দেখে ভোম্বলদা অবাক।

ভোম্বলদাকে কঞ্চিবাবু সব খুলে বললেন। সবকিছু শুনে ভোম্বলদা গম্ভীর হল। কঞ্চিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—এ্যাদ্দিন তো আমাকে দেখেও দেখতে পেতেন না। আজ বিপদে পড়ে...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই কঞ্চিবাবু বললেন—বিপদ বলে বিপদ! পঞ্চাশ হাজার টাকা বলে কথা। টাকাটা বাঁচাও বাবা ভোম্বল।

—আপনার টাকা বাঁচিয়ে আমার লাভ? আজ পর্যন্ত তো একটা ফুটো পয়সাও দেননি আমাদের ক্লাবে।

—দেব, এবার দেব। তোমাদের ক্লাব-লাইব্রেরির বই কেনার জন্যে এবার মোটা ডোনেশন দেব।

—এখন তো দেবেনই। না দিয়ে উপায় কী! পঞ্চাশ হজার টাকা বলে কথা।

—টাকাটা তোমাকে বাঁচাতে হবে বাবা ভোম্বল। পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার চলে গেলে আমি যে মরে যাব।

—বলেন কী! এই সামান্য টাকার জন্যে আপনি মরে যাবেন?

—কী বলছ বাবা ভোম্বল! পঞ্চাশ হাজার টাকা। একে তুমি সামান্য বলছ?

—আপনার কাছে তো স্রেফ নস্যি কঞ্চিবাবু।

—কী যে বলো বাবা ভোম্বল! সারা জীবন খেটে আধ-পেটা খেয়ে হাজার পঞ্চাশেক টাকা কষ্টে-সৃষ্টে জমিয়েছি। এটাই আমার শেষ জীবনের সম্বল।

—বেশ বুঝতে পারছি আপনার টাকাও গেল, আপনিও গেলেন। বিরক্তি আর অবজ্ঞার ব্লেন্ড-করা আওয়াজ ঝরে পড়ে ভোম্বলদার কণ্ঠ থেকে।

—মানে?

—মানে আপনি শুধু কৃপণই নন, একনম্বরের মিথ্যেবাদী।

—কেন এমন কথা বলছ বাবা?

—কেন বলছি বুঝতে পারছেন না?

—না।

—না-বোঝাটাই স্বাভাবিক। কারণ, কৃপণরা কখনও সত্যি কথা বলে না।

—এটা তোমার রাগের কথা বাবা ভোম্বল!

—রাগ হওয়াটা তো স্বাভাবিক। খরচের বালাই নেই! কাউকে কানাকড়ি দেন না। সারা জীবন শুধু জমিয়েই যাচ্ছেন। লাখ-লাখ টাকা জমিয়ে বলছেন মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা জমিয়েছেন। ডুবে ডুবে জল খেয়ে ভাবেন শিবের বাবাও টের পায় না। তাই না?

—কথাটা ঠিক না বাবা ভোম্বল। লোকে তো অনেক কিছুই বলে। তিলকে তাল করাই মানুষের স্বভাব।

—আর তালকে তিল করাও তো আপনার স্বভাব।

—আহা, চটে যাচ্ছ কেন?

—চটব না! টাকার পাহাড়ের উপর বসে থেকে বলছেন মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকাই আপনার আছে। মিথ্যে কথা এখনও বলে চলেছেন।

—পঞ্চাশ থেকে হয়তো কিছু বেশি আছে।

—হয়তো কিছু বেশি মানেটা কী? লাখ-লাখ টাকার মালিক হয়ে বলছেন পঞ্চাশ হাজারের থেকে হয়তো কিছু বেশি।

—ভুল হয়ে গেছে বাবা। তুমি রাগ কোরো না। তা হলে আমি ডুবে যাব।

—ডুবুন-ভাসুন আমার দেখার দরকার নেই। গোয়েন্দার কাছে মিথ্যে কথা বলার ফল আপনি টের পাবেন। বিপদ আপনার অনিবার্য।

দারুণ ভয় পেয়ে কঞ্চিবাবু বললেন—কথা দিলাম, আর কখনও মিথ্যে কথা বলব না। তোমাদের ক্লাবেও পাঁচ হাজার টাকা ডোনেশন দেব।

—আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা বাঁচবে। আর আপনি দেবেন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা! আপনি চলে যান। আপনার কাজ করব না।

—ঠিক আছে বাবা। রাগ কোরো না। ছ-হাজারই দেব।

—মানে? ভোম্বলদা হনুমানের মতো মুখ খিঁচিয়ে বলল, এটা কি চিংড়ি মাছের দোকান নাকি? এই ভাবে দর কষাকষি করছেন?

—ঠিক আছে বাবা। আমি আর কিছু বলব না। তুমিই বল।

—পনেরো হাজার টাকা দেবেন।

—পনেরো হাজার! আঁৎকে ওঠেন কঞ্চিবাবু।

—হ্যাঁ, পনেরো হাজার।

—বড্ড বেশি হয়ে গেল না বাবা!

—আবার কথা।

—ঠিক আছে—ঠিক আছে। তাই দেব। তুমি আর রাগারাগি কোরো না।

—ভেরি গুড। এই তো চাই। আমিও কথা দিলাম, ব্যাপারটা আমি খুবই সিরিয়াসলি দেখব। চিন্তা করবেন না।

খুশিতে ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরলেন কঞ্চিবাবু।

ভরদুপুরে ভোম্বলদা আমার বাড়িতে এল। কঞ্চিবাবুর ব্যাপার নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে কিছুটা আলোর সন্ধান পেলাম।

ঘুরতে ঘুরতে বেলা পড়ে গেছে। সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। রাস্তার আলো সব জ্বলে উঠেছে। হঠাৎ ভোম্বলদা বলল—বুঝলি হুলো, কঞ্চিবাবুর বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার।

আমি বললাম—যাও।

—তুইও চল না আমার সঙ্গে।

—চলো।

দুজনে পা বাড়ালাম কঞ্চিবাবুর বাড়ির দিকে। যেতে যেতে বললাম—বুঝলে ভোম্বলদা, কঞ্চিবাবু একখানা চিজ।

—চিজ বলে চিজ। আমাকে দেখলেই পাশ কাটিয়ে যেত। আর এখন বাবা ভোম্বল বাঁচাও।

—এবার কিন্তু ছাড়াছাড়ি নেই। লাইব্রেরির জন্যে মোটা ডোনেশন চাই। হাতে-পায়ে ধরলেও পনেরো হাজার টাকার এক পয়সাও কম নেবে না। আদায় করেই ছাড়বে।

—জরুর। এবার তো ভোম্বল ছাড়া গতি নেই। দ্যাখ না রগড়টা।

এই ভাবে কথা বলতে বলতে আমরা কঞ্চিবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছে গেলাম। কঞ্চিবাবুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে ভোম্বলদা আর আমি—দুজনেই অবাক। একী কাণ্ড! ভয়ে ভয়ে কলিং বেল টিপলাম।

—কে?... কে?... বলে বাড়ির ভিতর থেকে সাড়া দিলেন কঞ্চিবাবু।

ভোম্বলদার গলার আওয়াজ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেট খুললেন। কঞ্চিবাবুর চোখে-মুখে তখনও ভয়-ভয় ভাব। আমরা ভিতরে ঢুকে অবাক।

—কী ব্যাপার কঞ্চিবাবু? জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

—একটু আগেই তাদের ফোন এসেছিল।

—কী বলল।

—কালই টাকাটা দিতে হবে।

আমি বললাম—সেই ভয়েই বুঝি আপনি গোটা বাড়ি অন্ধকার করে রেখেছেন?

—কী করি বলো তো বাবা হুলো! দিনকাল যা পড়েছে তাতে কখন কী হয় বলা যায়। কথায় কথায় হুমকি ছাড়ছে।

—রাখুন তো হুমকি। ভোম্বলদা যখন দায়িত্ব নিয়েছে তখন আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকুন।

—ভোম্বলের ভরসাতেই তো আছি।

ভোম্বলদা আমার মুখের দিকে তাকাল। আমিও মুখে মুচকি হাসি এনে ভোম্বলদার দিকে আড়চোখে তাকালাম। মনে মনে বললাম পথে এসো বাছাধন।

ভোম্বলদা বলল—গোটা বাড়ির আলো জ্বালিয়ে দিন।

মনোরঞ্জন পাশেই ছিল। কঞ্চিবাবু তাকে সব আলো জ্বালাতে বললেন। মনোরঞ্জন আলো জ্বালিয়ে আমাদের কাছে এল।

ভোম্বলদা আবার বলল—এখন থেকে জানলা-টানলা খুলে শোবেন। তাতে শরীর ভাল থাকবে। ঘুমও ভাল হবে। ঘরে হাওয়া-বাতাস না খেললে কি শরীর ভালো থাকে?

—ঠিকই বলেছ বাবা ভোম্বল। আমার তো একদম ঘুম হয় না।

—হবে কী করে! ভোম্বলদা বলল, আপনি তো একনম্বরের কিপটে। পেট ভরে খান না। ঠিক মতন না খেলে কি ঘুম হয়? এখন

থেকে ভালোমন্দ খাবেন। পেট ভরে খাবেন। দেখবেন গায়ের জোর আর মনের জোর—দুই-ই বেড়ে যাবে।

—তাই হবে বাবা, তাই হবে। তুমি শুধু এ-যাত্রাটা বাঁচাও।

মনোরঞ্জন একটু হাসল। ভোম্বলদা বলল—বাঁচানোর জন্যেই তো এসেছি। তবে আমার কথার বাইরে চললে কিন্তু বাঁচতে পারবেন না।

—মাথা খারাপ! বললেন কঞ্চিবাবু, পঞ্চাশ হাজার টাকা বলে কথা।

—আবার টাকার কথা! ভোম্বলদা ধমক মারল।

—ঠিক আছে বাবা ভোম্বল। তোমার কথামতোই চলব।

সত্যি-সত্যিই সেদিন রাত্রে মাছ-ডাল-তরকারি দিয়ে পেট পুরে ভাত খেলেন কঞ্চিবাবু। খাওয়ার পর একটা আইসক্রিমও খেলেন। খেয়ে দারুণ তৃপ্তি পেলেন। মনোরঞ্জনকেও খাওয়ালেন। খরচের মধ্যেও যে একটা আনন্দ আছে জীবনে এই প্রথম সেটা অনুভব করলেন কঞ্চিবাবু।

এদিকে ভোম্বলদা আর আমি কঞ্চিবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আদাজল খেয়ে কেসটার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে লাগলাম। ক্লুটা যখন আমাদের কাছে ধরা পড়ল তখন আমরা দুজনেই অবাক।

সত্যিই অবাক হওয়ার মতো কাণ্ড। সে কথায় পরে আসছি।

তার আগে বরং কঞ্চিবাবুর বাড়ি যাওয়া যাক। পরের দিন সাতসকালেই ভোম্বলদা আর আমি কঞ্চিবাবুর বাড়িতে এলাম।

হাসি-হাসি মুখে ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—রাত্রে ভরপেট খেয়েছিলেন তো কঞ্চিবাবু?

সাবু-খাওয়া গলায় কঞ্চিবাবু জবাব দিলেন—হ্যাঁ।

—ঘুম-টুম ঠিকমতন হয়েছিল? ভোম্বলদার আবার প্রশ্ন।

—ঘুম তো ভালোই হয়েছে। কিন্তু...

—তা হলে আবার কিন্তু কেন?

এবার কাঁদো-কাঁদো মুখে কঞ্চিবাবু বললেন—আবার ফোন এসেছিল।

ভোম্বলদা বলল—হুমকি দিয়েছে বুঝি?

—হুমকি ঠিক নয়। তবে হুমকির মতন।

আমি বললাম—সে আবার কী কথা!

—তাই তো ভাবছি। কঞ্চিবাবু বললেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

ভোম্বলদা বলল—ব্যাপারটা খুলে বলুন তো।

—হ্যাঁ, খুলেই বলছি। ফোনে সেই শ্রীকৃষ্ণটা বলল এখানে কাছাকাছি কোনো একটা বাড়িতে আজই আমাকে নিয়ে যাবে। সময়মতো লোক পাঠাবে। আমার জন্যে নাকি নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়ে আসবে। আর ওই পোশাক পরেই আমাকে যেতে হবে। ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে বাবা ভোম্বল।

—এর মধ্যে আপনি গোলমালের গন্ধ পেলেন কোথায়? নতুন পোশাক পরিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে—এ তো দারুণ সংবাদ।

—কীসের দারুণ সংবাদ? সঙ্গে যে পঞ্চাশ হাজার টাকাও নিয়ে যেতে বলেছে।

—ধুত্তোর আপনার টাকা। টাকা-টাকা করেই গেলেন আপনি। টাকা কি আপনার সঙ্গে যাবে? এ সব ব্যাপারে কত রকম বিপদের সম্ভাবনা থাকে—সে কথা কি জানেন?

ভোম্বলদার কথায় সায় দিয়ে বললাম—অনেক সময় প্রাণনাশের আশঙ্কাও থাকে। হামেশাই নিউজ পেপারে এ ধরনের মার্ডারের সংবাদ বেরোচ্ছে।

মনোরঞ্জনও বলল—ভোম্বলবাবু আর হুলোবাবু ঠিক কথাই বলেছেন।

মনোরঞ্জনের কথা শুনে চমকে উঠলেন কঞ্চিবাবু—বলিস কী রে!

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম—টাকা জমানো ছাড়া তো আপনি আর কিছুই জানেন না।

ভোম্বলদাও বলে উঠল—আপনি তো দুনিয়ার কোনো সংবাদই রাখেন না।

কঞ্চিবাবু আমতা-আমতা করে বললেন—তা হলে কি শ্রীকৃষ্ণের লোকের সাথে আমাকে যেতে বলছ?

—নিশ্চয়ই। ভোম্বলদা বলল, কোনো চিন্তা করবেন না আপনি।

—পঞ্চাশ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে যাব বাবা?

এবার ভোম্বলদা রীতিমতো ধমকে উঠল—আপনি থাকুন আপনার টাকা নিয়ে। চললাম আমরা। চল হুলো।

—আহা, করো কী—করো কী। কঞ্চিবাবু বললেন, আমি তো তোমার উপরই নির্ভর করে আছি বাবা ভোম্বল। তা ছাড়া হুলোবাবাও আছে। তোমরা আশ্বাস দিলেই আমি যেতে পারি।

—আশ্বাস তো আপনাকে দিলামই। ভোম্বলদা বলল, কিন্তু আপনি তো সব সময়ই পঞ্চাশ হাজার টাকা... পঞ্চাশ হাজার টাকা বলে মাথা খারাপ করে দিচ্ছেন।

—ঠিক আছে বাবা। আর বলব না। কিন্তু তোমরা না থাকলে...

আমরা থাকব না আপনাকে কে বলল? ভোম্বলদা বলল, আমরা ঠিক সময়মতো পৌঁছে যাব।

—কী করে পৌঁছবে? ওরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা তোমরা জানবে কী করে?

ভোম্বলদা বলল—তা হলে আর গোয়েন্দাগিরি করছি কেন?

—তোমরা কি বাড়িটা চেনো?

—এখনও সঠিক চিনি না। তবে ক্লু যখন পেয়েছি তখন চিনতে কতক্ষণ!

—ক্লু পেয়েছ?

—হ্যাঁ। না হলে আপনাকে যেতে বলব কেন?

—বাঁচালে বাবা ভোম্বল, বাঁচালে। যাক, পঞ্চাশ হাজার টাকা বেঁচে গেল। বলে আনন্দে নেচে উঠলেন কঞ্চিবাবু।

—পঞ্চাশ হাজার বাঁচল কী করে?

—কেন?

—পনেরো হাজার টাকা ডোনেশন কে দেবে?

—তবুও তো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বাঁচল।

—আবার টাকা! টাকা-টাকা করেই আপনি গেলেন। একটু আগেই বললেন যে আর টাকার কথা বলবেন না। অথচ আবার টাকা-টাকাই করছেন। রেগে সিংহনাদ করল ভোম্বলদা।

—ভুল হয়ে গেছে বাবা। আর বলব না।

—মনে থাকে যেন। ভোম্বলদা বলল, এখন থেকে ভালোমন্দ খাওয়ার কথাও মনে রাখবেন। খরচের দিকে তাকাবেন না। কী বুঝলেন?

—ঠিক বুঝেছি বাবা। আর বলতে হবে না।

—তা হলে আমরা চলি... বলে কঞ্চিবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে।

রাস্তায় বেরিয়ে ভোম্বলদাকে বললাম—এবার দুই কিপটের লড়াইয়ে দেখি কে জেতে। ভোম্বলদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

আমরা বেরিয়ে আসার একটু পরেই কঞ্চিবাবুর কাছে শ্রীকৃষ্ণর টেলিফোন এল। কঞ্চিবাবু 'হ্যালো' বলতেই ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল—আমি শ্রীকৃষ্ণ বলছি। ঠিক বারোটার সময় আপনার কাছে লোক যাবে। তৈরি হয়ে থাকবেন। টাকাটা আনতে ভুলবেন না যেন।

টেলিফোন ছেড়ে দিল শ্রীকৃষ্ণ। কঞ্চিবাবু রিসিভারটা নামিয়ে রেখে মনে মনে বললেন—টাকা...ব্ল্যাকমেল... টের পাবে মজাটা।

চান-টান সেরে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন কঞ্চিবাবু।

মনোরঞ্জনও কঞ্চিবাবুর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। সে-ও পায়চারি করছে।

ভোম্বলদা যতই ভরসা দিক, আসলে কঞ্চিবাবু তো একনম্বরের ভীতু। অবশ্য টাকাঅলা লোকমাত্রেই ভীতু। তার উপর আবার কৃপণ হলে তো কথাই নেই।

তাই ভয়-ভয় মনে পায়চারি করতে করতে ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন কঞ্চিবাবু। পুরনো দেওয়াল ঘড়িটা টিক টিক করে যত এগোচ্ছে তাঁর বুকের ভেতরে ঢিপ ঢিপ করে হৃদ্‌কম্প তত বাড়ছে। বারোটা বাজল বলে। ঢং... ঢং শব্দে বারোটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেলটাও চিৎকার করে উঠল। চমকে উঠলেন কঞ্চিবাবু। মনোরঞ্জনকে গেট খুলতে বলে তিনি তার পিছন-পিছন গেলেন।

মনোরঞ্জন গেট খুলতেই কঞ্চিবাবু অবাক। আগন্তুক তো পাড়ার দশ-বারো বছরের ছেলে অনিরুদ্ধ। কিন্তু এই সময় তো শ্রীকৃষ্ণের লোকের আসার কথা। তার জায়গায় অনিরুদ্ধ। কী ব্যাপার!

তাই অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—অনিরুদ্ধ তুই! হঠাৎ তুই এই সময় আমার বাড়িতে! ব্যাপার কী?

—বা রে, আমারই তো এখন তোমার কাছে আসার কথা।

—মানে?

—কেন, তুমি কোনো ফোন পাওনি?

—কার ফোন?

—শ্রীকৃষ্ণের ফোন।

কঞ্চিবাবু অবাক হয়ে বললেন—তার সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক?

—শ্রীকৃষ্ণই তো আমাকে পাঠিয়েছে।

—বলিস কী রে! তুই তাকে চিনিস?

—হ্যাঁ... চিনি।

—তুই বুঝি তাদের দলে নাম লিখিয়েছিস?

—তা বলতে পারো।

—কে তোর শ্রীকৃষ্ণ বল তো?

—তাকে তুমিও চেনো কঞ্চিদাদু।

—আমি চিনি?

—হ্যাঁ। চলো না আমার সাথে। গেলেই দেখতে পাবে।

—তোরা বুঝি আজকাল এই সব করে বেড়াচ্ছিস? কঞ্চিবাবুর কণ্ঠে বিরক্তির সুর।

—হ্যাঁ, কঞ্চিদাদু। হাসি-হাসি মুখ করে অনিরুদ্ধ বলল, তুমিও আমাদের দলে নাম লেখাও না!

অনিরুদ্ধর কথা শুনে কঞ্চিবাবু খেপে উঠলেন। ধমকের সুরে বললেন—চুপ কর। তোকে আর জ্ঞান দিতে হবে না।

—আহা, চটছো কেন? দ্যাখো না তোমার জন্যে কেমন সুন্দর ধুতি-পাঞ্জাবি এনেছি। এই নাও। পরে চলো তো আমার সাথে।

—কোথায় যাব?

—চলো না আগে। গেলেই সবকিছু দেখতে পাবে।

কঞ্চিবাবু কটমট করে অনিরুদ্ধর দিকে তাকালেন। মনে মনে বললেন চালাকি করার জায়গা পাওনি। আমাকে বুঝি বলির পাঁঠা ভেবেছ। টের পাবে কত ধানে কত চাল। তাই আগুন হতে গিয়ে ভোম্বলদার নির্দেশের কথা মনে পড়তেই জল হয়ে গেলেন। মুখে স্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে বললেন—তুই একটু বোস। ধুতি-পাঞ্জাবিটা পরে আসি।

মিনিট দশেকের মধ্যেই অনিরুদ্ধর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন কঞ্চিবাবু। সঙ্গে তাঁর অকৃত্রিম অনুচর মনোরঞ্জন। তিনজনে মিলে একটা বিয়ে বাড়িতে এলেন। পাড়ার মধ্যে বিয়ে বাড়ি। তাই হেঁটেই এলেন। বলতে গেলে সবাই ওখানে জানাশোনা। অনেকে কঞ্চিবাবুকে দেখে অবাক। জীবনে হয়তো এই প্রথম পাড়ার একটা বিয়ে বাড়িতে এলেন কঞ্চিবাবু। বিয়ে বাড়িতে তাঁর আদর-আপ্যায়ন

দেখে নিজেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন তিনি।

নতুন দামী ধুতি-পাঞ্জাবিতে কঞ্চিবাবুকে বেশ দেখাচ্ছে। চেয়ারে বসতে-না-বসতেই তাঁর ফোটো তোলা হল। এত খাতিরের কারণ বুঝতে পারলেও কঞ্চিবাবুর বেশ ভালোই লাগছিল। এতদিনের তাঁর পরিচিত জগতের বাইরে তিনি যেন একটা নতুন জগৎ দেখতে পেলেন। আড়চোখে একবার অনিরুদ্ধর দিকে তাকালেন। অনিরুদ্ধর মুখে মুচকি হাসি। মুচকি হাসি মনোরঞ্জনের মুখেও।

একটু পরেই মধ্যাহ্নভোজনের ডাক পড়ল। খেতে বসলেন কঞ্চিবাবু। তাঁর একপাশে অনিরুদ্ধ আরেক পাশে মনোরঞ্জন। বহু পদ রান্না হয়েছে। এত পদের এত ভাল খাবার এর আগে কখনও খাননি কঞ্চিবাবু। তৃপ্তি করে পেট ভরে খেলেন সব। খেতে খেতে বার বার তাঁর মনে হতে লাগল এমন সব সুস্বাদু খাবার থেকে তিনি এতদিন বঞ্চিত ছিলেন। হঠাৎ ফিসফিস করে অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় রে তোর শ্রীকৃষ্ণ?

অনিরুদ্ধ বলল—সময়মতো দেখতে পাবে।

বেলা তখন চারটে। কঞ্চিবাবু বিয়ে বাড়িতে বসে মেজাজে চা খাচ্ছেন, আর মনে মনে ভাবছেন এমন অদ্ভুত কাণ্ডের কথা বাপের জন্মেও শোনেননি! একদিকে টাকার হুমকি, আরেকদিকে এত খাতির—এই দুয়ের মধ্যে কোনো মিল তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। অবশ্য ইতিমধ্যেই তাঁর মনের পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা একটু-একটু করে পালটাচ্ছে। মনে মনে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কে এই শ্রীকৃষ্ণ? কে থায় সে?

—এই যে আপনার শ্রীকৃষ্ণ বলে দশ-বারো বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে কঞ্চিবাবুর সামনে হাজির হল ভোম্বলদা। সঙ্গে ছিলাম আমিও।

ভোম্বলদার দিকে চেয়ে কঞ্চিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কোথায়

শ্রীকৃষ্ণ?

—এই তো আপনার সামনে।

অবাক হয়ে কঞ্চিবাবু বললেন—এ তো আমাদের অনির্বাণ।

ভোম্বলদাও মুখে কপট গাম্ভীর্য এনে বলল—এই আপনার শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মনামে অনির্বাণ আপনাকে চিঠি লিখেছে। গলার স্বর পালটে অনির্বাণই আপনাকে ফোন করত। আসলে কল্যাণীর বিয়ের টাকার জন্যেই ও এত সব কাণ্ড করেছে।

কয়েক ঘণ্টা আগে হলে হয়তো কঞ্চিবাবু আনন্দে নেচে উঠতেন। এখন কিন্তু তিনি অবাক হয়ে অনির্বাণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন এক অসহায় গরিব বিধবার মেয়ের বিয়ের জন্যে কী কাণ্ডটাই না করল এই বাচ্চা ছেলেটি। আর আমি...

হঠাৎ ভোম্বলদা বলে উঠল—এই নিন আপনার আসামী।

—কী বলছ তুমি ভোম্বল! অনির্বাণ আসামী? ও তো সত্যি-সত্যি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ।

কঞ্চিবাবুর কথা শুনে সত্যি-সত্যি আমরাও অবাক। এ কঞ্চিবাবু তো সে কঞ্চিবাবু নয়। এ তো আগের কঞ্চিবাবুর ভিন্ন সত্তা।

তাই কঞ্চিবাবুর মুখের দিকে চেয়ে আমি বললাম—তা হলে এখন কী করবেন?

কঞ্চিবাবু যেন আমার কথা শুনতেই পেলেন না। একদৃষ্টে অনির্বাণের দিকে চেয়ে আছেন। হঠাৎ ছলছল চোখে বলে উঠলেন—তুই এত সব কাণ্ড করেছিস অনির্বাণ!

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে অনির্বাণ। মুখে কথা নেই।

—মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়, আমার কাছে আয়।

কঞ্চিবাবুর কাছে এগিয়ে গেল অনির্বাণ। আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে অনিরুদ্ধকেও কাছে ডাকলেন তিনি। অনিরুদ্ধ কাছে আসতেই তাকেও জড়িয়ে ধরলেন। সবাই অবাক।

সবার সামনে ভোম্বলদা বলল—এবার আমার দায়িত্ব শেষ কঞ্চিবাবু।

—শেষ কোথায়, এই তো সবে শুরু। কঞ্চিবাবু হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, তা বাবা ভোম্বল, আসল কথাটা বলো তো এবার, 'হিরো'কে পাকড়াও করলে কী করে?

—তা হলে শুনুন। ভোম্বলদা শুরু করল, মাসিমা মানে কল্যাণীর মা কল্যাণীর বিয়ের ব্যাপারে আমাদের কাছে এসেছিলেন। বিয়ের জন্যে পঁচাত্তর হাজার টাকা দরকার। অথচ মাসিমার কাছে আছে মাত্র পনেরো হাজার টাকা। এদিক-ওদিক থেকে দিন পনেরো আগে আমরা যোগাড় করে দিই হাজার দশেক। কিন্তু তখনও বাকি পঞ্চাশ হাজার। এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে এত টাকা যোগাড় হবে! চিন্তায় মাসিমার চোখে ঘুম নেই। কল্যাণীও মনমরা।

এই দুই রত্ন মানে অনির্বাণ আর অনিরুদ্ধ প্রায়ই মাসিমাদের বাড়িতে আসে। মাসিমা দুজনকেই দারুণ স্নেহ করেন। এরা দুজনেও মাসিমাকে ভীষণ ভালোবাসে। কল্যাণীকেও। তাই মাসিমা আর কল্যাণীর মনের অবস্থা বুঝে এই দুই মূর্তিমান পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগাড় করে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। এই ঘটনাটা আমি অবশ্য জেনেছি আপনার কেসটা হাতে আসার পরে।

—কী রকম?

ভোম্বলদা বলল—কাল সকালে আপনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরেই আমি মাসিমাদের বাড়িতে যাই। সেখানে জানতে পারি পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগাড় হয়ে যাবে বলে মাসিমা আশা করছেন। সেই ভাবেই বিয়ের কাজকর্ম চলছে। বহু জিনিসপত্তর বাকিতে এসেছে। আজ কিছু-কিছু পেমেন্ট করতে হবে।

কঞ্চিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তা তুমি আমার কেসটা হাতে পাওয়ার পর আগেই মাসিমার বাড়িতে গেলে কেন?

—কারণ, আপনার কাছে যে চিঠিখানা এসেছে তাতে তিন দিনের

মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে বলে উল্লেখ আছে। আর সেই তারিখ থেকে তিন দিনের দিনই কল্যাণীর বিয়ে। আর দরকারও ঠিক পঞ্চাশ হাজার টাকা। আপনার অগাধ টাকা থাকলেও আপনি তো কাউকে ফুটো কড়িও দেন না। দান-টানের কথা শুনলেই খেপে ওঠেন। তাই হিসেবটা মিলে গেল দেখে মাসিমার বাড়িতেই আগে গেলাম। মাসিমার কথায় ক্লুটাও পেয়ে যাই। তারপর হুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসি। অবশ্য তখন আমি মাসিমাকে টাকাটা কোথা থেকে কী ভাবে পাচ্ছেন এ সব কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি। হাজার হলেও টাকা-পয়সার ব্যাপার বলে কথা। কার কখন সম্মানে লাগে বলা যায়! পরে হুলোর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করি মাসিমার কাছ থেকেই টাকার ব্যাপারটা জানতে হবে। তাই হুলো আর আমি গতকাল রাত্তিরবেলায় আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাসিমার বাড়িতে যাই। মাসিমার মুখ থেকেই অনির্বাণ আর অনিরুদ্ধর কথা শুনি। ব্যাপারটা মাসিমার গোপন রাখারই কথা। কিন্তু আমাদের দুজনের প্রচণ্ড পীড়াপীড়িতে কেবল ওদের দুজনের নামই বলেছেন। তাতেই আমরা ব্যাপারটা ধরে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে ওদের কাছে ছুটে যাই। রাত্তিরবেলায় ওদের দেখা পাইনি। দেখা পাই আজ সকাল দশটা নাগাদ। তারপর দুই মূর্তিমানের মুখ থেকে সব শুনে অবাক। হ্যাঁ, ভালো কথা—শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মনামে অনির্বাণই আপনাকে চিঠি লিখেছে আর ওই নামেই ও আপনাকে ফোন করত—কথাটা আপনাকে একটু আগেই বলেছি। তাই বলছি শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এখন ধর্মযুদ্ধে নেমে পড়ুন।

—প্রাণের কথাটাই বলেছ বাবা ভোম্বল। কঞ্চিবাবু বললেন, আমিও তাই ভাবছি। আজ থেকে আমি তোদের দলে নাম লেখালাম রে শ্রীকৃষ্ণ। এবার তো খুশি হয়েছিস অনিরুদ্ধ?

ওরা দুজনেই ফ্যালফ্যাল করে কঞ্চিবাবুর দিকে তাকায়।

কঞ্চিবাবু ধরা গলায় বলেন—অমন করে দেখছিস কী তোরা?

দুজনেই বলে ওঠে—কঞ্চিদাদু তুমি...

—হ্যাঁ, আমি। আমি তোদের সাথে আছি। এই নে তোদের পঞ্চাশ হাজার টাকা।

অনির্বাণ আর অনিরুদ্ধ—দুজনেই হাঁ করে কঞ্চিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি ভোম্বলদাকে চিমটি কাটলাম। ভোম্বলদা চোখ পাকিয়ে আমাকে বলল—এটা কী হল?

—তুমি তো কঞ্চিবাবুকে লাইব্রেরির বই কেনার ব্যাপারে ডোনেশনের কথা বলছই না। তাই...

—তাই ওই ভাবে চিমটি কেটে মনে করাবি? সিংহের মতো গর্জন করে উঠল ভোম্বলদা।

—অন্যায় হয়ে গেছে।

—আর কখনও ওই রকম রাম চিমটি কাটবি না। কী বুঝলি?

—তোমাকে আর চিমটি কাটব না।

—রাইট। বলে কঞ্চিবাবুর দিকে তাকিয়ে ভোম্বলদা বলে উঠল, আমাদের ডোনেশনটা?

কঞ্চিবাবু আড়চোখে আমার আর ভোম্বলদার দিকে তাকিয়ে মুখে মুচকি হাসি এনে বললেন—এখনও কি ডোনেশনের ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ আছে?

আমি বললাম—এবার কিন্তু আমাদের অনেক বই কিনতে হবে। তাই...

—মোটা টাকার দরকার।

—রাইট। আমি আর ভোম্বলদা একসঙ্গে বলে উঠলাম।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে কঞ্চিবাবু বললেন—আমার প্রধান উপদেষ্টা তো তোমাদেরই সামনে দাঁড়িয়ে। ওকে বলো।

অনির্বাণ আর অনিরুদ্ধকে জড়িয়ে ধরে আমরা বলে উঠলাম—কঞ্চিবাবু জিন্দাবাদ।

চাকভাঙা মধু ও ভোম্বলদা

ভোম্বলদার খাই-খাই স্বভাব যেমন ছিল তেমনই আছে। একফোঁটাও পালটায়নি। এটা খাই সেটা খাই লেগেই আছে। এর জন্যে গাঁটের কড়ি খসে আমাদেরই। তাতেও আমাদের দুঃখ নেই। কিন্তু ঝামেলা হয় তখনই এই খাবার ব্যাপারে যখন কলকাতার বাইরে ছুটতে হয়। ঝামেলা বলে ঝামেলা। একটা খাবার জিনিসের জন্যে বাইরে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! সময় আর অর্থ ব্যয় করে এর জন্যে দূর-দূরান্তে যাওয়া মানে পাগলামি। আর ভোম্বলদার খাওয়ার বায়না তো! একবার শুরু হলে সেটা না-খাওয়া পর্যন্ত তার শেষ নেই। রাতদিন আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। বহুবার তার এই বায়নার জন্যে আমাদের বাইরে যেতে হয়েছে। এবারও হয়তো হবে।

বেশ কয়েকদিন ধরেই ভোম্বলদা বায়নাটা শুরু করেছে। বেশিরভাগ সময় তার মুখে এক কথা চাকভাঙা মধু দারুণ খেতে। ব্যস, আর যায় কোথায়। চাকভাঙা মধু খেতেই হবে। চলো এবার চাকভাঙা মধু খেতে। খোঁজো, কোথায় তা পাওয়া যায়।

বহু খোঁজাখুঁজির পর যে জায়গাটার সন্ধান পাওয়া গেল সেটা সুন্দরবন। সুন্দরবনেই নাকি প্রচুর চাকভাঙা মধু পাওয়া যায়।

সুন্দরবনে আমরা কখনও যাইনি। অথচ এই সুন্দরবন সম্বন্ধে কত কথাই না শোনা যায়। তাই সুন্দরবনের নাম শুনে ভোম্বলদা আনন্দে আত্মহারা। আমরাও।

সেদিন একটু সকাল-সকালই আমরা ক্লাবে এসে হাজির হয়েছি। উদ্দেশ্য—সুন্দরবন যাওয়ার ব্যাপারে ফাইনাল আলোচনা করা।

শীতকাল। জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে সূর্য। পড়ন্ত বেলায় সূর্যের শেষ আলো তখন বড়ো

বাড়িগুলোর মাথায় হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে সরে যাচ্ছে। আমরা তিনজনে মানে ভোম্বলদা, ভুলো আর আমি চায়ের সঙ্গে তেলে ভাজা আর মুড়ি খাচ্ছিলাম। এমন সময় এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব। তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন। আজাদ হিন্দ্ সংঘের সেক্রেটারি। নাম—বসন্ত মালাকার। এসেছেন গোসাবা থেকে।

হঠাৎ ভোম্বলদার মুখটা চিকচিক করে উঠল। অনেকটা গায়ে পড়েই আমার আর ভুলোর পরিচয় দিল ভদ্রলোককে। দিল নিজেরও। অবশ্য আমার পরিচয় ভদ্রলোকের জানা ছিল। মুখ চিনতেন না।

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন—তেইশে জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন আমরা পালন করব। হলধরবাবু, আপনাকে ওই দিন আমাদের মধ্যে চাই। আপনিই আমাদের প্রধান বক্তা।

আবার গায়ে পড়ে ভোম্বলদা বলল—অবশ্যই। নেতাজির ব্যাপারে কেউ কি না গিয়ে পারে! বিশেষ করে নেতাজি গবেষকদের তো আগে যাওয়া উচিত। তা বসন্তবাবু, আপনি ভোলানাথবাবুর (ভুলো!) সঙ্গে কথা বলুন। আমরা এক্ষুনি আসছি।

—আমাকে যে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার আছে। বরং আমি হলধরবাবুর সঙ্গে কথা বলে কাজটা সেরে নিই।

ভোম্বলদা বলল—কথা তো নিশ্চয়ই বলবেন। অত দূর থেকে এসেছেন। চা-টা খেয়ে একটু জিরিয়ে নিন। তারপর.....

—অযথা ঝামেলা কেন করছেন? আমতা-আমতা করলেন বসন্তবাবু।

—এর মধ্যে ঝামেলার কী আছে? আপনি একটু বসুন..... বলে ভোম্বলদা আমার হাত ধরে ধাঁ করে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় বেরিয়ে ভোম্বলদা বলল—বুঝলি হুলো, একেই বলে কপাল।

—মানে?

—মানে যে খায় চিনি তাকে যোগায় চিন্তামণি।

—হেঁয়ালি ছেড়ে পরিষ্কার করে বলো। আমি তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

—বুঝবি। ঠিকই বুঝবি। গোসাবাটা কোথায় বল তো?

—সুন্দরবনের পাশে।

—কী বুঝলি?

—ও হরি, এই কথা! মানে তোমার চাকভাঙা মধু.....

—ইয়েস। বলে ভোম্বলদা বসন্তবাবুর জন্যে চিকেন কাটলেট, ফিস ফিঙ্গার আর কফির অর্ডার দিয়ে নিজেই পেমেন্ট করল। বুঝলাম চাকভাঙা মধুর কী অপূর্ব মহিমা।

তাই বললাম—তুমি মধু খাওয়ার আশায় এতগুলো টাকা ব্যয় করলে ভোম্বলদা। নেমন্তন্ন তো আমার একার।

—তা হোক। ভদ্দরলোককে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করাতেই হবে যাতে আমার যাওয়া হয়। এটা তোকেই ম্যানেজ করতে হবে হুলো।

—কী বলছ তুমি ভোম্বলদা! এটা সম্পূর্ণ তাঁদের ব্যাপার। এখানে আমার অনুরোধ করাটা কি উচিত?

—চল না ক্লাবে আগে। দেখাই যাক না।

ক্লাবে এসে ভোম্বলদা বসন্তবাবুর পাশে বসল। দিব্যি গল্প জুড়ে দিল তাঁর সঙ্গে। ইতিমধ্যেই কফি ও খাবার এসে গেল। বসন্তবাবু বললেন—কী করেছেন আপনারা। এ যে এলাহি কাণ্ড!

—কী যে বলেন। ভোম্বলদা বলল, এটা কিছুই না। যৎসামান্য। খেয়ে নিন।

—আপনাদের?

—আমরা তো একটু আগেই খেলাম। দেখেছেনও হয়তো।

এতটা আপ্যায়ন ভদ্রলোক আশা করতে পারেননি। তাই বেশ জেঁকে বসে গল্পে মেতে উঠলেন। ভোম্বলদা বলল—সত্যি আপনাদের

গোসাবার তুলনা হয় না। দারুণ জায়গা। চারদিকে নদী। পাশে বিখ্যাত সুন্দরবন। এখানে-ওখানে সবুজ ক্ষেত। আর হ্যামিলটন সাহেবের সেই সুন্দর কাঠের বাংলো। সব মিলিয়ে গোসাবা একটা দেখার মতন জায়গা।

আমি আর ভুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। বসন্তবাবু বললেন—আপনি তা হলে গোসাবা দেখেছেন?

—না। ভোম্বলদা বলল, বইয়ে পড়েছি আর লোকমুখে শুনেছি। তবে দেখার ইচ্ছে আছে। একবার যাব ওখানে।

—তা হলে এবারই চলে আসুন না হলধরবাবুর সঙ্গে। আপনিও আসুন ভোলানাথবাবু। বলে বসন্তবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, হলধরবাবু, আপনি আপনার বন্ধুদের নিয়ে চলে আসুন।

আমাকে আমতা-আমতা করতে দেখে ভদ্রলোক কী ভাবলেন কে জানে! বললেন—ওঁরাও সম্মানিত অতিথি হিসেবে যাবেন। মঞ্চে বসবেন। বক্তৃতা দেবেন। অসুবিধে কী আছে? আপনারা তিনজনই তো সাহিত্যিক।

যাওয়ার জন্যে ভোম্বলদা তো পা বাড়িয়েই ছিল। তাই আমার বলার আগেই আগ বাড়িয়ে বলল—ঠিক আছে বসন্তবাবু। আমরা তিনজনেই যাব।

বসন্তবাবু বললেন—বাইশে জানুয়ারি লোক পাঠিয়ে দেব। তার সঙ্গে আপনারা চলে আসবেন।

নির্দিষ্ট দিনে গোসাবা থেকে লোক এল। আমরা তিনজনেই পৌঁছে গেলাম সেখানে। তবে জার্নি বটে একখানা! ট্যাক্সি-বাস-ভুটভুটি-ভ্যানরিক্সা সবেতেই চড়তে হল। এবং হাঁটতেও হল।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল হ্যামিলটনের সেই স্বপ্নের বাংলোয়—যেখানে রবীন্দ্রনাথ এক সময় থেকেছিলেন। আমরা রীতিমতো পুলকিত।

আমরা যখন গোসাবায় পৌঁছই বিকেল তখন সন্ধে ছুঁই-ছুঁই।

জলখাবার আর চা এল। ভোম্বলদা একাই খান পঁচিশেক লুচি খেল। সেই সঙ্গে গোটা দশেক রসগোল্লা, জামবাটির পুরো একবাটি হালুয়া আর ওই অনুপাতেই আলু-কপির ডালনা। পাশ থেকে চিমটি কেটেও আমি থামাতে পারলাম না। বসন্তবাবু দু-একবার আড় চোখে তাকিয়ে হয়তো ভাবছিলেন কাকে নেমন্তন্ন করে এনেছি।

বসন্তবাবু চলে যেতেই আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম—তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান আর হবে না ভোম্বলদা?

ভোম্বলদা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল—এ কথা বলছিস কেন?

—তুমি যে রাক্ষসের মতন খাও তা আমরা সবাই জানি। তাই বলে কি সব জায়গায় এই রকম খাবে? তোমার কি হুঁশ নেই যে এখানে অনুষ্ঠানের অতিথি হয়ে এসেছ?

—হুঁশ আছে বইকী!

—তা হলে এরকম খেলে কেন?

হনুমানের মতো দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভোম্বলদা বলল—খেলাম কেন? পেটে খিদে ছিল বলেই খেলাম।

—খিদে তো তোমার পেটে সব সময়ই থাকে। তাই বলে ও রকম রাক্ষসের মতন খাবে? বিশেষ করে বাইরের লোকজনের সামনে?

—রাখ তোর বাইরের লোকজন। তিরিক্ষি মেজাজে ভোম্বলদা বলল, উনিও সেদিন কম সাঁটাননি ক্লাবে। গাঁটের পয়সা তো আমারই খসেছিল। উসুল করব না?

উত্তেজিত হয়ে কথার জবাব দিতে যাচ্ছি এমন সময় একজন ভদ্রলোক এলেন। তিনিও ক্লাবেরই সদস্য। আমাদের খোঁজখবর নিতে এসেছেন। ভোম্বলদা গল্প জুড়ে দিল তাঁর সঙ্গে। শুরু হল চাকভাঙা মধু দিয়ে। শেষ হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গল্পে।

ভোম্বলদা বলল—মাঝে মাঝে কাগজে দেখা যায় গ্রামে ঢুকে বাঘ মানুষের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে পড়ে। এ রকম হয় বুঝি?

ভদ্রলোক বললেন—অবশ্যই। তবে বাঘ চট করে গ্রামে ঢোকে না।

কখনও-সখনও এসে পড়ে। কিন্তু বাঘ বলে কথা। সারা গ্রামে তাই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

—আতঙ্কের কী আছে এতে? দেহে বল আর মনে সাহস থাকলে বাঘকে জব্দ করাটা এমন কিছু ব্যাপার নয়।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—আপনার মতন সাহস কজনের আছে বলুন? তা ছাড়া আপনি একাই হয়তো একটা বাঘের সঙ্গে লড়ার মতন ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু.....

ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ার আগেই ভোম্বলদা খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল—তা যা বলেছেন। আজকাল তো লোকের খাওয়া কমে গেছে। খেতেই পারে না বড়ো একটা। তা দেহে শক্তি আসবে কোত্থেকে! গায়ে জোর থাকলে তবেই তো মনের জোর বাড়ে।

আমি আর কথা বাড়াতে দিলাম না। ভদ্রলোককে বললাম—কাল সন্ধেবেলায় তো আপনাদের অনুষ্ঠান। সকাল-সকাল বেরিয়ে সুন্দরবন দেখে অনুষ্ঠানের আগে ফিরে আসা যাবে না?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। এখান থেকে ভ্যানরিক্সা করে ফেরিঘাট যেতে হবে। সেখান থেকে মাতলা নদী পেরোলেই সজনেখালি। কতক্ষণের আর রাস্তা! বড়োজোর ঘন্টা তিনেকের। বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর আমি ভোম্বলদাকে বললাম—ময়নার বাঘের কথা কি তুমি এর মধ্যেই ভুলে গেলে?

—ভুলব কেন?

—তবে?

—এটা প্রচারের যুগ। ভোম্বলদা বলল, এই ভাবেই এখন নিজের প্রচার নিজেকেই করতে হয়।

—খুবই ভালো কথা। ভুলো বলল, তবে সেবারের মতন এবার আবার অজ্ঞান হয়ে যেয়ো না যেন।

পরের দিন কাকভোরেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ভুটভুটিতে চড়ে মাতলা পেরিয়ে সুন্দরবনের সজনেখালিতে নামলাম। সঙ্গে আজাদ

হিন্দ্ সঙ্ঘের দুজন সদস্য।

সুন্দরবন সত্যিই সুন্দর। ছোটো ছোটো খাল বনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। বহু দূর পর্যন্ত নদী চলে গেছে এঁকে বেঁকে। অনেকটা জায়গা নিয়ে কাঠের সব ঘর দাঁড়িয়ে আছে খুঁটির উপর। চারদিকে গাছগাছালি। অদূরে টাওয়ার। টাওয়ার থেকে বাঘ-হরিণ দেখা যায়। তবে ইদানীং বাঘ বড়ো একটা দেখা যায় না।

এদিক-ওদিক ঘুরে আমরা অফিসে এলাম ভোম্বলদার সেই চাকভাঙা মধুর জন্যে। মধু দেখে ভোম্বলদার নোলায় জল এসে গেল। আমরা তিনজনেই মধু কিনলাম। ভুলো আর আমি এক কেজি করে কিনলাম। ভোম্বলদা কিনল পাঁচ কেজি। ভোম্বলদার মুখে তৃপ্তির হাসি। আমাদের মুখে বিরক্তির ছাপ।

সন্ধে হয়-হয়। আকাশের রং পালটে যাচ্ছে। সজনেখালি থেকে ওপারে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই সংবাদ এল একটা বাঘ নাকি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সম্ভবত নদী পেরিয়ে এদিকেই এসেছে। ব্যস, আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে 'বাঘ....বাঘ' বলে ভোম্বলদা ভুলোকে আর আমাকে জড়িয়ে ধরল। হাত থেকে মধু পড়ে গেল। পড়ে গেলাম আমরাও। জল-কাদায় একাকার সর্বাঙ্গ। দেখতে দেখতে ভোম্বলদা জ্ঞান হারাল। আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের লোকেরা অবাক। সবচেয়ে বেশি অবাক হলেন সেই ভদ্রলোক যার সামনে বাঘ-টাঘ কিছু নয় বলে নিজের ক্ষমতা জাহির করেছিল ভোম্বলদা। ভুলোর আর আমার লজ্জায় মাথাকাটা।

ভোম্বলদার দিকে তাকিয়ে দেখি নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। বিরক্ত হলাম। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে ভ্যানরিক্সায় শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে ছুটলাম।

ভোম্বলদার জ্ঞান ফিরল রাত দশটায়। ততক্ষণে অনুষ্ঠান শেষ।

সাহেব হওয়ার সখ

বেলা তখন পড়ে গেছে। বালিগঞ্জ লেকের পাড়ে বসে আমরা তিনজনে—ভুলো, টুলো আর আমি আলুর দম খাচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ আগেই আমরা এখানে পৌঁছে গেছি। যার জন্যে আজ আমাদের তিনজনের এখানে আসা, তারই দেখা নেই। অর্থাৎ, আমাদের বিখ্যাত ভোম্বলদার এখন পর্যন্ত কোনো পাত্তাই নেই। অথচ বাইরে বেড়াতে যাওয়ার গরজটা সকলের চেয়ে তারই বেশি। আজ এখানেই সকলে মিলে আমরা ঠিক করব কবে কোথায় বেড়াতে যাব।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ছড়িয়ে পড়ল লেকের উপর। আবছা অন্ধকারে লেকের জল বেশ কালো হয়ে উঠেছে। গাছের ডালে-ডালে শুরু হয়েছে পাখিদের কিচিরমিচির। অনেকক্ষণ আগেই এসেছি আমরা এখানে। মনে হয় ভোম্বলদা আজ আর আসবে না। অযথা লেকে বসে থাকার কোনো মানেই হয় না। তাই আমরা তিনজনে উঠি-উঠি করছি, এমন সময় বর্ষার মেঘের মতো মুখ ভার করে এসে হাজির হল সেই মূর্তিমান মানে আমাদের বিখ্যাত ভোম্বলদা।

ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা অবাক। সকালেও যে ভোম্বলদা বাইরে যাওয়ার জন্যে চিনিমাখা মুখে হইহই করেছে, হঠাৎ তার একী পরিবর্তন!

তাই একসঙ্গে সকলে জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার ভোম্বলদা?

—ব্যাপার শুনে লাভ কী! ভোম্বলদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এবার আর আমার বাইরে যাওয়া হবে না। তোরা যা।

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

ভোম্বলদার ব্যাপার তো! বোঝা দায়। কে জানে হয়তো কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার-টাবার এসে গেছে—সে সব

ফেলে কি আর ভোম্বলদা কোথাও নড়বে!

ভোম্বলদার মুখের দিকে আমি তাকালাম। মনে মনে হেসে বললাম—ব্যাপারটা খুলেই বলো না ভোম্বলদা! বাড়িতে ভালোমন্দ খাবার-টাবার এসেছে নাকি?

—তোদের মুখে ওই এক কথা। ভোম্বলদা বলল, সব সময় শুধু খাবার আর খাবার। খাবার ছাড়া কি তোরা আর কিছু চিন্তা করতে পারিস না? বসে বসে আলুর দম খাচ্ছিস আর ওই এক চিন্তা করে চলেছিস। খাই-খাই স্বাভবটা একটু পালটা।

পেটুক ভোম্বলদার মুখে এমন অদ্ভুত কথা শুনে আমি হাঁ করে বেকুবের মতো তার মুখের দিকে তাকালাম। ভুলো ঢোক গিলল। টুলো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে অভিনয়ের সুরে বলল—এ কী কথা শুনি আজি গুরু তোমার মুখে। এ যে ভূতের মুখে রাম নাম।

ভোম্বলদা বেজার মুখে আমার দিকে তাকাল। তারপর মনের দুঃখে করুণ কণ্ঠে বলল—বল, তোদের প্রাণে যা চায় তাই বল। আমি বেশি খাই বলেই তো তোরা টিটকিরি করিস—কর।

—আহা টিটকিরি করতে যাব কেন। ভুলো বলল, হঠাৎ তোমার বাইরে না-যাওয়ার সিদ্ধান্তে কেমন যেন খটকা লাগছে।

টুলো বলল—আলুর দমটা কিন্তু দারুণ টেস্টি। লেক কালীবাড়ির আলুর দম এমনিতেই দারুণ খেতে। আজ স্পেশাল বানিয়েছে। তা তুমি খাবার ব্যাপারে যা-ই বলো ভোম্বলদা, আজকের আলুর দমটা না খেলে সারা জীবন আলুর দম খাওয়াই বৃথা হয়ে যাবে।

ভোম্বলদার চোখ দুটো আনন্দে চিকচিক করে উঠল। নোলায় জল এল। কিন্তু মুখে স্পিকটি নট।

ভোম্বলদার অবস্থা দেখে আমি বললাম—তোমার জন্যে আনব নাকি ভোম্বলদা?

এবার নোলার জল টেনে ভোম্বলদা বলল—তা তোরা যখন এত

করে বলছিস, তা হলে নিয়ে আয় একটু। তবে বেশি আনতে হবে না। টাকা দশেকের আনলেই হবে।

আমরা তিনজন পরস্পরের মুখের .. তাকালাম।

একটু থেমে ভোম্বলদা আবার বলল—খাওয়াটা পুরো মুডের ব্যাপার। মুড না থাকলে কি খাওয়া যায়?

—সে তো ঠিক কথা। মুড থাকলে কি তুমি মাত্র দশ টাকার খেতে! কম করে হলেও ওটা পঞ্চাশ টাকা হয়ে যেত। গম্ভীর কণ্ঠে টুলো ঠুকল।

কথাটা মিথ্যে নয়। বহুবার আমাদের ঘাড় ভেঙে এক-একবারেই পঞ্চাশ টাকার আলুর দম খেয়েছে ভোম্বলদা। এ যুগে এ কথা অবিশ্বাস্য হলেও কিন্তু ষোলোআনা সত্যি। ভোম্বলদার যে মুড অফ এটাই তার প্রমাণ। জীবনে এই প্রথম ভোম্বলদা পরম্মৈপদী টাকায় খাবারের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করল। না হলে নোলার জল টেনেও মাত্র দশ টাকার আলুর দম খেতে যাবে কেন! ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর। তাই আমি ভোম্বলদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—হঠাৎ তোমার মুড অফের কারণটা কী?

—সে করুণ কাহিনি শুনে আর কী করবি? ভোম্বলদা বেজার মুখে আমাদের দিকে তাকাল।

—করুণ কাহিনি! টুলো বলল, সেকী কথা!

ভুলো বলল—ব্যাপারটা খুলে বলো তো ভোম্বলদা। আমরা থাকতে তোমার জীবনে করুণ কাহিনি..... অসম্ভব।

সঙ্গে সঙ্গে টুলো বলল—এ হতে পারে না। আমরা হতে দেব না।

ভোম্বলদা কী যেন ভাবল। তারপর টুলোর পিঠে হঠাৎ একটা চাপড় মেরে বলল—আমার হেডে বুদ্ধি এসে গেছে।

—উঃ..... বলে টুলো চেঁচিয়ে উঠল। একটু বিরক্ত হয়েই বলল, তোমার হেডে বুদ্ধি আসার জন্যে কি আমার পিঠের হাড়গোড়

ভাঙবে?

—কী যে বলিস তোরা। তোদের পিঠে হাত বোলালেও বলবি হাড়গোড় ভেঙে গেল।

—বলাটা কি অস্বাভাবিক? তোমার হাতখানা যে কী জিনিস তা তো তুমি ভালো করেই জানো। বাদ দাও ও সব কথা। আসল ব্যাপারটা বলো, তোমার ব্রেন খুলল কী করে? আর কেন, কীসের জন্যেই বা খুলল?

—তোর জন্যে?

—আমার জন্যে তোমার ব্রেন খুলল! টুলো অবাক হয়ে বলল, ব্যাপারটা তো তা হলে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

—ঠিকই বলেছিস। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। তোর কাছে আরও ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠবে।

টুলো বলল—তা হলে চটপট বলে ফ্যালো।

ভোম্বলদা বলল—তুই পারবি রে টুলো, তুই-ই পারবি ওকে টাইট করে দিতে। ও যতই লম্ফঝম্ফ করুক, তোর কড়ে আঙুলের নখের কাছে ওকে ঘেঁষতে হবে না। তুই ইংরেজিতে কথা বললে ও ইংলিশ বুলি ভুলে যাবে। বলে দিলাম, তোর কাছে ও স্রেফ নট কিচ্ছু নাথিং।

আমরা অবাক হয়ে ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকালাম। ওর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ ভুলো বলে উঠল—তোমার ব্রেন খোলায় আমাদের ব্রেন বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হয় ভোম্বলদা।

আহত হয়ে ভোম্বলদা বলল—আমাকে ঠাট্টা করছিস?

ভুলো বলল—এতে ঠাট্টার কী হল?

—তা হলে এ কথার মানে? চোখ পাকিয়ে উঠল ভোম্বলদা।

—মানে খুবই সহজ। আমি বললাম, তখন থেকে তো শুধু ও..... ও.... করে গেলে। তোমার ওই 'ওটা' কে, তা তো একবারের জন্যেও

বললে না।

টুলো আমার কথায় সায় দিয়ে বলল—ঠিকই তো। 'ও' মানে কী? কোথাকার 'ও'? কে 'ও'?

—পাঁকাল। ওই পাঁকালটার জন্যেই তো আজ আমার এই দুরবস্থা।

—পাঁকাল। ভুলো বলল, সে আবার কে?

ভোম্বলদা বলল—আমার পিসেমশাইয়ের ছোটো ভাইয়ের বড়ো ছেলে। লেখাপড়ায় বেশ ভালো। সেই জন্যেই ওর এত ডাঁট। আমাকে দেখলেই উনি বাংলা ভুলে গিয়ে একেবারে বিলিতি সাহেব হয়ে যান।

—কী রকম.... কী রকম? আমরা সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

ভোম্বলদা বলল—আমাকে দেখলেই ইংরেজিতে কথা। আর সেকী ইংরেজির ফোয়ারা! আর আমার ইংরেজির দৌড় তো তোদের জানা। এবার আমার অবস্থাটা বোঝ।

টুলো বলল—ও ইংরেজি দেখাচ্ছে, দেখাক। তাতে তোমার কী হল?

—হবে আবার কী! ভোম্বলদা বলল, যা হওয়ার তাই হয়েছে। ওর ইংরেজি বলার জন্যে আমাকে মুখ শুনতে হল। যাকে বলে একেবারে নাকানিচোবানি খাওয়া।

—মানে? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ভোম্বলদা বলল—তা হলে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলি। আজ সকালে 'বাবু' আমাদের বাড়িতে এসেছেন। দুপুরে আমার সঙ্গে দেখা হতেই শুরু করলেন ইংলিশ বুলি। আমি ওর ইংরেজি কথা ঠিকমতো বুঝতে পারছিলাম না। যতটুকু বুঝতে পারছিলাম তার জবাব দিচ্ছিলাম বাংলায়। ব্যস, আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে বাবা সাপের মতো ফোঁস করে উঠলেন—দূর হ গণ্ডমূর্খ! দিনরাত শুধু আড্ডা। আমি কি তোকে ধানচাল দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম? ইংরেজিতে

একটা কথা বলতে গেলে তোর দাঁত ভেঙে যায়। লজ্জাও নেই। হনুমান কোথাকার!

—আশ্চর্য! ভুলো বলল, এর জন্যে মেসোমশাই তোমাকে এই ভাবে বকাবকি করলেন?

—তা হলে ভেবে দ্যাখ এবার। সাধে কি আর আমি বাইরে যেতে চাইছি না!

টুলো বলল—মাত ঘাবড়াও। বাইরে তুমি আলবাত যাবে। বোলাও তোমার পাঁকালকে। টের পাবে ইংরেজ সাজার মজাটা। পাঁকালকে নাকাল করে মাকাল বানিয়ে ছাড়ব। ওর বাংরেজগিরি চিরদিনের মতন শেষ হয়ে যাবে।

ভোম্বলদা বলল—বাংরেজগিরি! সেটা আবার কী?

টুলো বলল—এটা তো একটা বিখ্যাত শব্দ। বাঙালি হয়ে যে ইংরেজ সাজে তাকেই বলে বাংরেজ।

—কথার মতন কথা একখানা বলেছিস টুলো। ভোম্বলদা বলল, এই জন্যেই তো একটু আগে বললাম আমার মাথায় বুদ্ধি এসে গেছে। তুই পারবি ওকে টাইট দিতে। এমন ইংরেজি ঝাড়বি যাতে বাছাধন একেবারে ফিউজ হয়ে যায়।

টুলো বলল—ইংরেজির দরকার হবে না। তুমি শুধু ওকে নিয়ে চলো আমাদের সঙ্গে। তারপর দেখবে রগড়খানা।

কথাটা বলে টুলো পাঁকালকে টাইট দেওয়ার ছকটা আমাদের বলল। দারুণ আইডিয়া। সত্যি টুলোর ব্রেনের তারিফ করতে হয়।

ভোম্বলদা মুগ্ধ হয়ে বলল—কোথায় যাওয়ার কথা ভেবেছিস তোরা?

আমি বললাম—মুর্শিদাবাদ।

—ভেরি গুড আইডিয়া। ভোম্বলদা বলল, যে পলাশির বাগান দিয়ে ইংরেজ ঢুকেছিল সেই পলাশিতেই ওর ইংরেজ সাজার শখ মিটে

যাক। তা কবে রওনা দিতে চাস?

—কালই।

মেজাজে ভোম্বলদা বলল—ঠিক হ্যায়।

পরের দিনই রওনা দিলাম আমরা মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে।

আমাদের যাত্রা যখন শুরু হল তখন সন্ধে। দূরাকাশের বুকে কেবলমাত্র একটা সন্ধ্যাতারাই জেগে উঠেছে। সাদা মারুতি নিয়ে ভাঙাচোরা পথ ধরে আলো-আঁধারির মাঝখান দিয়ে চলেছি আমরা পাঁচজন—আমি, টুলো, ভুলো, ভোম্বলদা আর পাঁকাল।

কলকাতা থেকে অনেকটা দূরেই এসে গেছি আমরা। রাতও অনেকটা এগিয়ে গেছে। একে খানাখন্দে ভরা রাস্তা, তার উপর লরি চালকদের মর্জিমতো লরি চালানোর জন্যে আমাদের গাড়ি চলেছে আস্তে আস্তে, নাচতে নাচতে।

এমনি করে যেতে যেতে আমরা যখন একটা মেঠো রাস্তার ধারে পৌঁছলাম রাতের অন্ধকার তখন অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে ভোরের পাখিদের কলকাকলি। পুব আকাশের বুকে সুয্যিমামাও উঁকি মারতে শুরু করেছে।

হঠাৎ ভুলো বলল—একটু চা খাওয়া দরকার।

গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে তখন আমি। ভুলোর কথায় সায় দিয়ে টুলো বলল—কাছাকাছি কোনো চায়ের দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাবি তো হুলো।

ভোম্বলদা বলল—সারা রাত হুলো আর ভুলো গাড়ি চালিয়েছে। ওরা খুবই ক্লান্ত। ওদের দুজনেরই আগে চাঙ্গা হওয়া দরকার। এখনও অনেকটা পথ বাকি। আমরা তো কেউ আবার গাড়ি চালাতে জানি না।

আমি বললাম—গাড়ি চালানোর কথা ছাড়ো। এখন সবারই চায়ের দরকার। আমি তো গাড়ি চালাচ্ছি। তাই তোমরা একটু ভালো করে

নজর রেখো দোকান-টোকান যেন পেরিয়ে...

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ পাঁকাল বলে উঠল—রাস্তার ধারে এই সব নোংরা দোকানে চা খেতে হবে! অসম্ভব। তার চেয়ে বরং হোটেলে গিয়ে খাওয়া যাক।

টুলো বলল—দ্যাখো ভাই বাংরেজ, থুড়ি পাঁকাল, রাস্তাঘাটে চলতে গেলে এই সব দোকানে খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। অত বাছবিচার করতে গেলে গাড়িতে বেড়ানো যায় না—বেড়াতে হয় প্লেনে করে।

গম্ভীর মুখে পাঁকাল টুলোর দিকে তাকাল।

সামনেই ছোট্ট একটা চায়ের দোকান দেখে গাড়ি থামালাম। দোকানে অল্পবয়সী দুটো ছেলে। কথায় কথায় জানলাম ওরা দুই ভাই—একজনের নাম চুমচুম আর একজনের নাম ঝুমঝুম।

—বেড়ে নাম তো তোদের! আমি বললাম, চা ভালো হবে তো রে?

—ভালো হবে না মানে! এক লম্বর চা হবে। একবার খেলে বার বার আসতে হবে।

ওদের ইংরেজি শুনে পাঁকাল চুমচুম-ঝুমঝুমের মুখের দিকে তাকাল।

টুলো আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল—ইংরেজি বুলির হয়েছে কী! সবে তো এক 'লম্বর'। এর পর লম্বরের পর লম্বর আসবে। তখন রগড়খানা দেখিস। বাংরেজের ওস্তাদি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আমাদের চারজনের হাতে চায়ের গ্লাস দিয়ে চুমচুম-ঝুমঝুম পাঁকালকে বলল—আপনি আমাদের দোকানের চা খেলেননি বাবু, খেলে বুঝতেন 'টেস' কাকে বলে।

দারুণ টেস্ট। আমরা চারজনেই একবাক্যে স্বীকার করলাম।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে চুমচুম-ঝুমঝুম বলল—আবার আসবেন

বাবুরা। আরও ভালো করে চা বানিয়ে দেব।

চুমচুম-ঝুমঝুমকে টা-টা করে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। এবার গাড়ি চালাচ্ছে ভুলো। গাড়িতে উঠেই হইহই করতে করতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা হোটেল পৌঁছে গেলাম। পাঁকাল কিন্তু সারাক্ষণ চুপচাপ—একেবার স্পিকটি নট।

যে হোটেলে আমরা উঠলাম তার নাম—রংতামাশা। মালিকের নাম—তপসি চোকশি। বেয়ারা দুটোর নাম—পিংপং আর ডিংডং।

ভোম্বলদা ফিসফিস করে বলল—নামের কী বহর রে বাবা!

—এখন তো শুধু নামের বহর দেখছ। টুলো বলল, এর পর অনেক কিছুর বহর দেখতে পাবে।

ভোম্বলদা আবার ফিসফিস করে বলল—এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। সেই জন্যেই তো আমাদের বাইরে আসা।

টুলো বলল—পাঁকালকে টাইট দিতেই হবে। ওকে টাইট না দেওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসবে না।

—আমার চোখেও ঘুম আসবে না। ভোম্বলদা বলল।

ভুলো বলল—শান্তি, ঘুম, সব আসবে। এখন খাবারের ব্যবস্থা করো তো। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো ভোম্বলদা, এখনকার খাবারের বিলটা কিন্তু তোমাকেই পেমেন্ট করতে হবে। নো শেয়ার-টেয়ার বিজনেস।

—ঠিক হ্যায়। কুছ পরোয়া নেহি। বলে সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় হাঁক ছাড়ল ভোম্বলদা, এই পিংপং-ডিংডং, জলখাবার কী আছে রে?

জবাব এল—লুচি, আলুর দম আর দরবেশ।

ভোম্বলদা বলল—চার জায়গায় লুচি, আলুর দম আর দরবেশ নিয়ে আয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—চার জায়গায় কেন? পাঁকাল খাবে না?

ভোম্বলদা বলল—তিনি এখন বাংরেজ সাজতে গেছেন।

আমি বললাম—কী রকম?

—একটু পরেই দেখতে পাবি। ভোম্বলদার মুখে মৃদু হাসি।

চার জায়গায় জলখাবার নিয়ে হাজির হল পিংপং-ডিংডং। হঠাৎ পিংপং বলল—আপনারা তো পাঁচজন এয়েছিলেন। তা একজনকে দেখছি না। তিনি কোথায় গেলেন?

টুলো বলল—উনি ভীষণ ঠাকুরভক্ত। চান-টান সেরে পুজো-টুজো করে তবেই কিছু মুখে দেন।

ভোম্বলদা, ভুলো আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

হোটেলে পৌঁছেই পাঁকাল আগে বাথরুমে ঢুকেছিল। সেভিং-টেভিং করে চান-টান সেরে পায়জামা-পাঞ্জাবির উপর গাউন চাপিয়ে পুরো বাংরেজ সেজে এসে হাজির হল। জলখাবার শেষ করে আমরা তখন চা খাচ্ছি। পাঁকাল গম্ভীর মুখে আমাদের দিকে তাকাল। টুলো আমতা-আমতা করে বলল—পাঁকালভাই, মনে কিছু কোরো না। জোর খিদে পেয়ে গেছিল আমাদের। তাই...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে... বলে পাঁকাল ভোম্বলদার দিকে তাকাল।

ভোম্বলদা বলল—বেয়ারাকে ডেকে দিচ্ছি।

এবার ডিংডং একা এল। পাঁকালকে দেখে অবাক হয়ে বলল—একী ঠাকুরমশাই। আপনি এ সব কী পরেছেন?

ডিংডংয়ের কথায় পাঁকাল রেগে আগুন। উত্তেজিত হয়ে বলল—হোয়াট ননসেন্স! কে ঠাকুরমশাই? তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছ?

ডিংডং কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। বেগতিক দেখে টুলো তাকে বাধা দিয়ে বলল—এই ডিংডং, কত বেলা হয়ে গেছে দেখেছিস? আগে বাবুর জলখাবার এনে দে।

—বলুন বাবু, কী খাবেন?

—ব্রেকফাস্ট-মেনু লেআও।

—ও-খাবার এখানে নেই।

—মানে?

—মানে আবার কী! ডিংডং বলল, আমাদের হোটেলে ও-খাবার হয় না বাবু।

এবার ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পাঁকাল চিৎকার করে উঠল—হোয়াট ডু য়্যু মিন? তুমি কী বলতে চাও? তখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে চ্যাংড়ামো করছ?

ডিংডং কিছুটা ঝাঁঝালো স্বরে বলল—আপনার সাথে আমি কেন চ্যাংড়ামো করতে যাব?

—চ্যাংড়ামো নয় তো কী এটা? পাঁকাল আরও উত্তেজিত।

আমরা তখন মজা দেখছি।

চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ছুটে এলেন হোটেলের মালিক। হোটেলের মালিককে দেখে পাঁকাল আরও রেগে গিয়ে বলল—এটা কী ধরনের ম্যানেজমেন্ট আপনার?

হোটেলের মালিক কাম ম্যানেজার কাম হেড কুক তপসি চোকশি রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করলেন—কেন স্যার, কী হয়েছে?

—কী হয়নি বলুন? আপনার এই ডিংডং আমাকে ঠাকুরমশাই বলছে, আমার ড্রেস নিয়ে ঠাট্টা করছে। এমনকী হোটেলে কোনো ব্রেকফাস্ট মেনু পর্যন্ত নেই বলছে।

তপসি চোকশি ডিংডংকে এমন ধমক দিলেন যে, বেচারা ভিরমি খেয়ে পড়ে গেল। সামনের নেড়ি কুত্তাটা লেজ গুটিয়ে দে দৌড়। আমরাও চমকে উঠে বোমকে গেলাম। তারপর খুব বিনয়ের সঙ্গে পাঁকালকে বললেন—ব্যাপারটা একটু খুলে বলি স্যার, তা হলে আপনি সব বুঝতে পারবেন। আমাদের এই সব হোটেলে আপনার

মতো সাহেবসুবো লোক বড়ো একটা ওঠেন না। তাই আপনার পরা এরকম ড্রেস-ট্রেসও ওরা খুব একটা দেখেনি। তাছাড়া 'ব্রেকফাস্ট-মেনু'র মানেই ওরা জানে না। ফলে এই ভুল বোঝাবুঝি। যাক গে, আপনি কি খাবেন বলুন—আমি পিংপংকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লুচি-আলুর দম তিনি খেলেন না। তেনার অর্ডার মতো টোস্ট-ডিমের ওমলেট এল।

ব্রেকফাস্ট সেরে পাঁকাল আর এক ঝামেলা বাধাল। পিংপঙের কাছে 'স্টেটসম্যান' পেপার চাইলে ও স্টোনম্যান-টোনম্যান কী বলছেন বাবু... বলে দে দৌড়।

আবার তপসি চোকশি হাজির। ব্যাপারটা বুঝে তিনি পাঁকালকে ঠাণ্ডা মাথায় বোঝালেন—এখানে ইংরেজি কাগজ-টাগজ বড়ো একটা কেউ পড়ে না। পড়ে বাংলা কাগজ। স্টেটসম্যানের নামই হয়তো শোনেনি ওরা। তাই খুনি স্টোনম্যান ভেবেছে। আপনি কিছু মনে করবেন না স্যার।

বাংরেজের মাতব্বরির ফল দেখে আমরা মনে মনে দারুণ খুশি। ভোম্বলদা তো আনন্দে আত্মহারা। এই তো আমরা চেয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে চান-টান সেরে আমরা বাইরে বেরনোর জন্য প্রস্তুত। টুলো পাঁকালকে বলল—পাঁকাল, তৈরি হয়ে নাও। আমরা বেড়াতে বেরোব।

—তোমরা যাও, আমি যাব না। আই অ্যাম টায়ার্ড। খেয়েদেয়ে রেস্ট নিয়ে আমি সন্ধের সময় বেরোব।

—অল রাইট। টুলো বললো, আমরা কিন্তু বাইরে খেয়ে নেবো। বিকেলবেলায় হোটেলে পৌঁছে তোমাকে নিয়ে বেরোব।

হইহই করে বেরিয়ে পড়ে এদিক-ওদিক ঘুরলাম আমরা অনেকক্ষণ ধরে।

গাড়িতে বসে ভুলো বলল—রাত জেগে গাড়ি চালালাম আমি

আর হলো। আর সারা রাত ঘুমিয়ে টায়ার্ড হল কি না বাংরেজ।

টুলো বলল—সবে তো কলির সন্ধে। মাত্র তিন-চার লম্বর হয়েছে। এখনও অনেক লম্বর বাকি। দ্যাখ না মজাটা!

আনন্দের ঠেলায় হাড়কিপটে ভোম্বলদা আমাদের দুপুরবেলার খাওয়ার পুরো বিলটাই নিজে পেমেন্ট করল। সন্ধের দিকে হোটেলে ফিরে দেখি মুখ গোমরা করে বসে আছে পাঁকাল। আমাদের দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

আমরা ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই তপসিবাবু এসে বললেন—ক্যাশে অন্য লোক বসিয়ে একটা জরুরি কাজে আমি বেরিয়ে যাই। পিংপং-ডিংডংই সবাইকে খাবারদাবার দেয়। সবাই ওদের নাম ধরেই ডাকে। পাঁকালবাবু ওয়েটার... ওয়েটার বলে হাঁক পাড়েন। কিন্তু ওয়েটার কাকে বলে তাই তো ওরা জানে না। তবুও পিংপং ছুটে আসে। উনি পিংপঙের কাছে লাঞ্চ-মেনু চান। ব্যস,সঙ্গে সঙ্গে ঘটল সেই সকালবেলার ঘটনা। লাঞ্চ-মেনুর মানেই ও জানে না। তাই এই খাবার নেই বলে যথারীতি চলে যায়। পাঁকালবাবুরও আর খাওয়া হয়নি। ইস, সারা দিন না খেয়ে আছেন ভদ্দরলোক। মিনিট পাঁচেক আগে আমি হোটেলে ফিরে সব জানতে পারি।

সব কথা শুনে মনে মনে আমরা দারুণ খুশি। হাসি পেলেও হাসতে পারছি না। মুখে তো সহানুভূতির বুলি বলতেই হবে। তাই আমি বললাম—আহা, সারা দিন বেচারা না খেয়ে আছে। যা হোক, একটা ব্যবস্থা করুন।

চিন্তিত মুখে তপসিবাবু বললেন—এই অসময়ে কী করি বলুন তো।

টুলো বলল—চা-ওমলেট অন্তত দিন। থাকলে গোটাদুয়েক কেকও দিন। পারেন তো একটু মিষ্টি আনিয়ে দিন।

তপসিবাবু বললেন—দেখি কী করা যায়। তবে জানেনই তো

আপনারা এই সব ছোটো হোটেলে অসময়ে কিছুই থাকে না।

তপসিবাবুর কথা শুনে হাউমাউ করে উঠল পাঁকাল। কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল—সারা দিন না খেয়ে আমার মাথা ঘুরছে, চোখে সর্ষে ফুল দেখছি।

ভুলো হেসে ফেলল।

টুলো বলল—শোনো পাঁকাল, তোমাকে একটা কথা বলি। বাঙালির ছেলে হয়ে ইংরেজ সাজার এত সখ কেন? ইংরেজি বুলি আওড়ালেই কি দাম বেড়ে যায়? ইংরেজি বলতে তোমাকে বারণ করছি না। যেখানে দরকার সেখানে বলো। অযথা বাড়িতে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বা ছোটোখাট হোটেল-রেস্টুরেন্টে ইংরেজি বুলি আওড়ে বাহাদুরি দেখিয়ে লাভ কী? ফল তো হাড়ে-হাড়ে টের পেলে। যেখানে-সেখানে আর ইংরেজি বুলি আওড়াতে যেয়ো না। কথায় বলে যস্মিন দেশে যদাচার।

চোখ মুছতে মুছতে পাঁকাল টুলোর দিকে তাকাল।

চিনি মাখা মুখে ভোম্বলদা বলল—এই পাঁকাল, তোর খাবার এসে গেছে। খেয়ে নে। চল, বাইরে বেরিয়ে তোকে পেট ভরে খাইয়ে দিচ্ছি।

আমরা অবাক চোখে ড্যাব-ড্যাব করে ভোম্বলদার দিকে তাকালাম। ভোম্বলদা যে আজ সত্যি-সত্যি কবি হয়ে উঠেছে।

এদিকে পাঁকালকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম। গাড়িতে ওঠার সময় পিংপং-ডিংডং চিৎকার করে বলল—রাত্তির বেলায় মুরগির মাংস আর চিংড়ির মালাইকারি হবে।

মুরগির মাংস আর চিংড়ির মালাইকারির কথায় নোলায় জল এলেও পাঁকাল নাকাল হওয়ার দুঃখে চুপ করে রইল।

আমি বললাম—দুটোই খাব আমরা। পাঁচজনের জন্যেই রাখবি।

পাকালের মুখটা খুশিতে ভরে উঠল।

ওয়ান-ওয়ে টেলিফোন

সেদিন ক্লাবে বসে টুলো আর আমি টেলিফোন নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সত্যি ক্লাবে একটা ফোন থাকা দরকার। সন্ধের পর থেকেই তো আমরা সবাই বাড়ির বাইরে। ঘণ্টা তিনেকের উপর প্রায় ক্লাবেই থাকি। ওই সময়ের মধ্যে অনেক দরকারি ফোন বাড়িতে আসে। সেগুলো ক্লাবে থাকার জন্যে ধরতে পারি না। তাতে অনেক সময় কাজকর্মের ক্ষতি হয়।

টুলো বলল—এই তো সেদিন আমার একটা জরুরি ফোন এসেছিল; বাড়িতে মা একা থাকায় কাউকে ক্লাবে পাঠাতে পারেননি। ফলে আমার একটা কাজের ক্ষতি হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম—আমারও বেশ কয়েকবার তোর মতো ক্ষতি হয়েছে। ঠিক আছে, আজ সবাই আসুক। এ ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে।

—আজই ফোনের ব্যাপারটা ফাইনাল করে ফেলব। টুলো বলল, একদম দেরি করব না। সামনে পুজো। লেখালেখির চাপ আছে। আমাকে এ বছর অনেকগুলো পত্রিকায় লিখতে হবে। তোরও তো অনেক পত্রিকা থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, তাই না?

আমি বললাম—হ্যাঁ।

হঠাৎ আমাদের কথার মধ্যে ভণ্ডুলদা ঢুকে পড়ল। বলল—এখন কি আর ফোনের কোনো অসুবিধে আছে? রাস্তাঘাটে হাটেবাজারে সব জায়গায়ই তো লোকের হাতে ফোন। মোবাইল নিলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়। তার জন্যে তোরা এত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? আর ক্লাবেই বা অযথা ফোন আনার দরকারটা কী?

—অযথা নয়, দরকার আছে। টুলো বলল, মোবাইলের কল-চার্জ শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

—কল-চার্জের কথা উঠছে কেন? তোরা তো শুধু ফোন রিসিভ করবি।

টুলো বলল—শুধু রিসিভ করলেই কি চলে? ফোন করতেও তো হবে।

—মোবাইল ফোনে রিসিভ করারও একটা টাইম-লিমিট আছে। আমি বললাম, ক্যাশ-কার্ড থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ের পর আর রিসিভ করা যায় না। সুতরাং প্রতি মাসেই ক্যাশ-কার্ড কিনতে হবে। তাতে ল্যান্ড-ফোনের চেয়ে মোবাইলের খরচ অনেক বেশি।

ভণ্ডুলদা বলল—তা হলে ল্যান্ড-ফোনই ক্লাবে আসুক। ফোন কম করলেই হবে। রিসিভই বেশি করব আমরা।

—'ওয়ান-ওয়ে' থাকলে রিসিভ করবি কী করে? বলতে বলতে ক্লাবে ঢুকল ভোম্বলদা। তারপর আবার বলল, অনেকের ফোনই আজকাল ওয়ান-ওয়ে হয়ে যাচ্ছে। তাদের তো ফোন করতেই হবে।

—মানে? জিজ্ঞেস করল ভণ্ডুলদা।

—মানে আজকাল প্রায়ই ফোন খারাপ হয়। ভোম্বলদা বলল, ঠিক হলে অনেকের মুখেই শোনা যায় তাদের ফোন 'ওয়ান-ওয়ে' হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ফোন এলে রিসিভ করা যায়, কিন্তু ডায়াল করা যায় না।

টুলো বলল—ঠিকই বলেছ ভোম্বলদা। ইদানীং অনেকেই এই কথা বলে।

ভণ্ডুলদা বলল—কেন বলে? কারণ কী?

—কারণ বুঝতে পারছিস না? ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল।

—না। ভণ্ডুলদা বলল।

ভোম্বলদা বলল—খেলার মাঠে ফাউল করা ছাড়া তোর মাথায় আর কিছুই ঢুকবে না রে ভণ্ডুল।

—কেন একথা বলছিস?

আমি বললাম—এটা তো সোজা হিসেব ভণ্ডুলদা। যার ফোন 'ওয়ান-ওয়ে' হয়ে আছে, সে তো আর কাউকে কোনো ফোন করতে পারবে না। অন্যদেরই তাকে ফোন করতে হবে। ফলে তার টেলিফোন-বিল বেশি উঠবে না।

টুলো বলল—বেশ কায়দা তো। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। কাজও হল, পয়সাও বাঁচল।

ভণ্ডুলদা বলল—তার মানে টেলিফোন-বিল যাতে বেশি না হয় তার জন্যে এই চালাকি?

—রাইট। ভোম্বলদা বলল, এবার তোর গোবরভরা মগজে ঢুকেছে।

—তোর মগজেও যে কত ঘিলু তা-ও সবাই জানে।

ভণ্ডুলদার কথায় আমরা হেসে উঠলাম। দুজনকেই তো আমরা চিনি।

ভণ্ডুলদা আবার জিজ্ঞেস করল—এই সব 'ওয়ান-ওয়ে'-অলাদের নিজেদেরও তো ফোন করার দরকার হয়। তখন কী করে?

টুলো বলল—তখন করে। টেলিফোন রেন্টের মধ্যে যে কলগুলো থাকে তার বেশি এরা একটা কলও করে না। ওই কলগুলোই শুধু করে। ওটা না করলে তো ওদের নিজেদেরই লোকসান। টেলিফোনের ভাড়া তো দিতেই হবে।

—কী বুঝলি? ভণ্ডুলদাকে জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

ভণ্ডুলদা বলল—যা বোঝবার ঠিকই বুঝেছি। তোকে আর বোঝাতে হবে না।

—বোঝাতে হবে না মানে? ভোম্বলদা বলল, বোঝাতেই হবে। যা শুনলি তা তো শুধু ভূমিকা। এখনও তো আসল ঘটনাই শুনিসনি।

—আসল ঘটনাটা কী? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ভোম্বলদা বলল—আসল ঘটনা দারুণ ইন্টারেস্টিং। শুনলে বুঝবি।

টুলো বলল—তা হলে শোনাও।

—শোনাব। নিশ্চয়ই শোনাব। ভোম্বলদা বলল, এই 'ওয়ান-ওয়ে' টেলিফোনের জন্যেই তো আমার পেণ্ডুলাম মামা ঝামেলায় পড়ল।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী মামা বললে?

—পেণ্ডুলাম মামা। আমার আপন মামা।

—সবাই তো তোমার আপন। বসুন্ধরা কুটুম্বকম্। তোমার পর

আবার কে! তোমার তো মামার শেষ নেই।

—এতক্ষণে একখানা কথার মতন কথা বলেছিস হুলো। ভোম্বলদা হেসে বলল, তবে শোন পেণ্ডুলাম মামার কথা। এই পেণ্ডুলাম মামার জন্যেই তো আমরা 'ওয়ান-ওয়ে'-টোয়ান-ওয়ে রহস্য জানতে পারলাম।

আমি বললাম—খুব ভালো কথা। কিন্তু তোমার মামার নামটা কেন পেণ্ডুলাম হলো? এই...

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই টুলো জিজ্ঞেস করল—তোমার পেণ্ডুলাম মামা সব সময় দোলে বুঝি?

—রাইট। ভোম্বলদা বলল, ঠিক ধরেছিস। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সব সময়ই পেণ্ডুলাম মামা পেণ্ডুলামের মতন দোলে।

ভণ্ডুলদা বলল—তোর 'ফিক্সড' মামা তা হলে কী করে?

—তোর মতন ফাউল করে।

আমি বললাম—ছাড়ো তো তোমাদের এই সব ফালতু কথা। 'ওয়ান-ওয়ে' টেলিফোনের ঘটনাটা বলো।

—আরে পেণ্ডুলাম মামাই তো 'ওয়ান-ওয়ে' রহস্য বের করল। তা হলে ব্যাপারটা শোন ঃ

হঠাৎ একদিন আমার দাদু মানে পেণ্ডুলাম মামার বাবা সবাইকে এক জায়গায় ডাকেন। দাদু তো ভীষণ রাশভারী। তাই সবাই ভয়ে জড়োসড়ো। টেলিফোনের বিলটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কী?

বিরাট টাকার বিল দেখে কারও মুখে কোনো কথা নেই। কারণ, সবাই তো ফোন করে। তাই সকলেই ঠকঠক করে কাঁপছে। কাঁপছে না বা দুলছে না শুধু একজন—পেণ্ডুলাম মামা। দাদু ধরে ফেললেন। পেণ্ডুলাম মামাই বেশি ফোন করে। আর তার জন্যেই বিল বেড়েছে। যে সব সময় কাঁপে, সে-ই এখন কাঁপছে না। মানে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে দাদু পেণ্ডুলাম মামাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোর এত

ফোন হয় কেন রে?

কাঁদো-কাঁদো মুখে পেণ্ডুলাম মামা বলল—আমার জানাশোনা বেশিরভাগ লোকই বলে তাদের টেলিফোন 'ওয়ান-ওয়ে'। টেলিফোন যাচ্ছে, কিন্তু তারা করতে পারছে না। তাই...

দাদু জিজ্ঞেস করলেন—দরকারটা তোর বেশি ছিল, না তাদের?

পেণ্ডুলাম মামা বলল—আমার।

আমার দাদু ঝানু উকিল। 'ওয়ান-ওয়ে' বুঝতে তাঁর মোটেই অসুবিধে হল না। তিনি পেণ্ডুলাম মামাকে বললেন—আজই তুই তাদের কয়েকজনের বাড়িতে যা। কৌশলে তাদের ফোন থেকে ফোন করে দেখবি ব্যাপারটা কী।

সেদিন মামা তাই করল। তারপর যা ঘটল... ভোম্বলদা চুপ।

টুলো বলল—আরে বাবা, কী ঘটল সেটা বলো।

ভোম্বলদা মুচকি হাসি মুখে এনে বলল—কারও ফোনই 'ওয়ান-ওয়ে' নয়। সব ফোনই ঠিক আছে।

আমি বললাম—তোমার পেণ্ডুলাম মামা তাদের কিছু বলল না?

—কী আর বলবে! পেণ্ডুলাম মামা যাকে জিজ্ঞেস করে সে-ই বলে একটু আগেই ঠিক হয়েছে। এই হল 'ওয়ান-ওয়ে' রহস্য।

টুলো বলল—তোমার দাদু কিছু বলেননি পেণ্ডুলাম মামাকে?

—বলেননি আবার! ভোম্বলদা বলল, মাথামোটা, গাধা... কী না বলেছেন দাদু। আর সেই জন্যেই তো পেণ্ডুলাম মামা আজও বাড়ি থেকে কোনো ফোন করে না।

ভণ্ডুলদা বলল—গুল মারলি না তো?

—তোর মতন খেলার মাঠ থেকে ক্লাবের ঘর পর্যন্ত ফাউল করা আমার কাজ নয়। ভোম্বলদা বলল, কল্পনা তো একটু থাকবেই। না হলে কি গল্প হয়?

টুলো আর আমি বললাম—বিশেষ করে পেণ্ডুলাম মামার গল্প।

ভোম্বলদা হেসে ফেলল। আমরাও হাসলাম।

ভণ্ডুলদা বলল—তুই একখানা ডিটেক্টিভ রে ভোম্বল।

ছোটকার কেরামতি

সেদিন দুপুরে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় এলাম এক প্রকাশকের কাছে। সাধারণত আমরা বিকেলের দিকেই আসি বইপাড়ায়। তবে সেদিন বিশেষ দরকারে অনেক আগেই আসতে হল। এবং প্রকাশকের সঙ্গেই কেটে গেল বেশ কয়েক ঘণ্টা।

শীতের বিকেল। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে গেল। ঝুপ করে ডুব দিল সূর্যটা পশ্চিম দিগন্তে। সন্ধ্যা নেমে এল কুয়াশা গায়ে মেখে।

অনেকক্ষণ আগে খেয়ে বেরিয়েছি। প্রকাশকের ঘরে দু-তিন কাপ চা আর বিস্কুট খেয়েছি। জোর খিদে পেয়েছে। ভাবলাম কিছু খাওয়া যাক। সন্তোষের মিষ্টির দোকানের দিকে তাই পা বাড়ালাম। ওখানে এই সময় নলেনগুড়ের রসগোল্লা তৈরি হয়। বেশ ভালো, খেতে দারুণ লাগে।

সন্তোষের মিষ্টির দোকানে পা ফেলতে-না-ফেলতেই হঠাৎ একটা ভারী থাবা এসে পড়ল আমার কাঁধের উপর। পিছন ফিরে দেখি সেই মূর্তিমান—অর্থাৎ, আমাদের ভোম্বলদা। বুঝলাম প্রাণ ভরে নলেনগুড়ের রসগোল্লা খাওয়ার দফারফা। পকেটে আছে মোট পঞ্চাশ টাকা। ভোম্বলদা একাই তো শেষ করে দেবে। ভালো করে মিষ্টি খাওয়া তো দূরের কথা, আমার কপালে বড়োজোর দু-একটা জুটবে। ভোম্বলদাকে তো চিনি। শেষমেষ হয়তো আমাকে বড়ো আঙুলও চুষতে হতে পারে। একেই বলে কপাল।

মিষ্টির দোকানে ঢুকে কোণের দিকে দুটো চেয়ার টেনে বসলাম দুজনে। ভোম্বলদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ কলেজ স্ট্রিটে?

ভোম্বলদা বলল—অবাক হচ্ছিস?

—অবাক হওয়ারই তো কথা।

—অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিছুক্ষণ আগে তোর বাড়িতে গিয়ে

শুনলাম, তুই কলেজ স্ট্রিটে এসেছিস। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে দে ছুট।

—তা আমি এখানে এসেছি তোমাকে কে বলল?

—বলবে আবার কে! হিসেব। কলেজ স্ট্রিটে এলে তুই যে এখানে আসিস তা তো আমি জানি। তাই আগে এখানেই চান্স নিলাম।

—বলিহারি তোমার হিসেব! খাওয়ার গন্ধ যেখানে ভোম্বল ঘোষ সেখানে। কী, তাই না?

—রাইট। একেবারে খাঁটি কথা। যে খায় চিনি তাকে জোগায় চিন্তামণি। কী বুঝলি?

—যা বোঝার ঠিকই বুঝেছি।

—ভেরি গুড। ভোম্বলদা বলল, কী মিষ্টি খাওয়াবি বল তো?

ফিসফিস করে বললাম—আমার কাছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা আছে। বুঝেসুঝে খাবে।

—দিনকে দিন তুই ভাবী কিপটে হয়ে যাচ্ছিস রে হুলো।

—আমি তো খরচ করেও কিপটে। তুমি জীবনে একবার দাতা হয়ে দেখাও না ভোম্বলদা।

—দ্যাখাব, দ্যাখাব। যেদিন দেখবি সেদিন বুঝবি।

—বুঝতে কি আর বাকি আছে! হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।

—ছাড় তো ও সব বাজে কথা। আমার জন্যে আড়াইশো গ্রাম রাবড়ি বল।

—এই নলেনগুড়ের সময় রাবড়ি কেন খাবে? রাবড়ি তো বারো মাসই পাওয়া যায়। বরং এখানকার নলেনগুড়ের রসগোল্লা খাও।

—ধুর! রসগোল্লা-টসগোল্লা কেন খাব? ও সব মিষ্টি...

ভোম্বলদার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি বললাম—সন্তোষের নলেনগুড়ের রসগোল্লা একবার খেয়েই দ্যাখো না! দারুণ। তুমি তো জানো আমি মিষ্টি-বিশারদ।

—ঠিক আছে। তা হলে নলেনগুড়ের রসগোল্লাই বল। তবে মিষ্টির ব্যাপারে তোকে একটা কথা বলি হুলো। মিষ্টি-বিশারদের কথা যদি

বলিস, তা হলে আমার ছোটকার কাছে কেউ নয়। ওর ধারেকাছেও কেউ ঘেঁষতে পারবে না। তুই তো জানিস শুধু কলকাতার মিষ্টির খবর। আমার ছোটকা জানে সারা দেশের মিষ্টির খবর।

—কে ছোটকা?

—কে ছোটকা? ভোম্বলদা রেগে বলল, আমার বড়ো পিসির ননদের খুড়তুতো ভাইয়ের বেয়াইয়ের...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলাম—থাক, থাক। আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি, ছোটকা তারই নাম।

—তোর মাথা।

—মানে?

—ছোটকা মানে ছোটোকাকা।

—তাই বলো। তবে তোমার এই ছোটোকাকার কথা তো এর আগে কখনও শুনিনি।

—শুনবি কী করে? আমি তো ইচ্ছে করেই বলিনি।

—কেন?

—তোর এই মিষ্টি-বিশেষজ্ঞের বাহাদুরি একেবারে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যাবে। হাজার হোক, তোকে তো আমি খুবই ভালোবাসি। তাই আঘাত দিতে চাইনি।

—এতে আঘাতের কী আছে? জানলে তো ভালোই হত। আমিও তো সেই সব মিষ্টি এনে খেতে পারতাম।

মুখে একটা গোটা রসগোল্লা পুরে ভোম্বলদা বলল—পারবি না রে হুলো, পারবি না। তোর হিম্মতে কুলোবে না।

—এর মধ্যে আবার হিম্মতের কী আছে?

—আছে, আছে। সে কথা শুনলে বুঝবি।

—তা হলে বলো, শুনি।

—চল। এখান থেকে বেরিয়ে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে বসি। সেখানে গিয়ে ছোটকার গল্প বলব। তুইও ভালোভাবে শুনতে পারবি।

মিষ্টি খাওয়া শেষ করে সন্তোষ থেকে উঠে পড়লাম আমরা। ভোম্বলদা খেয়েছে দশটা রসগোল্লা, আমি মাত্র দুটো। তা ছাড়া উপায় কী! গাড়ি-ভাড়ার টাকা তো পকেটে রাখতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে ভোম্বলদা বলল—কোথায় বসা যায় বল তো?

—আমাদের ক্লাবে গিয়ে বসাই তো সব চেয়ে ভালো। সেখানেই তোমার ছোটকার গল্প খুব ভালোভাবে শুনতে পারব। অনেকে তখন এসেও যাবে।

—তুই একটা আস্ত গাধা।

—কেন? কী করলাম যে গাধা বললে?

—কী করলি? কলেজ স্ট্রিটে কথাটা উঠল, বালিগঞ্জে গিয়ে গল্প শুনবি। ততক্ষণ কি গল্পের মেজাজ থাকে?

—কিন্তু এখানে ফাঁকা জায়গাটা কোথায়?

—আছে, আছে।

—কোথায়?

—চল। হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদা স্টেশনে যাওয়া যাক।

বিস্মিত হয়ে বললাম—শিয়ালদায় ফাঁকা জায়গা! বলো কী!

—ঠিকই বলছি। চ' আমার সঙ্গে।

এবার আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। শিয়ালদা স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম দুজনে। বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে চললাম আমরা। কনকনে ঠাণ্ডা। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যেই ক্লাবে এসে গল্প শুনব বলেছিলাম। কিন্তু ভোম্বলদাকে তো চিনি। কী জানি কী মতলব আছে ওর মাথায় কে জানে! তবে আমি উৎসাহী শিয়ালদা স্টেশনে ফাঁকা জায়গা দেখার জন্যে। তা ছাড়া ভোম্বলদার গল্প শোনার আগ্রহও আমার কম নয়। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত।

দেখতে দেখতে আমরা শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

—চল, দোতলায় ওঠা যাক। বলে ভোম্বলদা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে

লাগল। আমি পিছন পিছন উঠলাম।

দোতলায় উঠে দেখি সত্যিই একটা ভালো রেস্টুরেন্ট আছে। এই প্রথম আমি দেখলাম সেটা।

রেস্টুরেন্টটা মোটামুটি খারাপ না। বেশ নিরিবিলি। আড্ডা দেওয়ার মতোই জায়গা। ভোম্বলদা মিথ্যে বলেনি।

আমি বললাম—সত্যি, গল্প করার মতন জায়গা এটা। তুমি বেশ খোঁজখবর রাখো দেখছি।

—ভুলে যাস না, আমি গোয়েন্দাগিরি করি। অনেক কিছুরই সন্ধান রাখতে হয় আমাকে। ছাড় ও সব। দু-কাপ কফি বল।

—কফি কী করে বলব! আমার কাছে আছেই তো মোট চোদ্দ টাকা। বাড়ি ফিরতে হবে না?

—ঠিক আছে। কফি ছাড়, চা বল।

বুঝলাম নিস্তার নেই। পকেট গড়ের মাঠ হবেই হবে। হলও।

চায়ের অর্ডার দিয়ে দুজনে বসলাম। একটু পরেই চা এল।

গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভোম্বলদা শুরু করল তার মিষ্টি-বিশারদ ছোটকাকার গল্প ঃ

আমার ছোটকার নাম রাঘব রোয়াল আচার।.....

—থামো, থামো। কী নাম বললে? রাঘব বোয়াল?

—হ্যাঁ।

—ইস, কী বিশ্রী একটা নাম!

—নামের তুই কী বুঝিস রে? গর্জে উঠল ভোম্বলদা।

—আস্তে বলো। আমি বললাম, নামের কিছু বুঝি না ঠিকই। তবুও.....

—তবুও-টবুও কী বলছিস?

—কিছুই বলছি না। একে এ রকম নাম, তার পাশে আবার পদবি আচার।

—তাতে কী হয়েছে?

—হবে আবার কী? তবে এ রকম নাম আর পদবি ভূ-ভারতে আছে কিনা সন্দেহ।

—দ্যাখ হুলো, তোকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমার ছোটকার নাম নিয়ে ইয়ার্কি করবি না। বিপদে পড়বি। কী বুঝলি?

—বুঝলাম তোমার ছোটকার নাম নিয়ে কোনো কথাই বলা যাবে না।

—রাইট। একজন বিখ্যাত লোকের মর্যাদাই আলাদা। তাকে নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলে না।

—তোমার ছোটোকাকা মানে রাঘব বোয়াল আচার একজন বিখ্যাত লোক! কই এর আগে তো তোমার ছোটোকাকার নাম শুনিনি। কাগজে বা টিভি-রেডিওতে.....

আমার কথার মাঝখানেই ভোম্বলদা চোখ পাকিয়ে উঠল—আবার! তোকে শুনতে হবে না ছোটকার কথা। চল এখান থেকে।

—সরি। ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না। তুমি বলো।

ভোম্বলদা আবার শুরু করল গল্প ঃ

সেবার ছোটকা শক্তিগড়ের এক বিখ্যাত মিষ্টির দোকানে ল্যাংচা খেতে বসেছে। গোটা পঁচিশেক খাওয়ার পর দোকানের মালিক ছুটে এসেছেন। ছোটকা মালিকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল—কিছু বলবেন?

মালিক বললেন—হ্যাঁ স্যার।

—বলুন।

মালিক ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বলল—আপনি অন্য মিষ্টি খান। ল্যাংচা শেষ।

—সেকী! ছোটকা বলল, ওই তো বিরাট গামলায় প্রচুর ল্যাংচা রয়েছে।

—ওটা স্যার অর্ডারি মাল। বিয়ে বাড়িতে যাবে।

—ধুর ঘোড়াড্ডিম। আপনার এত বড়ো দোকান দেখে ঢুকলাম আর আপনি মাত্র এই কটা ল্যাংচা তৈরি করেছেন! একটা খদ্দেরের

ভালো লাগলে সে পেট ভরে তৃপ্তি করেও খেতে পারবে না!

হয়েছে কী জানিস? ঠিক সেই সময় সস্ত্রীক ঢুকলেন এক ভদ্রলোক ওই মিষ্টির দোকানে। সঙ্গে ওদের সাত-আট বছরের মেয়ে। সেও কথাটা শুনতে পেয়েছে। ভদ্রলোকের বেশ ভারিক্কি মেজাজ। তিনি তখন ছোটকার দিকে এগিয়ে এলেন। ছোটকা ভয় পেয়ে গেল। ভদ্রলোক কিন্তু হাসি-হাসি মুখ করে বললেন—আপনি কি এখানে কোথাও থাকেন?

ছোটকা বলল—না, কলকাতায় থাকি।

—শুনেছি কলকাতার লোক নাকি বেশি খেতে পারে না। হার্টের রোগ আর ব্লাড-সুগারে বেশিরভাগ লোকই ভোগে?

—কথাটা মিথ্যে নয়। তবে তার মধ্যেও আবার এমন কিছু লোক আছে যাদের খাওয়া দেখলে চক্ষুস্থির হয়ে যায়। ছোটকা বলল।

—তাই নাকি? ভদ্রলোক বেশ মজা করে বললেন—তা আপনি এ রকম ল্যাংচা মোট কটা খেতে পারেন?

—গামলায় যতটা আছে সবটাই খেতে পারি।

—গামলায় তো একশোটা ল্যাংচা আছে।

—সবে তো পঁচিশটা খেয়েছি। আরও একশো খাওয়া এমন কিছু ব্যাপার নয়।

—ভেরি গুড। ভদ্রলোক বললেন, আপনি বাইরের লোক। আমাদের অতিথি। গামলায় অর্ডার দেওয়া ল্যাংচাগুলো আমারই। আপনি খান।

—না, না। তা কী করে হয়! বিনয় প্রকাশ করল ছোটকা।

—না-হওয়ার কী আছে! আমার জিনিস। আমিই তো আপনাকে খেতে বলছি। আপনি খেলে আমি খুশিই হব।

—আপনার অর্ডার-দেওয়া...

ছোটকার কথা শেষ হওয়ার আগেই ভদ্রলোক বললেন—আমি তো এখানকার লোক। আমি ভালো দোকান সবই চিনি। কিনে নিতে পারব।

ছোটকা বলল—তার চেয়ে বরং আমিই অন্য দোকানে গিয়ে খাই।

এবার ভদ্রলোকের স্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন—আপনি বাইরের লোক। এ দোকানের ল্যাংচা আপনার খুব ভালো লেগেছে। আপনি খান।

ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা এবং তাঁদের বাচ্চা মেয়েটি—সবাই এসে বসল ছোটকার টেবিলের সামনে।

খাওয়া শুরু করল ছোটকা। দোকানের মালিক গোটা গামলাটাই নিয়ে এসেছেন ছোটকার টেবিলের সামনে। ছোটকা সবে গোটা পঁচিশেক ল্যাংচা খেয়েছে, এমন সময় বাচ্চা মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। তারপরই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলাও মূর্ছা গেলেন। ভদ্রলোক তখন দিশাহারা। বাঁচাও—বাঁচাও বলে দোকানের মালিকের সেকী চিৎকার! দেখতে দেখতে লোক জড়ো হয়ে গেল। ছোটকার চক্ষু চড়কগাছ।

মা-মেয়ের জ্ঞান ফেরার পর সবাই আসল ব্যাপারটা জানতে পারল। চোখ খুলে মেয়েটি ছোটকার দিকে তাকিয়ে দেখল। ভদ্রমহিলাও তাকালেন। ভয় কাটিয়ে ওরা অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। ছোটকা কিন্তু তখন ভয়ে কাঠ। এমন সময় আবার দুটি তাগড়াই যুবক ছোটকার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ছোটকার অবস্থা রীতিমতো কাহিল। ইষ্টনাম জপ করতে শুরু করল। ভাবল এক্ষুনি হয়তো তুলে আছাড় মেরে ল্যাংচা খাওয়ার সখ মিটিয়ে দেবে। ওরা কিন্তু উলটে ছোটকাকে হ্যাণ্ড শেক করে বলল—আমরা আপনার মতন লোককে দেখে খুশি এবং গর্বিত। এখনও এদেশে, বিশেষ করে কলকাতায় যে দু-একজন লোক এ রকম আছে তা দেখেও ভালো লাগে। আপনার খাওয়া দেখে আমরা আনন্দ পেতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকও বলে উঠলেন—আপনি খাওয়া শুরু করুন।

ছোটকার মনে তখনও আতঙ্ক। সে কি আর সহজে ল্যাংচায় মুখ দেয়! ওখান থেকে কেটে পড়তে পারলেই বাঁচে। তাই আমতা-আমতা

করতে লাগল।

এবার ভদ্রলোক বললেন—আপনি আমতা-আমতা কেন করছেন? কিছু ভাববেন না। আমার স্ত্রী বা মেয়ের ব্যাপারে কিছু চিন্তা করার নেই। ওরা এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। আমরা লোক খাওয়াতে খুব ভালোবাসি। আসলে আমার মেয়ে প্রথম দিকটায় একটু ঘাবড়ে গেছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে। স্ত্রী মেয়েকে খুব ভালোবাসেন বলেই ভয় পেয়েছিলেন।

—তবুও...

—এর মধ্যে তবুও-টবুও কিছু নেই। ভদ্রলোক স্ত্রী আর মেয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী, তোমাদের আপত্তি নেই তো?

ওরা দুজনে মাথা নাড়িয়ে জানাল—না।

ভদ্রলোক বললেন—এবার আপনি শুরু করুন।

ছোটকা খাওয়া শুরু করল। দেখতে দেখতে বাকি পঁচাত্তরটা ল্যাংচা টপাটপ শেষ করে ফেলল। সবাই হাততালি দিল। বাচ্চা মেয়েটা আর তার মা বেশি করে হাততালি দিল।

আর একটা ঘটনার কথা বলছি। ভোম্বলদা বলল, সেটা শুনলে বুঝবি ছোটকার কেরামতি।

আমি বললাম—বলে যাও। কেরামতিটা কার, তোমার না ছোটকার শোনার পর বুঝব।

ভোম্বলদা আমার কথায় কর্ণপাত না করে বলা শুরু করল ঃ একদিন কী হল জানিস, ছোটকা এক ফাইভ-স্টার হোটেলে বুফে-ডিনার খেতে গেছে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশটা আইটেম আছে ডিনারে। অর্থাৎ, পঞ্চাশ রকমের খাবার। কেউ তো আর পঞ্চাশটা আইটেম খায় না। খাওয়া সম্ভব নয়। যে যার পছন্দমতো পাঁচ-সাতটা আইটেম খায়। এর বেশি খেতেই পারে না। খাবে কী করে? শহুরে লোকের পেটে আর জায়গা কোথায়! ওষুধ খেয়ে খেয়েই তো পেট শেষ। সবাই তো আর ভোম্বল ঘোষ বা তার ছোটকা নয়।

ভোম্বলদার কথার মাঝখানেই আমি বলে উঠলাম—একেবারে

খাঁটি কথা। একখানা কথার মতন কথা বলেছ।

—থাম। গল্পটা বলতে দে। ছোটকা তো আর পাঁচ-সাতটা আইটেম খাওয়ার বান্দা নয়। উনপঞ্চাশ রকমের খাবার খাওয়ার পর পঞ্চাশ নম্বর আইটেম নিয়ে বসেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—পঞ্চাশ নম্বর আইটেমটা কী?

—পুডিং। একসাথে দু-খানা বড়ো প্লেট ভর্তি করে টেবিলে এনে বসেছে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—বড়ো প্লেট কেন? ডেজার্টের জন্যে তো আলাদা ছোটো প্লেট থাকে। তা ছাড়া দু-খানা প্লেট কেউ একসাথে নিয়ে বসে নাকি?

—ধুর ঘোড়াড্ডিম! তুই এত বকবক করলে তো গল্পই শেষ হবে না। যা বলছি তাই শোন। ছোটকা তো দু-খানা বড়ো প্লেট ভর্তি করে পুডিং নিয়ে বসেছে। এক প্লেট পুডিং শেষ করে অন্য প্লেটে যেই না হাত দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটা শব্দ—ধপাস্।

—মানে?

—মানে একজন মাড়োয়ারি মহিলা চেয়ার-ফেয়ার উলটে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হইহই রইরই ব্যাপার। 'মর গিয়া'—'মর গিয়া' বলে কাতরাচ্ছে মহিলা। দেখতে দেখতে লোকজন জড়ো হয়ে গেল মহিলার চারপাশে। সে এক দৃশ্য! ছোটকার পুডিং খাওয়া মাথায় উঠল। মহিলার স্বামী স্ত্রীকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। করলে কী হবে! সহজে কি ওই তিনমনি দেহটা তোলা যায়! অনেক কষ্টে তুলল। চেয়ারে বসে মহিলাটি বলল—'পানি'। ঠাণ্ডা জল খেয়ে একটু সুস্থ হলে কী হবে—বার বার কোমরে হাত দিয়ে কাতরাচ্ছে। মহিলাটির স্বামী আর সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—একে কি খাওয়া বলে! এ তো রাক্ষসের খাওয়া।

ছোটকার সঙ্গে ছিল তার বন্ধু। সে একজন বক্সার। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করল—রাক্ষস-টাক্ষস বলছেন কেন মশাই? আপনার স্ত্রী কি হাওয়া খেয়ে তিনমনি লাশ হয়েছে?

লোকটি রেগে ফায়ার। কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ম্যানেজার এসে থামান। ছোটকার কাছে এগিয়ে গিয়ে ম্যানেজার বললেন—আপনি পুডিং খান। দরকার হলে আমি আরও এনে দেব।

—তাতে কী হল? আমি জিজ্ঞেস করলাম. বেশি খেতে পারলেই কি ভালো মিষ্টির দোকান সব চেনা যায়?

—মানে? জিজ্ঞেস করল ভোম্বলদা।

—মানে হল, তোমার ছোটকা যে প্রচুর খেতে পারেন সেটা শুনলাম। কিন্তু সারা দেশের ভালো ভালো মিষ্টির যে খোঁজ রাখেন সে কথা তো বললে না।

—এটা কি বুঝিয়ে বলার দরকার আছে? যে শক্তিগড়ে গিয়ে ল্যাংচা খেতে পারে, ফাইভ-স্টারে ঢুকে ভালো ভালো খাবার খায়, সে তো রানাঘাটে গিয়ে পানতুয়াও খাবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

—সে তো অনেকেই খায়।

—অনেকের খাওয়ার সাথে ছোটকার খাওয়ার অনেক তফাত। অলি-গলিতে সেরা মিষ্টির খবর একমাত্র ছোটকাই রাখত।

—তা এখন রাখেন না?

—না রে।

—কেন?

—সে করুণ কাহিনী শুনে কী করবি?

—করুণ কাহিনী! বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ভোম্বলদা মুখ বেজার করে বলল—ডায়াবেটিস হয়েছে। এত বেশি সুগার যে রোজ ইনস্যুলিন নিচ্ছে বেচারা। সত্যি ছোটকার জন্যে দুঃখ হয়।

আমি বললাম—তোমার নিজের কথাও একটু ভাবো। এখন থেকে এত মিষ্টি খেয়ো না। এবার কমাও।

ভোম্বলদা আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল—ঠিকই বলেছিস। খুব বেশি মিষ্টি খাওয়া উচিত নয়। ওই দ্যাখ বড়ো বড়ো লাড্ডু, একটা খাওয়া না রে হুলো।

ত্রিকালদর্শী কাকাতুয়া

আজ ভোম্বলদার দিন। অর্থাৎ, ভোম্বলদার রূপকথা বলার দিন। ক্লাবে এসেছি আমরা অনেকক্ষণ। চিরকালের লেটলতিফ ভোম্বলদার এখনও পাত্তা নেই। আগের দিন বলেছে আজ নতুন রূপকথা শোনাবে—মানে সত্যি-সত্যিই রূপকথা। দারুণ মজার রূপকথা। আমরা সবাই উন্মুখ হয়ে বসে আছি সেই রূপকথা শোনার জন্যে।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঢুকল ভোম্বলদা। কীসের জন্যে ব্যস্ততা কে জানে!

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এত দেরি?

—আমরা ডায়মণ্ডহারবার যাব। সেই ব্যবস্থা এখন করে এলাম।

—তা হঠাৎ ডায়মণ্ডহারবার কেন যাব? আর যাবই বা কার বাড়িতে?

—রাজবাড়িতে যাব। খাওয়াদাওয়া ফ্রি। গাড়ি করে নিয়ে যাবে। আমার দিকে তাকিয়ে ভোম্বলদা বলল, কী বুঝলি?

টুলো জবাব দিল—তুমি আগে রূপকথা বলো। যা বোঝবার পরে বুঝব।

—তবে শোন। বলে ভোম্বলদা শুরু করল ঃ

একালের নয়, সেকালের কথা। তখন রাজারা নিজেরাই রাজত্ব চালাতেন। তাঁদের থাকত জমকালো দরবার। মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র-মিত্র প্রমুখ রাজাদের ঘিরে আসর জমিয়ে বসত। থাকত প্রচুর লোকলস্কর, সৈন্য-সামন্ত। আর থাকত হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। এই হাতি-ঘোড়ায় চড়েই রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত।

সেই সময় পাশাপাশি দুটি রাজ্য ছিল। একটির নাম শান্তিগড়, আর একটির নাম বিজয়গড়

বিজয়গড়ের রাজা ছিলেন যেমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ, তেমনই চতুর। কারণে-অকারণে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন। বলতে গেলে প্রায় সব

যুদ্ধেই জয়ী হতেন। তাই তাঁর রাজ্যের নাম বিজয়গড়।

বিজয়গড়ের রাজার ছিল প্রচুর সৈন্য। হাতি-ঘোড়ায় বোঝাই ছিল হাতিশাল আর ঘোড়াশাল। সব সময় রণং দেহি ভাব। পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী-কোটাল সবাই দরবারে রাজার গুণগান করত। সবার মুখেই রাজার অসীম ক্ষমতার কথা। তাঁর রাজসভার সেকী জৌলুস!

শান্তিগড়ের রাজা ছিলেন খুবই শান্তিপ্রিয় মানুষ। যুদ্ধ-টুদ্ধর ধারে-কাছেও ঘেঁসতেন না। সব সময় শান্তিতে থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁর সৈন্য-সংখ্যাও খুবই কম ছিল। হাতি-ঘোড়াও বড়ো একটা ছিল না। রাজসভার জৌলুসও তথৈবচ। তবুও বিজয়গড়ের রাজা তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। প্রায়ই যুদ্ধের ভয় দেখাতেন। তিনি সব সময় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে ছুটে যেতেন।

হঠাৎ একদিন বিজয়গড়ের রাজা তাঁর মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—শান্তিগড়ের ব্যাপারে কী করা যায়, বলো তো মন্ত্রী?

মন্ত্রী আমতা আমতা করে বললেন—কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না মহারাজ!

রাজা বললেন—যুদ্ধের কথা উঠতে-না-উঠতেই শান্তিগড়ের রাজা ছুটে আসে সন্ধির জন্যে। ওকে জব্দ করা যায় কী ভাবে বলো তো?

মন্ত্রী বললেন—উনি তো খুব ভাল মানুষ মহারাজ। কী লাভ ওনাকে জব্দ করে?

রাজা রেগে লাল। মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার মুখেও ওই একই কথা—ভালো মানুষ।

—সবাই তাই বলে হুজুর। শুনেছি আশপাশের রাজারাও নাকি ওনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

—রাখো তোমার রাজাদের প্রশংসা। ওরা তো শান্তিগড়ের রাজার মতনই ভীতু। যুদ্ধের নাম শুনলেই কাঁপতে থাকে। ওদের কথার দাম কী?

মন্ত্রীর মুখে কথা নেই। ভয়ে জড়োসড়ো।

খানিকবাদে রাজা বললেন—রাজার কাজ কী জানো?

মন্ত্রী ফ্যালফ্যাল করে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রাজা বললেন—রাজার কাজ হচ্ছে যুদ্ধ করে রাজ্য বিস্তার করা।

এবার মন্ত্রী বললেন—মহারাজ, যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

—বলো।

—লোকে নাকি এখন যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়।

বিরক্ত হয়ে রাজা বললেন—ও সব ফালতু কথা। মানুষের পৃথিবীতে শান্তি... তুমি কি পাগল হয়েছ মন্ত্রী!

কথাটা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে রাজার মুখের দিকে মন্ত্রী তাকালেন। রাজা বললেন—মানুষের মনের মতন জটিল মন কোনো প্রাণীর নেই। মানুষের মতন ক্রূর জন্তু-জানোয়ারও নয়। আর এই মানুষের পৃথিবীতে শান্তি!

রাজা হেসে উঠলেন। মন্ত্রী মাথা নিচু করে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর রাজাই আবার বললেন—বুঝলে মন্ত্রী, রাজনীতিতে নীতি বলে কোনো কথা নেই। কাজে অষ্টরম্ভা হলেও মুখে মিষ্টি-মিষ্টি ভালো কথা বললেই সে ভালো।

মন্ত্রী বললেন—একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন হুজুর।

—তা খাঁটি কথাটা কি তুমি বুঝতে পেরেছ?

—পেরেছি মহারাজ।

—তা হলে শান্তিগড়ের রাজার কথাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। ওর ওই লোক-দেখানো ভালো ব্যবহারের কথা শুনে তুমিও ভুলে গেলে!

—অন্যায় হয়েছে মহারাজ।

—ঠিক আছে; তবে শান্তিগড়ের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।

—কেন হুজুর?

—যুদ্ধ ঘোষণা করলেই তো ও সন্ধির জন্যে ছুটে আসবে।

—তা অবশ্য ঠিক। তা হলে কী করবেন মহারাজ?

—বুদ্ধির খেলা খেলতে হবে। বুদ্ধির খেলায় শান্তিগড়ের রাজাকে জব্দ করব।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে মন্ত্রী বললেন—আমাকে কী করতে হবে, আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা খুব গোপনে মন্ত্রীকে কী যেন বললেন। মন্ত্রী বললেন—সত্যি এটা বুদ্ধির খেলা মহারাজ। শান্তিগড়ের রাজা এতে জব্দ হবেই। জয় আপনার অনিবার্য।

কয়েকদিন পরের কথা। শান্তিগড়ের রাজা দরবারে বসেছেন। মন্ত্রী-কোটাল, পাত্র-মিত্র বসেছে তাঁর চারদিকে। জমকালো আসর। রাজা কী যেন বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ বিজয়গড়ের রাজদূত এসে হাজির হলেন। রাজসভায় অনেকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। বিজয়গড়ের রাজা শান্তিগড়ের রাজার কাছে কেন দূত পাঠালেন—সবার মনে এই প্রশ্ন, কী সংবাদ নিয়ে এসেছেন দূত?

—সংবাদ শুভ। শান্তিগড়ের রাজপুত্রের সঙ্গে বিজয়গড়ের রাজা তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চান।

ঘাম দিয়ে যেন সবার জ্বর ছাড়ল। সবাই আনন্দে আত্মহারা।

রাজা বললেন—মন্ত্রী, আমি ভিতরে গিয়ে রানিকে শুভ সংবাদটা জানাই। তুমি দূতের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করো। হ্যাঁ, আর একটা কথা। একটু পরেই এই বিয়েতে আমাদের সম্মতির কথা জানিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি! সেই চিঠি তুমি বিজয়গড়ের রাজার কাছে পৌঁছে দেবে।

বিয়ের সংবাদ পেয়ে সবাই আনন্দে মেতে উঠল। মুখ ভার করে রইল শুধু রাজার পোষা কাকাতুয়াটা। রাজার মনে খটকা লাগল।

এই কাকাতুয়াটা রাজাকে আগে থেকেই সব ব্যাপার জানিয়ে দেয়। তাই রাজা এর নাম রেখেছেন ত্রিকালদর্শী। শুভ ব্যাপারে ত্রিকালদর্শী আনন্দে নেচে ওঠে। সবাইকে ডেকে ডেকে কত কথা বলে। আজ কিন্তু সে চুপচাপ। একমাত্র রাজাই ত্রিকালদর্শীর সঙ্গে সব ব্যাপারে কথা বলেন। ত্রিকালদর্শী সবার সঙ্গে কথা বললেও রাজা ছাড়া কারও সঙ্গে গোপন ব্যাপার নিয়ে কথা বলে না। আজ রাজার এত সুনাম এই কাকাতুয়াটির জন্যে। এর জন্যেই রাজা অনেক বিপদ-আপদ থেকে বেঁচে গেছেন। এ কথা রাজা ছাড়া আর কেউ জানে না।

রাজা ত্রিকালদর্শীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন—কী ব্যাপার বলো তো? রাজপুত্রের বিয়ে। তুমি আনন্দে নাচবে, গাইবে। তা তুমি এমন মনমরা হয়ে মুখ ভার করে আছো কেন?

কাকাতুয়া বলল—বিজয়গড়ের রাজা তোমাকে জব্দ করতে চায়।

রাজা বললেন—ওঁর মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন আমার ছেলের সঙ্গে। তা হলে আমাকে জব্দ করবেন কী করে? আর কেনই বা করবেন?

কাকাতুয়া তখন রাজাকে কাছে ডাকল। রাজার কানে-কানে কী যেন বলল। চমকে উঠলেন রাজা।

এদিকে বিয়ের দিন এসে গেল। শান্তিগড়ের রাজা বরযাত্রী নিয়ে রওনা হলেন। যেতে যেতে মন্ত্রীকে বললেন—সব ঠিক আছে তো?

মন্ত্রী বললেন—যে আজ্ঞে মহারাজ।

বিজয়গড় পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই সেকী অভ্যর্থনা! রাজবাড়ি লোকে লোকারণ্য। বাজি পুড়ছে, পটকা ফাটছে। বরযাত্রীদের জন্যে নানা রকম খাবার আসছে।

বিরাট বিয়ের সভা। সভায় বিজয়গড়ের রাজা বললেন—আমাদের একটা নিয়ম আছে। বিয়ের পর বউয়ের মুখ খোলা হবে তার শ্বশুরবাড়িতে।

শান্তিগড়ের রাজা বললেন—আমাদেরও এই ধরনের একটা নিয়ম আছে। বর বিয়ে করতে আসে ছদ্মবেশে। ছদ্মবেশ খোলা হয় তার নিজের বাড়িতে গিয়ে।

দুই রাজাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। দুই মন্ত্রীও।

ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল। রাজা বর-কনে নিয়ে দেশে ফিরলেন।

বিজয়গড়ের রাজা তাঁর মন্ত্রীকে বললেন—শান্তিগড়ের রাজাকে কেমন জব্দ করলাম বলো তো। দাসীর মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে হল। রাজপুত্তুরের বিয়ে হল এক দাসীকন্যার সঙ্গে। একেই বলে বুদ্ধির খেলা।

মন্ত্রীও রাজার কথায় সায় দিয়ে বললেন—আপনার অসাধারণ বুদ্ধি মহারাজ!

দুজনের সেকী হাসি!

বিজয়গড়ের রাজা আবার মন্ত্রীকে বললেন—এই বোকা রাজাটার তুমি প্রশংসা করছিলে! বলিহারি তোমার বুদ্ধি।

—অন্যায় হয়ে গেছে মহারাজ।

পরের দিন। রাজা আর মন্ত্রী—দুজনেই খুশিতে ডগমগ। বুদ্ধিহীন শান্তিগড়ের রাজার সমালোচনায় মুখর। এমন সময় রাজার বিশ্বস্ত এক কর্মচারী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল—হুজুর, সর্বনাশ হয়েছে।

রাজা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে?

—আমাদের কালীর বিয়ে হয়েছে এক চামারের ছেলের সঙ্গে।

—কী করে এটা সম্ভব হল? রাজা বললেন, তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের এখানকার কোনো লোক বিয়ের আগে শান্তিগড়ের রাজাকে সব বলে এসেছিল।

কর্মচারীটি বলল—আমি শুনেছি হুজুর, শান্তিগড়ের রাজার নাকি একটা পোষা কাকাতুয়া আছে। সেটা ত্রিকালদর্শী। সেই কাকাতুয়াটাই

রাজাকে সবকিছু বলে দেয়। তারই জন্যে শান্তিগড়ের রাজার এত সুনাম।

বিজয়গড়ের রাজা রেগে বললেন—মন্ত্রী, ওই ত্রিকালদর্শী কাকাতুয়াটা আমার চাই।

—পাবেন কী করে মহারাজ?

—মানে?

—কাকাতুয়াটা তো ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ—সবই আগে থেকে টের পেয়ে যায়।

—ঠিক আছে। আমাদেরও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। দরকার হলে যাদুকর পাঠাব। যাদুমন্ত্রে কাজ উদ্ধার করতে হবে। তাতে না হলে শান্তিগড় আক্রমণ করব।

—অপরাধ নেবেন না মহারাজ। মন্ত্রী বললেন, যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

—বলো।

—শান্তিগড়ের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ না করে বরং বন্ধুত্ব করা ভালো।

—ওই অপদার্থ রাজার সাথে বন্ধুত্ব করে লাভ কী?

—লাভ আছে মহারাজ। শান্তিগড়ের রাজার খুবই সুনাম। ওঁর শত্রু নেই বললেই চলে। ওনার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিলে কাকাতুয়াটা আপনি পেয়ে যাবেন।

রাজা বললেন—ও রকম কাকাতুয়াটা কি কেউ হাতছাড়া করে? তা ছাড়া ওর ছেলে তো ওরই মতন ভীরু কাপুরুষ হবে।

—না মহারাজ। শান্তিগড়ের রাজকুমার দারুণ সাহসী। তাকে জামাই হিসেবে পেলে আপনার লাভই হবে।

—তুমি কী করে বুঝলে?

—সেবার রাজকুমারীকে দস্যুরা যখন নদীর ঘাটে আক্রমণ করে তখন তো শান্তিগড়ের রাজকুমারই রক্ষা করেছিলেন আমাদের

রাজকুমারীকে। তখন দেখেছিলাম তাঁর তেজোদ্দীপ্ত রূপ, দুর্জয় সাহস আর বীরত্ব। একাই সাত-সাতটা দস্যুর সাথে লড়ে তাদের হটিয়েছিলেন।

—সে কথা তো আমিও জানি। কিন্তু কে সেই ছেলেটি তা জানতে পারিনি। তুমি জানলে কী করে ওই ছেলেটিই শান্তিগড়ের রাজপুত্র?

—গতবছর আপনি যখন আমাকে শান্তিগড়ে পাঠিয়েছিলেন তখনই আমি সেখানে রাজপুত্রকে দেখে চিনতে পেরেছিলাম। এবং রাজকুমারের সঙ্গে কথা বলে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

—সে কথা আমাকে বলোনি কেন?

—কোন সাহসে বলব মহারাজ? আপনি তো শান্তিগড়ের রাজার নামই সহ্য করতে পারেন না।

—ঠিকই বলেছ মন্ত্রী। সত্যি চারদিকেই শান্তিগড়ের রাজার সুনাম। আজকাল যুদ্ধ বড়ো একটা কেউ চায় না। যুদ্ধবাজদেরও ভালো চোখে দেখে না। সবাই চায় শান্তি।

মন্ত্রী মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে রাজার দিকে তাকিয়ে বলেন—মহারাজ!

রাজা বলেন—মন্ত্রী, কালই তুমি শান্তিগড়ে চলে যাও। শান্তিগড়ের রাজার সাথে দেখা করে এই বিয়ের প্রস্তাব দাও।

রাজার আদেশে পরের দিনই বিজয়গড়ের মন্ত্রী শান্তিগড়ে চলে আসেন। শান্তিগড়ের রাজার কাছে সে সংবাদ পৌঁছতেই তিনি শঙ্কিত-বিচলিত। বিজয়গড়ের রাজা তো একনম্বরের যুদ্ধবাজ। হয়তো অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে শান্তিগড়কে জব্দ করতে চান। দেখাই যাক না কী সংবাদ এনেছে বিজয়গড়ের মন্ত্রী।

রাজদরবারে বসলেন রাজা। হাজির হলেন সেখানে বিজয়গড়ের মন্ত্রী। বিজয়গড়ের রাজার মনের কথা খুলে বললেন তিনি শান্তিগড়ের রাজাকে। রাজামশাই নাকি এবার সত্যিই বিজয়গড়ের রাজকুমারীকে শান্তিগড়ের রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। রাজসভায় সবার

মনে তখন সন্দেহ। বিজয়গড়ের রাজাকে তারা হাড়ে-হাড়ে চেনে। আগের বার এই ভাবেই ঠকানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি শান্তিগড়ের রাজাকে। তাই সবার মুখ ভার।

শান্তিগড়ের রাজা সবাইকে বললেন—তোমরা মুখ ভার করে আছো কেন? এ তো শুভ সংবাদ—খুশির ব্যাপার।

বিজয়গড়ের মন্ত্রী শান্তিগড়ের রাজাকে বললেন—রাজামশাই, আমাকে তো আজই ফিরে যেতে হবে। বিয়ের ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে পারলে খুবই ভালো হয়।

রাজামশাই বললেন—আমাকে একটু সময় দিন।

বিজয়গড়ের মন্ত্রী বললেন—তথাস্তু।

দরবার ছেড়ে রাজামশাই অন্দরমহলে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে রাজা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এসে বিয়েতে তাঁর সম্মতি জানলেন। শুভ সংবাদ নিয়ে বিজয়গড়ের দিকে রওনা হলেন মন্ত্রী।

সভাসদ্‌দের উদ্দেশে রাজা বললেন—আমি কেন ভেতরে গেছিলাম সে কথা তোমাদের বলি। আমার একটি পোষা কাকাতুয়া আছে। কাকাতুয়াটি ত্রিকালদর্শী। তার মতামত জানার জন্যেই ভেতরে গেছিলাম। আগের বার তার কাছ থেকেই বিজয়গড়ের রাজার ছল-চাতুরি জানতে পেরেছিলাম।

শান্তিগড়ের রাজসভায় কাকাতুয়াটিকে আনা হল। আনন্দে মেতে উঠল সবাই। এতদিন পরে এই প্রথম কাকাতুয়াটির কথা রাজা সবাইকে জানালেন। এবং সমস্ত ব্যাপার খুলে বললেন। এর জন্যেই শান্তিগড়ের শান্তি বিঘ্নিত হয় না।

রাজসভায় সবাই তখন আনন্দে আত্মহারা। একে-একে অনেকে কাকাতুয়াটির কাছে এসে তাকে আদর করতে লাগল। কাকাতুয়া বলে উঠল—এবার ভালো হবে—ভালো হবে।

সবাই খুশিতে ডগমগ।

ভক্তিই শক্তি

ভোম্বলদা বলল—অনেক দিন পরে রূপকথা বললাম। আর একটা শুনবি?

আমরা সবাই একবাক্যে বললাম—হ্যাঁ।

আবার শুরু করল ভোম্বলদা ঃ

অনেক অনেক দিন আগের কথা। নিঃসন্তান এক ব্রাহ্মণ দম্পতি শক্তিগড়ের রাজার কাছে এসে নিজেদের দুঃখের কথা বলে। আয়-টায় কিছু নেই। ঠিকমতো খাওয়া জোটে না। যজমান-টজমানও বড়ো একটা নেই। দুটি গেলাস আর দুখানি থালা ছাড়া সম্বল মাত্র একটি ছেঁড়া কম্বল। রাজামশাই যদি দয়া করে তাদের আশ্রয় দেন তো তারা বেঁচে যায়। রাজবাড়িতে ব্রাহ্মণ গৃহদেবতার নিত্য পুজো-আচ্চা করবেন। বিনিময়ে শুধু একটু থাকা-খাওয়া। ব্যস, এর বেশি কিছু তাদের চাই না।

রাজা বলেন—আমার তো পুরোহিত আছে। পুজো-আচ্চা সব তিনিই করেন। তবুও আমি দেখি আপনার জন্যে কি করা যায়। আপনি এখন বিশ্রাম করুন। সময়মতো আপনাকে ডেকে পাঠাব। বলে রাজা মন্ত্রীকে ডেকে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে ভিতরে চলে যান।

রাজসভা বসার একটু আগেই রাজামশাই রাজপুরোহিতকে ডেকে পাঠান। আলাদাভাবে তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণ দম্পতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। রাজা বলেন—ঠাকুরমশাই, আপনার বাড়ির পাশে আমি ওঁদের কিছুটা জায়গা দিতে চাই। আপনার গ্রামে তো আপনি ছাড়া আর কোনো ব্রাহ্মণ নেই। তাই আপনার কাছেই ওঁদের থাকা ভালো।

রাজপুরোহিত ছিলেন যেমন চতুর তেমনই হিংসুটে। নিজের ধান্দা

ছাড়া কিছু বুঝতেন না। পুজো-আচ্চায় ফাঁকিবাজি করতেন। তাই তিনি নিজে কাছাকাছি কোনো ব্রাহ্মণকে রাখতে ইচ্ছুক নন। আমতা-আমতা করে রাজপুরোহিত বলেন—ক্ষমা করবেন মহারাজ, আপনার অনুমতি পেলে আমি একটা কথা বলতে পারি।

—বলুন।

—গ্রামের দুই প্রান্তে দুজন ব্রাহ্মণ থাকলে কেমন হয়?

রাজা বলেন—মন্দ কী! তবে গ্রামের শেষ প্রান্তে বিরাট জঙ্গল। ওখানে শিয়ালের উৎপাত, সাপ-খোপের ভয়... এমনকী শোনা যায় ভূত-টুতও আছে। গরীব ব্রাহ্মণ কি ওখানে থাকতে পারবেন?

পুরোহিত বলেন—না পারার কী আছে? সত্যিকারের ব্রাহ্মণের কাছে ভয়-টয় বলে কিছু নেই মহারাজ।

রাজা বলেন—তা ঠিক।

গরীব ব্রাহ্মণের থাকার ব্যবস্থা হয় গ্রামের শেষ প্রান্তে ওই জঙ্গলের পাশে। রাজা ব্রাহ্মণ দম্পতিকে মাত্র এক বিঘা জমি দান করেন আর একখানি কুঁড়েঘর তৈরি করে দেন। রাজা ব্রাহ্মণকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন—এতে আপনার চলে যাবে তো?

ব্রাহ্মণ হাসিমুখে কৃতজ্ঞচিত্তে বলেন—হ্যাঁ মহারাজ! আপনি এক অসহায় পরিবারকে বাঁচালেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

সামান্য এক বিঘা জমির ফসলে কি আর দুটো পেট চলে! তা ছাড়া গ্রামে বা আশপাশের কোনো গ্রামে একটি যজমানও জোটেনি। সর্বত্রই রাজপুরোহিতের ছেলেরা যজমানি করে। ফলে খুব দুঃখ-কষ্টে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর দিন কাটে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। একেবারে খাঁটি ব্রাহ্মণ। তিন সন্ধ্যা তপজপ করেন। দিনরাত মুখে শুধু উঠতে বসতে নারায়ণ নাম। কোথাও যেতে হলে নারায়ণ নাম। হাঁটতে হাঁটতেও নারায়ণ নাম। কিন্তু তবুও ব্রাহ্মণ যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই আছেন। দুঃখ-

কষ্টের কোনো অবসান হয় না।

একদিন দুপুরে ব্রাহ্মণ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং বিষ্ণু তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'আমি তোমার বাড়ির পাশের জঙ্গলে আছি। তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চল।'

চঞ্চল হয়ে উঠে ব্রাহ্মণ বললেন—আমার এই ভাঙা কুঁড়েঘরে তোমাকে কোথায় রাখব? কী ভাবে সেবা করব? সে শক্তি আমার কোথায়?

—ভক্তিই শক্তি। তুমি আজ সন্ধেবেলায় জঙ্গলে এস।

ঘুম ভেঙে গেল ব্রাহ্মণের। কিন্তু সত্যি-সত্যিই তিনি সন্ধেবেলায় ওই বিপদসঙ্কুল অরণ্যে ঢুকলেন। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই হঠাৎ অন্ধকার অরণ্য ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভেসে গেল। নারায়ণ... নারায়ণ বলে ব্রাহ্মণ একটু এগোতেই দেখেন এক টুকরো পাথরের উপর একটা বিষধর সাপ ফণা মেলে আছে। ভালো করে দেখেন ওটা সামান্য পাথর নয়, শালগ্রাম শিলা। ব্রাহ্মণ বুঝলেন এখানেই তিনি তাঁর বিষ্ণুনারায়ণের সন্ধান পাবেন। মুহূর্তে সাপ উধাও। হঠাৎ শালগ্রাম শিলার উপর বিষ্ণুমূর্তি জ্বলজ্বল করে উঠল। ব্রাহ্মণ হাতজোড় করে মূর্তির দিকে এগোতেই মূর্তি অন্তর্হিত। তিনি তখন সেই শালগ্রাম শিলা বাড়িতে এনে স্থাপন করেন। সারা রাত চোখ বুজে পুজো করেন। হঠাৎ তাঁর কানে ভেসে আসে দৈববাণী—'তোমার সামনে একটি ছোট্ট শিলা আছে। ওই শিলা হাতে নিয়ে তুমি যা চাইবে তা-ই পাবে।' ব্রাহ্মণ চোখ খুলে দেখেন সত্যি তাঁর সামনে একটুকরো শিলা পড়ে আছে। নারায়ণ... নারায়ণ বলে সেই ছোট্ট শিলাখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করেন ব্রাহ্মণ।

প্রথমেই চাইলেন তনি একটি পাকা বাড়ি। দেখতে দেখতে কুঁড়েঘর রাজপ্রাসাদের মতন সুন্দর হয়ে উঠল। ধন-জন, দাস-দাসী, সব হল ব্রাহ্মণের। সবাই অবাক।

হঠাৎ একদিন রাজা ডেকে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করেন—ঠাকুরমশাই, আপনি রাতারাতি এত সব করলেন কী করে?

ব্রাহ্মণ বলেন—সবই নারায়ণের দয়া।

রাজা আর কথা বাড়ান না। কেননা, তিনি নারায়ণভক্ত। কিন্তু রাজপুরোহিত তলে-তলে সন্ধান করে আসল ব্যাপারটা ধরে ফেলেন। তিনি আর লোভ সামলাতে পারেন না। শিলা টুকরো চুরি করার জন্যে একদিন রাত্রে তিনি ব্রাহ্মণের বাড়িতে আসেন। যে ঘরে শালগ্রাম শিলার সামনে ওই ছোট্ট শিলা টুকরো রাখা ছিল সেখানে আস্তে আস্তে ঢোকেন। দরজাটা ভেজিয়ে যেই না শিলা টুকরো নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন অমনি শালগ্রাম শিলার পিছন থেকে এসে একটা বিষধর সাপ ছোবল মারে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যান রাজপুরোহিত। চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। সবাই বলল যেমন কর্ম তেমন ফল। পরে এই ব্রাহ্মণকে ডেকে রাজামশাই রাজপুরোহিত করেন। ব্রাহ্মণের পুণ্যের জোরে রাজার রাজত্বও দিনকে দিন বাড়তে থাকে।

আমরা সবাই হাততালি দিয়ে বলে উঠলাম—ভেরি গুড—ভেরি গুড। দারুণ সুন্দর রূপকথা বলেছ ভোম্বলদা।

ভোম্বলদা বলল—ডায়মণ্ডহারবার রাজবাড়িতে যাবি তো সবাই?

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কবে?

ভোম্বলদা বলল—কালই। রাজবাড়ি বলে কথা!

টুলো বলল—রাজবাড়ির রাজকীয় খাবার কি ছাড়া যায়!

আমি বললাম—তা হলে তো ভোম্বলদার সারা রাত ঘুমই হবে না।

ভোম্বলদা আমাকে চোখ মেরে বলল—মনের কথাটাই বলেছিস রে হুলো। শুনেছি সাত রকমের মাছই নাকি হবে।

ঢোল গোবিন্দ বলল—মাত্র?

ভোম্বলদা হনুমানের মতো দাঁত খিঁচিয়ে বলল—তুই চুপ কর।

ভেড়িতে ভয়ানক কাণ্ড

মাঘ যাই-যাই করছে। তবুও বসন্তের দখিনা হাওয়ার দেখা নেই। তার বদলে আকাশে মেঘের আড়াল। মাঝেমধ্যে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি। কখনও আবার মেঘ সরিয়ে সূর্যদেবের এক-আধ ঝলক মুচকি হাসি। শীত গিয়েও যাচ্ছে না। বেশ কয়েকদিন ধরেই এরকম আবহাওয়া চলছে সারা কলকাতায়। চলছে গোটা পশ্চিমবঙ্গে।

এরই মধ্যে আবার আজকের দিনটার মতিগতি বর্ষার দুরন্ত ঢলের দিকে। দিনের চেহারা দেখে বোঝা মুশকিল, এটা মাঘের শেষ না আষাঢ়স্য প্রথম দিবস। আবহাওয়া অফিস বলছে, এটা নিম্নচাপের খেলা।

আজ অবশ্য এই খেলাটা বেশ জমে উঠতে পারে বলে মনে হয়। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। মাঝে মাঝে ইলশেগুঁড়ি ঝরছে। কখন যে আবার আকাশ ফুটো হয়ে চারদিক ভাসাবে, কে জানে! অথচ আজ আমার ভেড়িতে যাওয়ার দিন। যেতেই হবে। কলকাতা থেকে বারাসাত হয়ে যেতে হবে সর্দারহাটি। ওই অঞ্চলেই আমার ভেড়ি। কলকাতা থেকে সর্দারহাটির দূরত্ব বড়ো একটা কম নয়। পঞ্চাশ কিলোমিটারের মতো। দূরত্ব যাই থাক আর যত জোরেই বৃষ্টি হোক—ভেড়িতে আজ না গেলেই নয়। কাল ভেড়ির গোই খোলার দিন। ভোর থেকেই তোড়জোড় শুরু করতে হবে।

এবার গোই সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। নদী আর ভেড়ির সঙ্গে যুক্ত খালকেই গোই বলে। ভেড়ি থেকে নদী পর্যন্ত মাটি কেটে এই খাল তৈরি করা হয়। ছোট্ট খাল। সেই খাল দিয়ে জোয়ার-ভাটার জল ওঠা-নামা করে ভেড়িতে। খালেরই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁশের পাটা মেরে পাতা হয় বিত্তি বা মাছ ধরার যন্ত্র। বাগদা চিংড়ির বাচ্চা ভেড়িতে ছাড়ার পর গোইয়ের মুখ আটকে জল ওঠা-নামা বন্ধ করা

হয়। না হলে পাটার ফাঁক দিয়ে বাগদার বাচ্চা বেরিয়ে যায়। মাস তিনেক সময় লাগে প্রমাণ সাইজের বাগদা হতে। এবার কিন্তু আড়াই মাসে আমার ভেড়ির বাগদা তৈরি হয়ে গেছে। তাই দিন পনেরো আগেই গোই খুলতে যাচ্ছি। মনে হয় এত আগে অন্য কোনো ভেড়ির গোই খোলা হবে না। সাধারণত হয় না।

পূর্ণিমায় আর অমাবস্যায় বাগদা চিংড়ি ধরা পড়ে। কাল পূর্ণিমার ভরা কোটাল। তাই কাল গোই খুলতে না পারলে তৈরি বাগদার ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু আকাশের চেহারা দেখে মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টি হলেই বাগদা তেমন একটা ধরা পড়বে না। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়!

এবার আমার সঙ্গে ভেড়িতে যাচ্ছে ভোম্বলদা আর খলশে। গোয়েন্দা ভোম্বলদার নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট খলশে।

খলশে—খলশে মাছের মতো সুন্দর। প্যান্টের ওপর রংচঙে টি-শার্ট পরে বেশিরভাগ সময়। ওর চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। দারুণ স্মার্ট। এক কথায় খলশে ভোম্বলদার যোগ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট।

ইদানীং ভোম্বলদার মধ্যে বেশকিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। গোয়েন্দাগিরিতে কয়েকবার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। প্রশংসাও কুড়িয়েছে খাই-খাই স্বভাবটাও অনেক কমেছে। তবে খাওয়ার পরিমাণ কমেনি। তবুও ভোম্বলদা সঙ্গে থাকলে মনের জোর বাড়ে।

তাই গোই খোলার দিনই ভোম্বলদাকে ভেড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। কেননা, দিনকে দিন ভেড়ির ঝামেলা বেড়েই চলেছে। চুরি-ডাকাতি, খুনখারাপি তো লেগেই আছে। তারপর আছে মাস্তানদের উপদ্রব। কখন যে কী হয় বলা মুশকিল। বিশেষ করে আমার ভেড়ি দেখে অনেকেরই চোখ টাটায়। গত বছর এই তল্লাটে আমার ভেড়ি ছিল একনম্বরে। সবচেয়ে বড় সাইজের বাগদা (টাইগার-সাইজ) হয়েছিল প্রচুর। এবারও বোধহয় সবার আগেই আমার ভেড়ির গোই খোলা

হচ্ছে। টাইগার-সাইজের বাগদা এ বছরও বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে। ক্ষতি করার লোকের তো আর অভাব নেই। তাই সজাগ থাকতে হবে। কার মনে কী আছে বলা যায় না।

বেলা তখন চারটে। ভোম্বলদা আর খলশেকে নিয়ে সাদা মারুতিতে চেপে রওনা হলাম আমরা ভেড়ির উদ্দেশ্যে। এবার অবশ্য স্টিয়ারিং-এ আমি নেই। গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল বর্ষণ। বর্ষণ বলে বর্ষণ। প্রবল বর্ষণ। বর্ষার বৃষ্টিও হার মেনে যায় এই অকালবর্ষণের কাছে।

হঠাৎ খলশে বলল—ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।

খলশের কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—তুই খনার বচনে বিশ্বাস করিস নাকি রে খলশে?

—বোগাস। খনার বচন বিশ্বাস করতে যাব কোন দুঃখে। যুগের সঙ্গে তাল রেখে গোয়েন্দাদের চলতে হয়। ওই সব আদ্যিকালের বচন-টচন মানতে গেলে গোয়েন্দাগিরি লাটে উঠে যাবে।

—তা হলে খনার বচন তুললি কেন?

—আসলে তোর ভেড়িতে বাগদা হয়েছে প্রচুর এবং মাঘের শেষে বৃষ্টিও হচ্ছে মুষলধারে। তাই হঠাৎই কথাটা মনে হল।

—সে হিসেবে কথাটা ঠিকই বলেছিস। আমি বললাম, তবে মাঘের শেষে বৃষ্টি মানে বাগদার ভেড়ির বিরাট ক্ষতি।

—ক্ষতি কেন? জিজ্ঞেস করল খলশে।

আমি বললাম—প্রথমত, বৃষ্টির ঠাণ্ডা জল ভেড়িতে পড়লে বাগদা বসে যায়। গরম বা স্বাভাবিক জলে বাগদা চিংড়ি যেমন ধরা পড়ে ঠাণ্ডা জলে তেমন পড়ে না। দ্বিতীয়ত, বৃষ্টির মধ্যে ভেড়ির পাড় দিয়ে ঠিকমতো চলাফেরা করা যায় না। সে জন্য পাহারা বেশ কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে চোর-ডাকাতের উপদ্রব বাড়ে। তা ছাড়া

লোকজনের ঘুমও বাড়ে।

—মাছ চুরি কি শুধু বৃষ্টির সময় হয়?

—না, না। শুধু বৃষ্টির সময় কেন, অন্য সময়ও হয়। তবে বৃষ্টির সময় বেশি হয়।

—কাগজে মাঝে মাঝে ভেড়িতে খুনের খবর বেরোয়। খুনখারাপি তো ভেড়িতে লেগেই আছে, তাই না?

—তা আছে।

—এত সব ঝক্কি-ঝামেলা নিয়ে কী দরকার রে হুলো তোর ভেড়ি করার?

—দরকার আছে। গাড়িতে উঠে এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর এই প্রথম ভোম্বলদা কথা বলল—বলিহারি তোর বুদ্ধি খলশে।

—এ কথা বলছ কেন? খলশে জিজ্ঞেস করল।

—এই জন্যে বলছি যে, ঝামেলা ছাড়া কোনো ব্যবসা আছে নাকি?

খলশে ভোম্বলদার মুখের দিকে চেয়ে বলল—তা অবশ্য নেই।

—তা হলে তোর কথাটার কোনো মানেই হয় না। এরকম অর্থহীন কথা একজন গোয়েন্দার মুখ থেকে বেরোবে কেন? গোয়েন্দাগিরি করা মানেই ঝামেলার মধ্যে ঢোকা। তাই না?

—রাইট। খলশে বলল, কিন্তু আমার বক্তব্য হল এত ঝক্কি-ঝামেলার ব্যবসা ছাড়াও তো অনেক ব্যবসা আছে। হুলোর তো অন্য ব্যবসা করার বহু সুযোগ-সুবিধে রয়েছে।

ভোম্বলদা বলল—তা থাক। ঝক্কি-ঝামেলা ছাড়া কি মানুষ চলতে পারে? লাইফ ইজ নট আ বেড অব রোজেজ। কী বুঝলি?

—ঠিকই বুঝেছি। তবে...

খলশের কথার মাঝখানেই ভোম্বলদা বলে উঠল, এই যে আমরা ভেড়িতে বাগদা-ধরা দেখতে আর টাইগার সাইজের বাগদা খেতে

যাচ্ছি—কোনো ঝামেলায় যে পড়ব না, তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে?

খলশে কী যেন একটা বলতে যাচ্ছে দেখে আমি আড়চোখে ভোম্বলদার দিকে তাকালাম। বললাম—ছাড়ো তো তোমাদের ঝামেলা-টামেলার কথা। যাচ্ছি একটা শুভ কাজে আর তোমাদের মুখে শুধু অশুভ কথা। জানো তো অনেক সময় মুখের কথা ফলেও যায়।

খলশে বলল—ঠিকই বলেছিস। সত্যিই তো একে এই বৃষ্টি, তার উপর আবার কাল ভেড়ির গোই খোলা। রীতিমতো টেনশন। সুতরাং নো মোর চুরি-ডাকাতি খুনখারাপির কথা।

ভোম্বলদা বলল—খলশে, তোর হল কী আজ?

—কেন ভোম্বলদা? খলশে জিজ্ঞেস করল।

—গোয়েন্দাদের কি কোনোরকম কুসংস্কার মানা উচিত?

—না।

—তা হলে তুই এ সব কথা বলছিস কী করে? ভোম্বলদার গলায় বিরক্তির সুর।

খলশে বলল—আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি তো এখানে গোয়েন্দাগিরি করতে আসিনি। এসেছি হুলোর ভেড়ির গোই খোলা দেখতে। এটা তো একটা শুভ কাজ। এ ব্যাপারে ওর সেন্টিমেন্টের দিকটাও দেখার আছে।

—তা হলে ঠিক আছে। তবে কথায় কী যায়-আসে রে হুলো। যা ঘটার তা ঘটবেই। তাই না?

—তা ঠিক। আমি বললাম, তবুও মনের মধ্যে কেমন যেন খচখচ করে।

—বাদ দে ও সব কথা। কাল কখন তোর ভেড়ির গোই খুলবি?

—জোয়ার আসার ঘণ্টাখানেক পরে।

—ঘণ্টাখানেক পরে কেন?

—তখন জলের চাপটা খুব বেড়ে যায়। জলের চাপ যত বাড়ে মাছও তত গোইমুখে এগিয়ে আসে। আর গোই খোলার দিনে প্রথম জোয়ার পেয়ে বাগদা পাগলের মতন ছুটে আসে। ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে গোইয়ে পাতা বিত্তির মধ্যে পড়ে।

—তা আগের বারও তো গোই খোলার সময় এসেছিলাম। তখনও কি এই ভাবেই গোই খোলা হত?

—সেকী, তোমার মনে নেই?

—আরে বাবা, অত কারও মনে থাকে নাকি!

—এবার জোয়ার এলে ভাল করে দেখবে।

—তা জোয়ারটা আসবে কখন?

—সন্ধে সাতটা নাগাদ।

হঠাৎ ভোম্বলদা বলল—দিনেও তো জোয়ার আসে। দিনের জোয়ারেও তো গোই খোলা যেতে পারে।

—তা পারে। তবে দিনের চেয়ে রাতে মাছ অনেক বেশি ধরা পড়ে। আর রাতে গোই খোলাটাই নিয়ম।

—ভেরি গুড। ভোম্বলদা বলল, জ্যোৎস্না রাতে বিত্তিতে বাগদা-পড়া দেখতে দারুণ লাগে রে খলশে।

খলশে বলল—বৃষ্টিটা থামলে তো চাঁদনি রাতের আনন্দটা উপভোগ করব। না হলে সবই মাঠে মারা যাবে।

—কথাটা মিথ্যে বলিসনি খলশে। আমি বললাম, এরকম বৃষ্টির মধ্যে বাগদা ধরার বারোটা বেজে যাবে।

ভোম্বলদা বলল—কী যে বলিস তোরা! এটা তো আর বর্ষার বৃষ্টি নয়, মাঘের বৃষ্টি। এরই মধ্যে অনেকটা কমে এসেছে। রাতেই হয়তো থেমে যাবে।

সত্যি বৃষ্টি অনেকটা কমেছে। আমরাও ভেড়ির অঞ্চলের

কাছাকাছি এসে গেছি। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় সামনেই ভেড়ির জল চিকচিক করছে।

হঠাৎ খলশে বলল—এত জল কিসের রে হুলো?

—ভেড়ির।

তা হলে আমরা ভেড়ির কাছে এসে গেছি।

—প্রায়।

—প্রায় মানে? খলশে জিজ্ঞেস করল, ওই তো জল দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে তোর ভেড়িটা কত দূরে?

—আরও দু-কিলোমিটার।

ভোম্বলদা বলল—তা হলে তো এসেই গেছি।

—তা বলতে পারো বলে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল ভেড়ির পাড়ের এঁটেল মাটির কথা। এঁটেল মাটির কাদা খুবই মারাত্মক। আর সেই কাদার মধ্য দিয়েই ভেড়ির পাড় ধরে অন্তত দু-কিলোমিটার হেঁটে যেতে হবে। তারপর আমার ভেড়ি। হাঁটু প্রমাণ এই কাদা ঠেলে হাঁটা যে কী মারাত্মক ব্যাপার, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। এ সত্য জানে ভোম্বলদা নিজেও। অভ্যেস না থাকলে কারও পক্ষে এক পা-ও চলা সম্ভব নয়। অনভ্যস্ত কোনও লোকই দেহের ভারসাম্য রাখতে পারবে না। তারপর বৃষ্টি পড়লে তো কথাই নেই। তাই খলশের উদ্দেশে বললাম, তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি খলশে।

—কী কথা? খলশে জিজ্ঞেস করল।

—ভেড়ির রাস্তার কথা।

—মানে?

—মানে হল ভেড়ির পাড়। ভেড়ির পাড়ই ভেড়ির রাস্তা। পাড় ধরেই ভেড়িতে যেতে হবে।

খলশে বলল—যাব। তাতে অসুবিধে কী?

আমি বললাম—অসুবিধে বিরাট।

খলশে বলল—তা আগে থেকে বলিসনি কেন?

হঠাৎ ভোম্বলদা ধমকে উঠল খলশেকে। খলশে অবাক। অবাক আমিও।

ভোম্বলদা বলল—কী যে আজ তোর হয়েছে খলশে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—হঠাৎ এ কথা বলছ কেন?

—বলব না! তখন থেকে তুই শুধু ঝামেলা-অসুবিধে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস। ভেড়ির পাড় দিয়ে ভেড়িতে যাওয়ার অসুবিধে কী, তা শোনার আগেই চমকে উঠছিস। গোয়েন্দার কি ভয় পেলে চলে? তা অসুবিধেটা কী ওকে বুঝিয়ে বল তো হুলো?

—আসলে এই বৃষ্টিতে ভেড়ির পাড়ের অবস্থা একেবারে সঙ্গিন হয়। এঁটেল মাটির কাদার ভেতর দিয়ে হাঁটা খুবই কঠিন ব্যাপার। ভোম্বলদা তা জানে। প্রথমবার ভোম্বলদা যখন ভেড়িতে আসে তখন আছাড় খাওয়ার প্রায় সেঞ্চুরি করেছিল। পরে কয়েকবার আসার পর আস্তে আস্তে ভোম্বলদা রপ্ত করে ফেলে। তুই হাঁটতে পারবি তো?

—না পারার কী আছে?

অভ্যেস না থাকলে পারবি না। যত সহজ ভাবছিস তত সহজ নয়। ভোম্বলদার আছাড় খাওয়ার কথা তো শুনলি।

ভোম্বলদা বলল—তুই কি সবাইকে আমার আছাড় খাওয়ার কথা বলিস নাকি?

—ক্লাবের সবাই তো তোমার আছাড় খাওয়ার কথা জানে।

খলশে বলল—আমি জানি না। আমাকে একবার বলতে পারতিস।

—তবে শোন খলশে, একজন ডিটেকটিভের কী-কী শেখা দরকার, তা আমি সব শিখেছি। তোকেও শিখিয়েছি।

—সরি ভোম্বলদা।

—কোই বাত নেহি। ভোম্বলদা বলল, বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার ব্যাপার...ভালোই লাগবে দেখবি।

খলশে কী যেন একটা আবার বলতে যাচ্ছে, এমন সময় ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিল। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে তখন।

ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার?

আমি বললাম—আমরা এসে গেছি।

ভোম্বলদা বলল—ভেরি গুড।

গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম সবাই। পাশেই ছিল একটি ছোট্ট হাসপাতাল। ওখানকার সবাই আমার পরিচিত। বরাবরই হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডে গাড়ি রেখে আমি ভেড়িতে যাই। আজও তাই করলাম।

পাকা রাস্তার গা থেকেই ভেড়ি শুরু। আমার ভেড়ি অনেকটা ভিতরে। তাই পাকা রাস্তা ছেড়ে অন্য লোকের ভেড়ির পাড় ধরে রওনা হলাম আমার ভেড়ির দিকে। রাত তখন সন্ধে।

অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে গোটা অঞ্চলটা। পূর্ণিমা—শুধু নামেই পূর্ণিমা। মেঘে ঢাকা আকাশে চাঁদের দেখা নেই, কোথাও একটু জ্যোৎস্নার আলো নেই। বৃষ্টি কমে গেলেও পাগলা হাওয়ার মাতামাতি কমেনি। ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপছি সবাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেড়িতে পৌঁছে গেলাম আমরা। তবে খলশের জন্যে কিছুটা দেরি হয়েছে। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করেই আমি গোই খোলা নিয়ে আলোচনায় বসলাম ভেড়ির লোকজনের সঙ্গে।

কথায় কথায় ভেড়ির ম্যানেজার তপন বলল—দুখানা বিত্তি কিন্তু তৈরি হয়নি বাবু।

—কেন?

—গজুকে জিজ্ঞেস করুন।

গজু আমার ভেড়ির জিমনি। জিমনি মানে মৎস্য-বিশারদ। এই

মৎস্য-বিশারদের উপরই ভেড়ির সবকিছু নির্ভর করে। জল তোলা-নামানো, মাছ ধরা-ছাড়ার ব্যাপারে জিমনিই সব। মাছ ধরার যন্ত্রপাতি তৈরি করেও সে। এমনকী ভেড়ির কোথায় কেমন পাহারার দরকার, তা-ও ঠিক করে এই জিমনি। এক কথায় ভেড়ির সব দায়িত্বই জিমনির উপর। তাই অসন্তুষ্ট হয়ে গজুর দিকে তাকালাম। গজুও কটমট করে তপনের দিকে তাকিয়ে বলল—কথাটা বাবুকে না বললে কি তোমার পেটের ভাত হজম হচ্ছিল না তপনদা?

—কেন বলব না? দিন পনেরো ধরে তোমাকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। তুমি কাজ ফেলে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছ। আর লোক দেখলে গল্পে মেতে উঠছ। কাজটা আগে, না গল্পটা আগে?

—গল্প করি আর যা-ই করি আমার কাজটা তো আর তুমি করে দাও না। গজু বলল, তুমি কি বলতে চাও ভেড়ির প্রতি আমার দরদ তোমার চেয়ে কম?

তপন বলল—দরদের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে কাজের কথা।

—তুমি একাই কাজ করো। আমি কাজ করি না? আমি ফাঁকিবাজ হলে ভেড়িতে ভালো বাগদা হয় কি করে?

—সেটা কি তোমার একার জন্যে হয়েছে? আমি কী ভাবে খাটছি তা দ্যাখোনি?

গজু বলল—সবই দেখেছি।

—তবে?

—তবে আবার কী? আমি তো তোমার মতন বাহাদুরি দেখাতে যাচ্ছি না।

—এর মধ্যে বাহাদুরির কী আছে? তপন বলল, যা সত্যি বাবুকে তাই বলেছি।

—তুমি একাই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। আর সবাই মিথ্যেবাদী। বাবু আসতে-না-আসতেই তাই নালিশ করছ। এবার আমিও দেখাব মজা।

টের পাবে হাড়ে-হাড়ে।

উত্তেজিত হয়ে তপন বলল—কী করবে তুমি?

—সময়মতো দেখতে পাবে।

—ভয় দেখাচ্ছ?

—ভয় দেখানোর কী আছে! বিরক্ত গজু জবাবে বলল।

এতক্ষণ আমি দুজনের কথা কাটাকাটি শুনছিলাম। এবার ধমকে উঠলাম—চুপ করো। তোমাদের ব্যাপারটা কী বলো তো? দুজন বাইরের লোকের সামনে সমানে ঝগড়া করেই চলেছ!

গজু বলল—আমার কী দোষ, বলুন বাবু। তপনদাই আমার বিরুদ্ধে আপনাকে লাগাল।

সঙ্গে সঙ্গে কেউটের মতো ফোঁস করে উঠল তপন—বাজে কথা বোলো না।

—বাজে কথা কেন বলব! তুমি ইদানীং ভীষণ খিচখিচ করো।

—কাজের কথা বললেই খিচখিচ হয়।

গজু বলল—তা হলে আমিও বাবুকে বলি।

—বলো না।

—কী ব্যাপার বলো তো? আমি বললাম, এতদিন তো তোমাদের মধ্যে এ রকম ঝগড়াঝাটি দেখিনি। এখন তো দেখছি একেবারে সাপে-নেউলের ব্যাপার।

গজু বলল—হবে না কেন বাবু! তপনদার খিটিমিটির জন্যে আজ সকালেই এক কাণ্ড হয়ে গেছে।

—কী কাণ্ড?

—নকুলের সঙ্গে বিরাট ঝগড়া। সে তো রীতিমতো শাসিয়ে গেছে তপনদাকে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার তপন? নকুলের সঙ্গে ঝগড়া করলে কেন? ওর সঙ্গে তো আমাদের ভালো সম্পর্ক।

—ভালো সম্পর্ক হলে কী হবে! আমাদের ভেড়ির মাছ দেখে ও হিংসায় জ্বলছে। তলে-তলে অঞ্চলের মাতব্বর সুবলবাবুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে সামনের বছর ভেড়িটা যাতে আমাদের হাতছাড়া হয়।

আমি বললাম—তোমায় কে বলল?

তপন বলল—গোবিন্দ। পঞ্চায়েতের গোবিন্দ।

—আর কী বলল?

—আরও অনেক কথাই বলল। আমাদের পাশের ভেড়ির ভৈরববাবু নাকি মোটা টাকা দিয়েছে নকুল আর সুবলবাবুকে।

—কেন?

—সামনের বার যাতে উনি ভেড়িটা পান।

—সেকী! আমি বললাম, এরই মধ্যে! এখন তো সিজনই শুরু হয়নি।

তপন বলল—আসলে গত বছর ওঁর প্রচুর লোকসান হয়েছে। এবারও এখন পর্যন্ত তেমন মাছ দেখা যাচ্ছে না ওঁর ভেড়িতে। অথচ গত বছর আমরা প্রচুর লাভ করেছি। আর এ বছর শুরুতেই আমাদের ভেড়িতে টাইগার সাইজের বাগদা দেখা যাচ্ছে। তাই উনি সামনের বছর আমাদের ভেড়িটা পাওয়ার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। নকুল ওঁর হয়ে পঞ্চায়েতকে হাত করার চেষ্টা করছে।

—এই ব্যাপার! তা তুমি থাকতে এ নিয়ে আমি চিন্তা করি না। পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ মেম্বারই তো তোমাকে দারুণ ভালোবাসে। তুমি না থাকলে কি আর এই ভেড়ি আমি এত সহজে পাই!

—কী যে বলেন বাবু! তপন বিনয় প্রকাশ করল, আপনার মতন লোক পাবে না তো কি রাম-শ্যাম পাবে!

তপনের আন্তরিকতা আর প্রভুভক্তির তুলনা হয় না। গজুও খারাপ লোক নয়। তাই ওদের বিবাদ মিটিয়ে ঘুমোতে গেলাম।

পরের দিন। মেঘ কেটে গেছে। সকাল থেকেই আকাশের মুখে হাসি। হাসি আমাদের মুখেও।

রাত শেষ হতে-না-হতেই গজু বিত্তি বোনা শুরু করেছে। তপনও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে গোই খোলার ব্যাপারে।

এই ফাঁকে ভোম্বলদা আর খলশেকে নিয়ে আমি ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই এলাম আমরা নদীর পাড়ে গোই-মুখে। নদীর এখান থেকেই খাল কেটে তৈরি হয়েছে গোই। ভেড়ি থেকে নদীর দূরত্ব বড়োজোর একশো ফুট।

ছোট্ট নদী। তরতর করে বয়ে চলেছে। ভেসে আসছে পাখির গান পাশের গাছগাছালি থেকে। বইছে ভোরের মিষ্টি হাওয়া। সূর্যের মিষ্টি হাসিও ছড়িয়ে পড়েছে নদীর পাড়ে বৃষ্টি ধোয়া জঙ্গলের মধ্যে। আহা, কী সুন্দর! দারুণ লাগছিল।

ভোম্বলদা তো খুশিতে ডগমগ হয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল—একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দুও হার মেনে যায় এর কাছে।

খলশে বলল—একখানা কথার মতন কথা বলেছ ভোম্বলদা। কত জায়গা তো আমরা গোয়েন্দাগিরি করতে গেছি, কিন্তু এমন সুন্দর জায়গা কোথাও চোখে পড়েনি। এ তো দেখছি স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। খুব ভালো লাগছে।

—আমি তো এর আগেও এখানে এসেছি। অনেক সকালই দেখেছি। কিন্তু আজকের সকালটার রূপই যেন আলাদা।

আমি বললাম—তা হলে কাল বৃষ্টির মধ্যে অত কষ্ট করে এসে ঠকে যাওনি তোমরা, কী বলো?

ভোম্বলদা বলল—ঠকা! ঠকার তো প্রশ্নই ওঠে না।

খলশে বলল—এবার বুঝেছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী?

—তুই ভেড়িতে ঘন-ঘন কেন আসিস?

—কেন?

—আমার মতন অ-কবিরও এখানে কবিত্ব জেগে ওঠে। তুই তো লেখালেখি করিস। আর ভোম্বলদা তো কবি।

ভোম্বলদা বলল—এক্কেবারে খাঁটি কথা।

আমি বললাম—ঠিকই বলেছিস।

খলশে বলল—তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম হুলো। এখানে রাত আর দিনের তফাতটা বড্ড বেশি।

—মানে?

খলশে বলল—আমরা তো নানান জায়গায় গোয়েন্দাগিরি করতে যাই। তার মধ্যে বহু বিরক্তিকর বাজে জায়গাও থাকে। তবে এ রকম গা ছমছম-করা পাণ্ডববর্জিত জায়গা খুব কম মেলে। কাল রাতে খুবই বাজে লাগছিল। আজ সকালে অবশ্য বিপরীত চিত্র।

—ঠিক। আমি বললাম, অন্ধকারে ভেড়িতে সত্যি-সত্যিই গা ছমছম করে। তারপর বৃষ্টি হলে তো একেবারে ভয়াবহ পরিবেশ। তবে কাল তো আসলে পূর্ণিমা ছিল। বৃষ্টি আর মেঘে ঢাকা আকাশের জন্যে ও রকম মনে হচ্ছিল। আজ দেখবি আলাদা রূপ। জ্যোৎস্না রাতে ভেড়ির বিউটিই আলাদা।

হঠাৎ ভোম্বলদা বলল—আমার কিন্তু এবার একটা ব্যাপার ঠিক লাগল না হুলো।

—কোন ব্যাপার ভোম্বলদা?

—ভেড়ির পাহারা।

—কেন?

এত দূরে দূরে পাহারার টঙ থাকা ঠিক নয়। আগে যখন এসেছি তখন অত লক্ষ্য করিনি। তা ছাড়াও একটা টঙে অন্তত দুজন পাহারাদার থাকা উচিত। যখন-তখন আপদ-বিপদ আসতে পারে।

—টঙে আপদ-বিপদ বড়ো একটা হয় না। কারণ, মাছ থাকে তো

গোইয়ের পাশে। চুরি-ডাকাতি ঝামেলা-টামেলা সবকিছু গোইয়ের কাছেই হয়। সেই জন্যে গোইয়ের পাশেই থাকে আলাঘর (লোকজন থাকার ঘর)। এই ভাবেই বরাবর চলে আসছে।

—চলে এলে কী হবে! ভোম্বলদা বলল, এটা ঠিক না।

এই ভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে পা বাড়ালাম আমরা খড়িবাড়ির দিকে।

বাগদার বাজার হিসেবে খড়িবাড়ি বিখ্যাত। এখানে প্রচুর ভেড়ির মাছ আসে। আসে আমার ভেড়িরও। আজ গোই খোলা হবে। আড়তদারের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা দরকার। কিন্তু আড়তে পৌঁছে শুনলাম তিনি নাকি আড়তেই আসেননি! বিকেলে আসবেন। ভাবলাম অযথা সময় নষ্ট করে লাভ কী! বেরিয়ে পড়াই ভালো।

আড়ত থেকে বেরোতে-না-বেরোতেই দেখা হয়ে গেল পাশের ভেড়ির ভৈরববাবুর সঙ্গে। হাসি-হাসি মুখ করে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন, দারুণ ব্যাপার। কনগ্র্যাচুলেশন হুলোবাবু। আপনি তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছেন মশাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে টাইগার সাইজ বাগদা তৈরি করে ফেলেছেন। এ যে ভাবাই যায় না।

—আসলে এটা ভাবাভাবির ব্যাপার নয়। আমি বললাম, ভেড়ির গুণ।

—গুণ-টুন কিছু নয় হুলোবাবু। আসলে কপাল। ভেড়ির ব্যবসায় আপনার দারুণ লাক।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—কী জানি, আগের জন্মে হয়তো জেলে ছিলাম।

হো-হো করে হেসে উঠলেন ভৈরববাবু। তারপর ভোম্বলদা আর খলশের দিকে তাকিয়ে বললেন—এঁদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

ভোম্বলদা আর খলশের পরিচয় দিতেই বলতে গেলে প্রায় আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন ভৈরববাবু। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—এঁদের এনে খুব ভালো কাজ করেছেন। এ যা জায়গা—বাপ রে বাপ। এখানকার বেশিরভাগ লোকই একনম্বরের ধান্দাবাজ। এই ভাবে ভেড়ি করা যায়!

ভৈরববাবুর কথা শুনে আমি অবাক। অবাক ভোম্বলদা আর খলশেও। কাল রাতেই তপনের মুখে শুনলাম আগামী বছর আমার ভেড়িটা নেওয়ার জন্যে উনি উঠেপড়ে লেগেছেন। তাই প্রশ্ন করলাম—কেন? আপনার আবার কী হল?

—এই অঞ্চলের লোকজনদের তো আপনি আমার চেয়ে বেশি চেনেন। এদের লোভের শেষ নেই হুলোবাবু। গত বছর ভেড়িতে মার খেয়েছি। এ বছরও মনে হয় তেমন কিছু সুবিধে হবে না। অথচ এরই মধ্যে বেশ কিছু টাকা গচ্চা গেছে।

—কী রকম?

—সোজাসুজি তো এরা কেউ টাকা চায় না। কৌশলে চায়।

—যেমন?

—নানা রকম লোভ-টোভ দেখায়। ভৈরববাবু বললেন, বুঝেও না-বোঝার ভান করতে হয়। তা ছাড়া উপায় কী?

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

—অন্তত এ বছর তো ভেড়িটা করতে হবে। তাই এ রকম অভিনয় করতে হচ্ছে।

—তার মানে?

—মানে য পলায়তি স জীবতি। ভেড়ির ব্যবসা থেকে সরে পড়াই ভালো।

—তা হলে কি আপনি সামনের বছর ভেড়ি করবেন না?

—আবার!

—সেকী!

—ঠিকই বলছি হুলোবাবু। এই ভাবে কি ব্যবসা করা যায়?

—কোথায় আর ভালো পরিবেশ পাবেন ভৈরববাবু! দেশের সর্বত্রই তো এক অবস্থা।

—তা তো জানি। তবুও এর মধ্যেই তো ব্যবসা-বাণিজ্য করছি। কিন্তু এখানে ব্যবসা করা অসম্ভব ব্যাপার। আপনি করতে পারছেন আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জোরে। তা ছাড়া আপনি লোকজনও ভালো পেয়েছেন।

—আপনিও পেয়ে যাবেন। সবে তো আপনার এক বছর হয়েছে। এ বছরই হয়তো ভালো ফলন পেতে পারেন।

—হতে পারে। ভৈরববাবু বললেন, তবুও এখানে আর নয়। ভেড়ি করার শখ আমার মিটে গেছে। তবে হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত যত রকম ব্যবসা করেছি সব ব্যবসায় মোটামুটি সফল হয়েছি। এই প্রথম হেরে গেলাম।

ভৈরববাবুর কথায় কেমন যেন একটা বেদনার সুর। মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোক সত্যিই অমায়িক। এই অঞ্চলের কিছু ধূর্ত লোকের পাল্লায় পড়ে আজ বিপর্যস্ত।

ভৈরববাবুর অনুরোধে তাঁর ভেড়িতে গেলাম আমরা তিনজনে। খুবই আদর-আপ্যায়ন করে তিনি আমাদের চা-মিষ্টি খাওয়ালেন। ভদ্রলোকের আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে মনে ভাবলাম এখন আর ভালো মানুষের যুগ নেই। না হলে এরকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের। আমিও তো এখানে এসে কম ভুগিনি। এখনও ভুগে চলেছি। তবে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছি।

ভোম্বলদা বলল—ভদ্দরলোকের কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আমি বললাম—আমারও।

আমার ভেড়িতে পৌঁছে যা শুনলাম তাতে মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল। ইতিমধ্যে আড়তদার অনিলবাবুর সঙ্গে ম্যানেজার তপনের তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। অনিলবাবু আমার ভেড়ির মাছটা তাঁর আড়তে পাওয়ার জন্যে এখানে এসেছিলেন। তপন রাজি হয়নি। ব্যস, এই নিয়েই কথা কাটাকাটি এবং ঝগড়া। শেষে তপনকে অনিলবাবুর হুমকি।

অনিলবাবু লোকটি তেমন সুবিধের নন। বাজারে তাঁর বড়ো একটা সুনাম নেই। এক সময়ের কুখ্যাত মস্তান। শোনা যায় দু-একটা খুনটুনও করেছেন। এখনও নাকি কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে কেস ঝুলছে। আমি তাঁর সঙ্গে সৎ ভাব রেখেই চলি। কী দরকার? এই ধরনের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করার! তাই ধমকের সুরে তপনকে বললাম—হঠাৎ তুমি এত বাড়াবাড়ি করছ কেন বলো তো তপন? সকলের সঙ্গে তোমার ঝগড়া। এ রকম হলে তো ভেড়ি করাই মুশকিল হয়ে পড়বে।

কোনো কিছু উচ্চবাচ্য না করে তপন বলল—আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবু।

সত্যি তপনের মতো লোক আজকালকার দিনে খুঁজে পাওয়া দায়। মালিকের ক্ষতি ও ভাবতেই পারে না। ঝগড়াঝাঁটি যা কিছু করে সবই আমার ভালোর জন্যে। ও নিজের স্বার্থে কোনো কিছু করেনি। তবে ভুলভ্রান্তি তো মানুষমাত্রেই হয়। হয়তো ভৈরববাবুর ব্যাপারে একটু ভুল করে ফেলেছে। তা ছাড়া বাকি লোকগুলো সত্যিই মতলববাজ। তাই মিষ্টি মুখে তপনকে বললাম—ঝগড়াঝাটি ছেড়ে এবার গোই খোলার কাজে মন দাও।

বিকেল পাঁচটার মধ্যে তপন আর গজু গোই খোলার যাবতীয় কাজ শেষ করে ফেলল। অবশ্য জোয়ার আসবে সন্ধে সাতটায়। গোই খোলা হবে আটটায়। সবাই আমরা গোইয়ের পাশে মাচায় বসেই গল্প

করছি।

ঠিক সাতটায় জোয়ার এল। গোইয়ের মাঝখানে বসানো লম্বা কাঠের বাক্সের মধ্য দিয়েই জল চলাচল করে। জোয়ারের জল নদীর দিকে ডালার মুখে আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেই জল ফুলে-ফেঁপে উঠল। বাক্সের দুপাশের ডালা তুলে দিয়ে গোই খোলা হল। ভেড়ির লোকজন 'মাকাল ঠাকুরের জয়' বলে গোইয়ের মধ্যে ফুল-বাতাসা ছড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বন্যার জলের মতো হু হু করে জল ঢুকতে লাগল ভেড়িতে। দেখতে দেখতে শুরু হল মাছের লাফালাফি।

গোই খোলার একটু পরেই ভৈরববাবু এলেন আমার ভেড়িতে। আমরা চারজন—ভোম্বলদা, খলশে, ভৈরববাবু আর আমি গোইয়ের পাড়ে মাচায় বসে কফি খাচ্ছি। তপন আর গজু পাড়ে দাঁড়িয়ে মাছ ঢোকা লক্ষ্য করছে।

আজ ভরা পূর্ণিমা। আকাশে চাঁদ হাসছে। চারদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভেসে যাচ্ছে। সাঁই-সাঁই শব্দে বাতাস ছুটছে। তরতর করে ভেড়িতে জোয়ারের জল ঢুকছে। ছলাত-ছলাত করে পাড়ে ঢেউ ভাঙছে। কিছু দূরে একটা খেজুর গাছ জলের উপর দুলছে। খলশে আনন্দে আত্মহারা।

হঠাৎ জিমনি গজু আমাদের কাছে এসে বলল—আপনারা একটু এদিকে আসুন।

মাচা থেকে উঠে গজুর সঙ্গে বিত্তির কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা। গজু বিত্তির গায়ে টর্চের আলো ফেলল। খলশে বলল—বিত্তির মধ্যে ওই সব কী জ্বলছে রে হুলো?

—বাগদার চোখ। আমি বললাম, রাত্তিরবেলায় বাগদার চোখ রেডিয়ামের মতন জ্বলে।

আনন্দে খলশে বলল—ফ্যান্টাস্টিক।

পায়ে পায়ে রাত্রি এগিয়ে চলেছে। দশটা বেজে গেছে। গজু নদীর ধারে কী যেন দেখতে গেছে। ম্যানেজার তপন আমার কাছে এসে বলল—এক্ষুনি বিত্তি ঝাড়া দরকার। দুটোই ভরে গেছে।

—গজুকে ডেকে নিয়ে এসো বলে আমরা চারজনই বিত্তির কাছে এগিয়ে গেলাম। গজুকে নিয়ে তপন গোইয়ের মধ্যে নামল।

সত্যি দুখানা বিত্তি টাইগার-সাইজ বাগদায় ভরে গেছে। অন্তত চল্লিশ কেজি হবে। আমি নিজেও এতটা আশা করতে পারিনি। তপনের মুখে হাসি। গজুও খুশিতে ডগমগ।

ফিরে বিত্তি পাতা হয়ে গেলে আমরা সবাই খেতে বসলাম। ভৈরববাবুকে অনুরোধ করায় তিনিও আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে যে যার টঙে চলে গেল পাহারা দিতে। অনেক রাত হয়ে গেছে দেখে ভৈরববাবুও চলে গেলেন তাঁর ভেড়িতে। গোইয়ের কাছে থাকলাম শুধু আমরা চারজন—গজু, ভোম্বলদা, খলশে আর আমি।

সুবলবাবু আর নকুলকে ভেড়িতে আসার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। ওরা আসবে বলে কথাও দিয়েছিল। কিন্তু দুজনের কেউই এল না। ওদের না-আসার কারণটা বুঝতে পারলাম না। অনেক রাত হয়ে গেছে। আর আসবে বলে মনে হয় না। তাই গজুকে গোইয়ের কাছে রেখে আমরা তিনজনে নদীর ধারে একটু ঘুরতে গেলাম। নদীর পাড়ে জঙ্গলের কাছে আসতে-না-আসতেই মনে হল কে যেন গা-ঢাকা দিল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না হলেও অত গাছগাছালির মধ্যে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। আর এত রাত্তিরে খালি হাতে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকাটাও ঠিক না। তাই ভোম্বলদা বলল—ব্যাপারটা রহস্যজনক। চল, ফিরে যাই। গোইয়ের কাছে যাওয়া যাক।

গোইয়ের কাছে এসে গজুকে জিজ্ঞেস করলাম—কাউকে দেখেছ?

গজু বলল—না তো!

—ঠিক আছে। তুমি এক কাজ করো। টাটুকে ডেকে নিয়ে এসো। দুজনে মিলে পাহারা দাও।

ওদের দুজনকে পাহারায় রেখে আমরা তিনজনে ঘরের ভিতরে গেলাম। রাত অনেক হয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই আড়তে মাছ যাবে। এই ফাঁকে বিছানায় একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিই।

রাত সাড়ে তিনটে হতে-না-হতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। ইতিমধ্যে গজু আর টাটু মাছ ওজন করতে শুরু করেছে। ওজন হয়ে গেলে ঝুড়ির মধ্যে সাজিয়ে ফেলল। চারটে বাজি-বাজি করছে। ওরা দুজনে আড়তে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু তপনের দেখা নেই। তপন যে কী আরম্ভ করেছে কে জানে! রীতিমতো বিরক্ত হয়ে টাটুকে তপনের টঙে পাঠালাম তাকে ডেকে আনার জন্যে। টাটু টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটতে ছুটতে চলে গেল। একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে একাই ফিরে এল।

কিন্তু একী! টাটু কুলকুল করে ঘামছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। কথা বলতে পারছে না। ভয়ে কেমন যেন কাঠ হয়ে গেছে।

ভোম্বলদা টাটুকে বিরাট জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে রে টাটু?

টাটু যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। চোখ দুটো বড়ো-বড়ো করে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল—খু... খু... খুন।

—খুন! চমকে উঠে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে খুন হয়েছে?

—ত... ত... তপনদা।

—তপন খুন হয়েছে?

—হ্যাঁ।

মাছ-টাছ ফেলে আমরা সকলে ছুটলাম তপনের টঙের দিকে—যে টঙ থেকে তপন পাহারা দেয়, সেইখানে। টঙের দিকে তাকাতেই মাথা ঘুরে গেল। শিউরে উঠলাম। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! তপন টঙের মধ্যে মরে পড়ে আছে। চারদিকে চাপ-চাপ রক্ত। বুকের বাঁ দিকটায়

ছুরি মারার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়। আততায়ী তপনের মুখ চেপে ধরে ছুরি মেরেছে।

আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল সংবাদটা। দেখতে দেখতে জড়ো হয়ে গেল প্রচুর লোক। এসেছেন পাশের ভেড়ির ভৈরববাবু আর তাঁর ভেড়ির লোকজন। এসেছেন আড়তদার অনিলবাবুও। বলতে গেলে প্রায় সবার চোখে জল। গজুর তো কান্নাই থামে না। ব্যথা-বেদনার তীব্র ছাপ ভৈরববাবুর চোখে-মুখে। অনিলবাবুও পেয়েছেন প্রচণ্ড আঘাত।

সবাইকে সরিয়ে ভোম্বলদা টঙের কাছে এগিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে মৃতদেহ নিরীক্ষণ করে বলল—তুই আর খলশে ভেড়ির লোকজন নিয়ে এখানে থাক হুলো। আমি তোর গাড়ি নিয়ে থানায় যাচ্ছি। দেখিস, কেউ যেন ডেডবডিতে হাত না দেয়।

আমি বললাম—ঠিক আছে। তুমি বেরিয়ে যাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুলিশ নিয়ে ভোম্বলদা এসে হাজির হল। পুলিশ-ভ্যান থেকে কয়েকজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে নামলেন স্থানীয় থানার ওসি। চারজন কনস্টেবলকে মৃতদেহের কাছে রেখে তিনি আমাদের সঙ্গে আলা ঘরে এলেন। সঙ্গে এলেন অনিলবাবু ও ভৈরববাবু। বাকি লোকজনদের আসতে বারণ করলেন। ঘরের মধ্যে বসে তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—সব কথা খুলে বলবেন হুলোবাবু।

আমি বললাম—অবশ্যই।

ওসি প্রশ্ন করলেন—কত দিন আপনি এই অঞ্চলে ভেড়ি করছেন?

—বছর পাঁচেক।

—তপনবাবু আপনার কাছে কত দিন কাজ করছেন?

—শুরু থেকেই।

—কেমন লোক ছিলেন তিনি?

—এত ভালো মানুষ আজকালকার দিনে খুঁজে পাওয়াই দায়।

—হু। ওসি কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, ইদানীং কি কারও সঙ্গে ওঁর ঝগড়াঝাটি হয়েছিল?

কথাটা শুনে আমি একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়লাম। যা দিনকাল। কারও নাম বলাটা কি ঠিক হবে! আমাকে আমতা-আমতা করতে দেখে ভোম্বলদা বলল—চিন্তার কিছু নেই। সব কথা খুলে বল।

খুলেই বললাম—পরশু রাতে জিমনি গজুর সঙ্গে তপনের বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছিল। গজুর মুখেই আবার শুনলাম নকুল আর অনিলবাবুর সঙ্গেও নাকি তার ঝগড়াঝাটি হয়েছে। ওঁরা দুজনেই তপনকে শাসিয়ে গেছেন।

অনিলবাবু পাশেই ছিলেন। ওসি তাঁকে চেনেন। অনিলবাবুর দিকে তাকালেন তিনি। মুখটা কাঁচুমাচু করে অনিলবাবু বললেন—স্যার, আমার সঙ্গে তপনবাবুর ঝগড়া হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তাই বলে. .

—যা বলার থানায় গিয়ে বলবেন। ওসি বললেন, আপনি বেলা বারোটায় থানায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

এবার নকুলের খোঁজ করলেন ওসি।

আমি বললাম—গতকাল রাতে তাকে ভেড়িতে আসার জন্যে নেমন্তন্ন করেছিলাম। কিন্তু আসেনি। আজও দেখতে পাচ্ছি না।

ওসি বললেন—আপনার জিমনি গজু কোথায়?

গজু তখন ভয়ে কাঠ। ঠকঠক করে কাঁপছে। চোখে করুণ দৃষ্টি। মুখ বিবর্ণ। ওসি গজুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। তারপর হঠাৎ ভোম্বলদাকে ডেকে নিয়ে আলাঘরের পিছনে গেলেন। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হল। মিনিট পাঁচেক পরে আমার কাছে এসে ওসি বললেন—আপনাকে একটু থানায় আসতে হবে হুলোবাবু। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসবেন!

ওসি চলে যাওয়ার একটু পরেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা—

ভোম্বলদা, খলশে আর আমি। ভোম্বলদার নির্দেশমতো প্রথমে গেলাম নকুলের বাড়ি। সেখানে গিয়ে শুনলাম গতকাল থেকে তার পাত্তা নেই। কোথায় গেছে, বাড়ির কেউ তা জানে না।

নকুলের বাড়ি থেকে থানায় চলে এলাম। ভোম্বলদা আমাদের নিয়ে ওসির ঘরে ঢুকল। তিনি আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

আমরা চেয়ারে বসতে-না-বসতেই ওসি ভোম্বলদাকে জিজ্ঞেস করলেন—কত দূর এগোলেন?

—বেশি দূর নয়।

—নকুলের খবর কী?

ভোম্বলদা জবাব দিল—কাল থেকে বেপাত্তা। থানায় আসার পথে ওর বাড়ি হয়ে এসেছি আমরা।

—ব্যাপারটা রীতিমতো সন্দেহজনক। ওসি বললেন, আপনার সঙ্গে তো ভেড়িতে আমার কথা হয়েছে ভোম্বলবাবু, খুব সাবধানে এগোতে হবে। আজকাল এই সব অঞ্চলে পলিটিক্যাল মার্ডারই বেশি হচ্ছে।

ভোম্বলদা বলল—তা হলে সুবলবাবুও তো সন্দেহের বাইরে নন। তাঁর বিরুদ্ধেও কিছু অভিযোগ শুনেছি।

—হতে পারে। ওসি বললেন, ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখুন আপনারা কাকে-কাকে সন্দেহ করেন।

ভোম্বলদা ওসিকে জিজ্ঞেস করল—আড়তদার অনিলবাবু লোকটা কেমন?

—খুব খারাপ। ওর পাস্ট রেকর্ড ইস ভেরি ব্যাড। একেবারে বাজে লোক।

—আমার আরও কিছু জানার আছে। পরে এ বিষয়ে কথা বলব।

ওসি বললেন—আমরা সব রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

তখনকার মতো ওসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। ফেরার পথে সুবলবাবুর বাড়িতে গেলাম। তাঁকে ব্যাপারটা

খুলে বললাম। তেমন কোনো গুরুত্বই দিলেন না তিনি এ রকম একটা মারাত্মক ঘটনার। উলটে বললেন—এখন তো খুনখারাপি আকছারই হচ্ছে। ও নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

আমরা বিস্মিত হয়ে ওখান থেকে উঠে পড়লাম।

ভেড়িতে ফিরে ভোম্বলদা, খলশে আর আমি আলোচনায় বসলাম। খলশে বলল, পঞ্চায়েত প্রধান লোকটি মোটেই সুবিধের নয়।

আমি বললাম—অযোগ্য লোকের হাতে ক্ষমতা এলে এই অবস্থাই হয়। ধরাকে সরা ভাবে। তখন যা খুশি তাই করে।

হঠাৎ ভোম্বলদা বলল—গজুকে ডাক তো রে হুলো।

আমার হাঁক শুনে গজু কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকল। ভোম্বলদার জেরার মুখে সে যা বলল তাতে আমরা অবাক। তা হলে কি শেষ পর্যন্ত...

ভোম্বলদার চোখে-মুখে তখন গভীর চিন্তার ছাপ। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—হুলো, তোর গাড়িটা নিয়ে আমি বেরোচ্ছি। চান-টান আর হবে না। হোটেলেই খেয়ে নেব। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তুই আর খলশে ভেড়ি থেকে কোথাও যাবি না।

ভোম্বলদা আমার মারুতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। খলশে বলল—ভোম্বলদা নিশ্চয়ই কোনো সূত্র পেয়েছে।

আমরাও এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলাম। যা হোক, চান-টান সেরে না-খাওয়ার মতো সামান্য কিছু মুখে দিয়ে আমরা ভোম্বলদার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেলা পড়ে গেছে। বিকেল তখন সন্ধের কাছাকাছি। তখনই হঠাৎ ভোম্বলদা পুলিশের ভ্যান নিয়ে হাজির। ভ্যান থেকে ভোম্বলদার সঙ্গে নামলেন ওসি আর অনিলবাবু। এঁদের পরে নামলেন সাব-ইনস্পেক্টর বিশ্বাস আর একজন কনস্টেবল। আড়তদার অনিলবাবুকে দেখে

আমরা সত্যিই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

ভোম্বলদা আমার ও খলশের দিকে এগিয়ে এসে বলল—তোরা ভৈরববাবুর ভেড়ির পিছন দিক দিয়ে ওঁর ভেড়ির আলাঘরের কাছে চলে যা। আমরা ভ্যান নিয়ে সামনের দিক দিয়ে যাচ্ছি।

কিছুই বুঝলাম না! বোঝার চেষ্টাও করলাম না। তবে একটা কিছু যে ঘটতে চলেছে সেটা টের পেলাম। তাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো খলশে আর আমি হনহন করে ভৈরববাবুর ভেড়ির দিকে এগোতে লাগলাম। ভেড়িতে পৌঁছে নকুল আর ভৈরববাবুকে ফিসফিস করে কথা বলতে দেখে আমরা অবাক।

ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক। কূলকিনারা খুঁজে পাওয়া দায়।

ইতিমধ্যে গজু এসে গেছে। দেখতে দেখতে ভোম্বলদাও চলে এল। ভোম্বলদার সঙ্গে এখন আছেন ওসি, সাব-ইনস্পেক্টর মিঃ বিশ্বাস, চারজন কনস্টেবল আর আড়তদার অনিলবাবু। মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন ভৈরববাবু। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে দে দৌড়। আলাঘরের পিছনের জঙ্গলটার দিকে ছুটতে লাগলেন ভৈরববাবু। তাঁর পিছন পিছন ছুটলাম আমরাও। চিৎকার করে উঠলেন ওসি—পালাবার চেষ্টা করবেন না ভৈরববাবু। বিপদে পড়বেন। আমি গুলি ছুড়তে বাধ্য হব।

কে কার কথা শোনে! কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তীরবেগে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভৈরববাবু নদীর মধ্যে। ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমরা পাঁচজনও—ভোম্বলদা, খলশে, নকুল, অনিলবাবু আর আমি। জলের মধ্যে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির পর ভৈরববাবুকে টেনে তুললাম আমরা। ওসি হাতকড়া পরিয়ে ভ্যানে তোলার নির্দেশ দিলেন। তারপর ভোম্বলদার দিকে চেয়ে বললেন—থ্যাঙ্ক য়্যু ভোম্বলবাবু। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ভোম্বলদা ওসিকে বলল—মিঃ বোস, আপনি কি আমার জন্যে মিনিট পনেরো সময় খরচ করতে পারবেন?

—কেন বলুন তো?

আপনাদের সবাইকে আমি তদন্ত-রহস্যের ব্যাপারটা বলতে চাই।

ভোম্বলদার দিকে চেয়ে ওসি বললেন—অবশ্যই। সময় দেব না মানে, নিশ্চয়ই দেব। আপনি তো মশাই একটা রেকর্ড করে ফেলেছেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা মার্ডার-কেসের খুনিকে ধরা চাট্টিখানি কথা! বলুন আপনার তদন্ত-রহস্যের কথা।

শুরু করল ভোম্বলদা ঃ

থানা থেকে ফিরে হুলো, খলশে আর আমি আলোচনায় বসি। মোট চারজনকে আমাদের সন্দেহ হয়। গজু, নকুল, অনিলবাবু আর পঞ্চায়েত প্রধান। প্রথমে জেরা করি গজুকে। ভয়ে ওর অবস্থা তখন কাহিল। জেরার মুখে গজু অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তাতে খলশে আর হুলোর মনে হয় গজুই বুঝি খুনি। আমি কিন্তু গজুর কথা থেকেই খুনের ক্লুটা পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাতিল করি।

—কী কথা? জিজ্ঞেস করলেন ওসি।

ভোম্বলদা বলল—জেরার সময় গজু বলল পাশের ভেড়ির ভৈরববাবু এখানে আসার পর থেকেই যত ঝামেলা আর অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে হিসেব মিলে গেল।

—যথা? ওসির আবার প্রশ্ন।

এক—হুলোর গোই খোলার সময় ভৈরববাবুর আমাদের ভেড়িতে আসা এবং অকারণে এই সময় ওর নিজের ভেড়িতে আসা। দুই—আমাদের কাছে এই তল্লাটে ভবিষ্যতে না-আসার অভিনয় করা। তিন—অযথা আমাদের বেশি খাতির করা। চার—গায়ে পড়ে ফালতু কথা বলা। গজুর কথা শুনে এই সব ব্যাপারগুলো আমার মনে পড়ে গেল। তারপর আমি যাই নকুলের কাছে। ওর বাড়িতে গিয়ে শুনি হঠাৎই এক বন্ধুর বিপদের কথা শুনে ও কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেছে সেখানে। নকুলের বাড়ি থেকে ফেরার পথে দেখা হয়ে

যায় নকুলের সঙ্গেই। তপনবাবুর কথা শুনতেই নকুল চমকে ওঠে এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে। ওর চমকে ওঠা ও কান্নার মধ্যে কোনো চালাকি বা অভিনয় ছিল না। ভৈরববাবুর ঠিকানা আমি নকুলের কাছ থেকে নিই। ভৈরববাবু যে খুবই ধূর্ত লোক সে কথা নকুলের কাছ থেকে জানতে পারি। তাকে কৌশলে আটকে রাখার জন্যে নকুলকে ভেড়িতে আসতে বলে চলে আসি আমি সুবলবাবুর কাছে। তাঁকে আমার পরিচয় দিই। তিনিও ভৈরববাবুর বিরুদ্ধে বলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝলাম এই খুনের ব্যাপারে তিনি জড়িত নন। তাঁকেও সন্ধেবেলায় ভেড়িতে আসার জন্যে অনুরোধ জানাই। এদের দুজনকেই অবশ্য ভৈরববাবুর ভেড়িতে আসতে বলি। তারপর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমি সোজা চলে আসি শ্যামবাজারে ভৈরববাবুর বাড়িতে। সেখানে শুনলাম তিনি নাকি দিনচারেক আগে দিঘায় বেড়াতে গেছেন। অথচ তিনি এসেছেন এখানে। ব্যস, সন্দেহ বেড়ে গেল আরও শতগুণ। বলতে গেলে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলাম, ভৈরববাবুই খুনি। তবুও ষোলো আনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ওই এলাকার থানায় গেলাম। থানার ওসির সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। ব্যাপারটা খুলে বললাম। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, ওর মতন ধূর্ত আর লোভী লোক খুব কমই দেখা যায়। ওর বিরুদ্ধে থানায় অনেক অভিযোগ আছে। দু-চারবার হাজতবাসও করেছে। কোনো জিনিসের উপর ওর নজর পড়লে সেটা পাওয়ার জন্যে ও সবকিছু করতে পারে। ওসির কথা শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে আসি আপনাদের কাছে—অর্থাৎ বারাসাত থানায়। তার পরের ঘটনা সবই তো আপনারা জানেন।

ভোম্বলদাকে ধন্যবাদ জানিয়ে থানার দিকে রওনা হলেন ওসি।

গুলতির অদ্ভুত গুলি

ভরদুপুরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম বিশেষ একটা দরকারে। রাসবিহারীর মোড়ে পৌঁছে বাসস্ট্যান্ডের সেডের নীচে দাঁড়ালাম। আমার বন্ধুটির এখানেই আসার কথা। ওর সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের দিকে যাব একজনের সঙ্গে দেখা করতে।

বৈশাখ যাই-যাই করছে। জ্যৈষ্ঠ এসে গেল বলে। সারা কলকাতার দেহে প্রচণ্ড তাপ। রোদে আগুনের হলকা। সূর্যের গনগনে আঁচের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরনো দায়। মনে হয় যেন গোটা শহর জ্বলছে। ট্রামে-বাসে ভিড় নেই। রাস্তাঘাটও বেশ ফাঁকা। এই অসহ্য গরমে কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়! তা-ও বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। বন্ধুর আসার নামগন্ধও নেই। আর আসবে বলে মনেও হয় না। মনে মনে গজগজ করতে করতে বাড়ির দিকে পা বাড়াব ভাবছি, এমন সময় একটা মারুতি-৮০০ আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি একটু অবাক হলেও গাড়িটার দিকে ফিরেও তাকালাম না। কারণ, আমার বন্ধুটির গাড়ি নেই। কিন্তু গাড়ির দরজা খুলে ভেতর থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল।

অবাক হলাম। কণ্ঠস্বর পরিচিত বলেই মনে হল। গাড়ির দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি ভজাদা। মানে আমাদের ক্লাবের ভজহরি বিড়িং।

ভজাদা অনেক দিন ক্লাবে আসে না। দেখাসাক্ষাৎ নেই বেশ কিছু দিন। হঠাৎ তাকে এই কাঠফাটা রোদে এখানে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলি—কী ব্যাপার? তুমি এখানে!

—তোর বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। তোর সাথে কথা আছে। তোকে আমার খুবই দরকার।

—আমাকে!

—হ্যাঁ, তোকে। নে, গাড়িতে ওঠ।

ভজাদার গাড়িতে উঠে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এই তীব্র দহনে হাঁসফাঁস করছিলাম। এ. সি. কারে আরামে বসলাম। তারপর ভজাদার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কোনো রহস্য-টহস্য আছে নাকি ভজাদা?

—সব বলব। তার আগে তুই বল তোর কি এখানে কোনো কাজ আছে?

—একজনের আসার কথা ছিল। আসেনি। আর আসবে বলে মনেও হয় না। আসার টাইম অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে।

—ভেরি গুড। তা হলে চল। দেরি না করে তোর বাড়িতেই যাওয়া যাক।

আমি বললাম—ঠিক হ্যায়। চলো।

ভজাদা গাড়ি স্টার্ট দিল। একটু পরেই আমার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে সোজা চলে এলাম আমার লেখার ঘরে।

বসতে-না-বসতেই ভজাদা বলল—চল। এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

—গোবরপুরের তালদিঘি জঙ্গলে।

—কী নাম বললে?

—গোবরপুরের তালদিঘি জঙ্গল।

—এ রকম কোনো জায়গা আছে নাকি? বাবার জন্মেও তো এমন নাম শুনিনি।

—কত জায়গার কত রকম নাম আছে, তুই সব জানিস নাকি? নাম দিয়ে কী হবে, আমাদের কাম নিয়ে দরকার।

—তা কামটা কী, শুনি।

—শিকার। ভজাদা বলল, তোকে নিয়ে আমি শিকারে যাব।

—কী শিকারে যাবে?

—পাখি শিকার। বুঝলি হুলো, এবার দেখবি শিকার কাকে বলে। তুই অবাক হয়ে যাবি।

—সে তো আগেরবারও হয়েছি। এ আর নতুন কথা কী! তবে দোহাই তোমার, আমাকে টেনো না। আমি আর তোমার সাথে শিকারে যাচ্ছি না।

—কেন?

—সে তো তুমি ভালো করেই জানো।

—তার মানে তুই আমাকে বিশ্বাস করতে পারছিস না।

—ছি-ছি! একী কথা বলছ তুমি! তোমাকে বিশ্বাস করব না কেন?

—তবে?

আমতা-আমতা করে আমি বললাম—তোমার হাতের টিপের উপর আমার বিশ্বাস নেই। পাখি মারতে শেষে কী মেরে বসবে কে জানে! বিপদে পড়ি আর কী!

—এবার আর তা হবে না রে হুলো। এবার গুলতি দিয়ে মারব।

—তবেই হয়েছে। আমি আর এর মধ্যে নেই।

আহত হয়ে ভজাদা বলল—তুই কি আমাকে ঠাট্টা করছিস?

—কী বলো যে তুমি ভজাদা! তোমাকে কি আমি কখনও ঠাট্টা করেছি?

—তা হলে এ কথা বললি কেন?

—বললাম কেন, তা কি তুমি জানো না? আগের বার কী কাণ্ডটাই না করেছিলে। একটা ঢোঁড়াসাপ দেখে হাঁটু জলে হাবুডুবু খেয়েছিলে। বেড়ালকে হরিয়াল ভেবে গুলি ছুড়েছিল। এ সব কি কেউ সহজে ভুলতে পারে? তাই...

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই ভজাদা বলল—তাই আমার সাথে আর যাবি না—এই তো? যাস না। তবে তোকে আমি একটা কথা বলি, মানুষ আগে আর পরে এক থাকে না রে হুলো। পালটে

যায়। যত দেখে তত শেখে। তাতে অভিজ্ঞতা বাড়ে। এটা মানিস তো?

—তা মানি।

—তা হলে সেদিনের সেই ভজহরি বিড়িং আর আজকের ভজহরি বিড়িং যে একই আছে তুই ভাবলি কী করে? এবার আমার টিপ মিস হবেই না। হতে পারে না।

—কেন মিস হবেই না? হতে পারে নাই বা কেন? বড়ো বড়ো শিকারিদেরও টিপ মাঝেমধ্যে মিস হয়।

—তা হোক গে। আমি যে গুলি তৈরি করিয়েছি তাতে মিস হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। মিস হতেই পারে না।

—এ আবার কেমন কথা!

ভজাদা মুচকি হেসে বলল—দ্যাখ না এবার খেলাটা আমার। যে পাখির দিকে তাক করে গুলি ছুড়ব তার গায়ে গুলি লাগবেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এটা কী করে সম্ভব?

শিকারে গেলেই দেখতে পাবি।

ভজাদার কথা শুনে আমার উৎসাহ বাড়ল। ভজাদা আর যাই হোক, ভোম্বলদার মতো গুলবাজ নয়। মুখে আস্ফালন করলেও গুল মারতে দেখিনি। তাই বললাম—ব্যাপারটা খুলেই বলো না ভজাদা, যে পাখির দিকে তাক করে গুলি ছুড়বে তার গায়ে গুলিটা লাগবেই কেন। রহস্যটা কী?

—তবে শোন। এটা তো বিজ্ঞানের যুগ। দেখতেই পাচ্ছিস বিজ্ঞানের কাণ্ড। অনেক অসাধ্য সাধন করছে। বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব বলে কিছুই নেই বিজ্ঞানের কাছে। আজ যেটা আবিষ্কার হয়নি, কালই সেটা হয়ে যাচ্ছে। এখন স্যুইচ টিপে পৃথিবী ধ্বংস করা যায়। হয়তো একদিন দেখা যাবে মরা মানুষকেও বিজ্ঞান বাঁচিয়ে তুলছে। আমার এই গুলির ব্যাপারটা বিজ্ঞানেরই কাণ্ড।

—গুলিটা কী ভাবে তৈরি করালে সেটা বলো। মাটি দিয়ে কী করে এটা সম্ভব?

—ধুর ঘোড়াড্ডিম! মাটি দিয়ে তৈরি করিয়েছি নাকি? ধাতুর গুলি। নটা ধাতু দিয়ে তৈরি।

ভজাদার এই গুলি তৈরির কথা শুনে উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। ভাবলাম ব্যাপারটা সত্যিই নতুন। দেখা দরকার। তাই বললাম—রাজি। আমি রাজি। কবে যাবে শিকারে বলো।

ভজাদা বলল—শুভস্য শীঘ্রম্। কাল। কালই চল।

পরের দিনই আমরা রওনা দিলাম। বেলা আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম ভজাদার দেখা সেই বিখ্যাত তালদিঘি জঙ্গলে।

গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকে সত্যিই আমি মুগ্ধ। নানা রকম গাছগাছালিতে ভরা বেশ একটা সুন্দর বাগান। ছায়া-ছায়া ভাব। পাশেই একটা দিঘি। এই গরমেও একটা ঠাণ্ডার আমেজ। ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি ডালে-ডালে বসে আছে। দেখলে মনে হয় যেন রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে আছে। আঃ, কী সুন্দর! কাছেপিঠে এমন একটা সুন্দর জঙ্গল আছে, আগে জানতাম না।

ভজাদা মুখে হাসি এনে আমার দিকে তাকাল। ভুরু নাচিয়ে বলল—বল, এ জিনিস এর আগে দেখেছিস?

আমি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললাম—গ্রাণ্ড—দারুণ। জবাব নেই তোমার ভজাদা।

ভজাদা বলল—তা হলে এবার শুরু করা যাক আমাদের শিকার অভিযান।

আমি বললাম—ইয়েস। চলো।

ভজাদা আগে আর আমি তার পিছনে। গুটি-গুটি পায়ে চলেছি দুজনে। হঠাৎ ভজাদা বলল—গুলি ছোড়াই তো দায় দেখছি।

—কেন?

—ওই দ্যাখ, ওই মগডালটায় একজোড়া ঘুঘু। তার গায়ে গায়ে

বসে আছে অচেনা অনেকগুলো পাখি। ওই সব পাখি খায় কিনা জানি না। অযথা ওদের মেরে লাভ কী?

—কেন? তুমি ওদের মারবেই বা কেন! তুমি তো মারবে ঘুঘু।

—আরে, ঘুঘু মারি কী ভাবে, বল। ওই মগডালে একঝাঁক নানা রকম পাখির সাথে মিশে থাকলে তাকে কি টিপ করা যায়?

—সেটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু ভজাদা, পাখির তো এখানে অভাব নেই। আমরা তো সব পাখি চিনিও না। চেনার মধ্যে চিনি ঘুঘু-হরিয়াল-টরিয়াল দু-চার রকমের পাখি।

—বলিস কী রে! কত রকমের পাখি চিনি। আর তুই বলছিস দু-চার রকমের!

—বলো, কী-কী পাখি চেনো।

—কাক চিনি, বক চিনি। কোকিল, চড়ুই, দোয়েল...

—থামো, থামো। আমি বললাম, এ সব পাখি কি আমরা খাই?

—না।

—তা হলে এদের চিনে লাভ কী? তার চেয়ে বরং যে সব পাখি আমরা খাই...

—চুপ, চুপ। বলে আমাকে থামিয়ে দিল ভজাদা। ফিসফিস করে বলল, তুই এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক হুলো। মুখ থেকে যেন কোনো আওয়াজ না বেরোয়। আমি একটা পাখি দেখেছি।

ভজাদা আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আস্তে আস্তে একটা বড়ো জামগাছের দিকে এগোতে লাগল। বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গুলতি দিয়ে মনে হয় সেই পাখিটাকে তাক করছে। রুদ্ধশ্বাসে আমি ভজাদার দিকে চেয়ে আছি। এই বুঝি গুলি ছুড়ল।

সত্যিই ভজাদা গুলি ছুড়ল। গুলি খেয়ে পাখিটা তার কাঁধের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভজাদার আর্তনাদ—হুলো, শিগগিরি বাঁচা। এই শালার পাখি খুব জোরে জোরে ঠুকরাচ্ছে। ওরে বাবা রে—মরে গেলাম রে!

আমি অবাক। এ কী কাণ্ড! গুলি লাগলে তো পাখি মরে যাবে। সে আবার ঠুকরাবে কী করে! কিন্তু সত্যিই তো ভজাদার কাঁধের উপরে একটা পাখি আছে বলে মনে হচ্ছে। এবং সেটা নড়ছেও।

দৌড়ে আমি ভজাদার কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই সেটা ফুড়ুৎ করে না উড়ে সুড়ুৎ করে ভজাদার কাঁধ থেকে নেমে দে ছুট। কাতরাতে কাতরাতে ভজাদা বলল—কী শালার ডেনজারাস পাখি রে! গুলি খেয়েও শালা ওই ভাবে ঠুকরাল। উঃ, কী জ্বালা করছে!

হাসি চেপে আমি বললাম—ওটা তো তোমাকে ঠুকরায়নি, কামড়েছে। ওটা তো পাখি ছিল না।

—তবে কী ছিল?

—কাঠবেড়ালি। ভালোই করেছ। আগের বার গুলি করে গাছ থেকে নামালে একটা বেড়ালকে। এবার কাঠবেড়ালকে। তবে এটার ল্যাজে গুলি লেগেছিল। রক্তও পড়ছিল ল্যাজ থেকে। আগের বারের বেড়ালটার মতন ভয় পেয়ে নামেনি। আঘাত পেয়ে নেমে রাগে তোমাকে কামড়াচ্ছিল। তোমার কাঁধ থেকেও তো রক্ত বেরোচ্ছে।

—সর্বনাশ! তা হলে তো টক্সাইড দিতে হবে।

—কলকাতায় ফিরে নেবে। তার আগে দু-একটা পাখি মারো।

—ঠিক হ্যায়। বলে ভজাদা সগর্বে বলল—শিকারে যখন বেরিয়েছি শিকার করেই ফিরব।

—এই তো বীরপুরুষের কথা। আমি বললাম, এবার চলো গভীর জঙ্গলের দিকে। সেখানে আরও বেশি পাখি পাওয়া যাবে।

—তুই শিকারের কিস্যু বুঝিস না। এখানেই ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না কোন্‌টা কী পাখি—গভীর জঙ্গলে তো কিছুই বোঝা যাবে না। সেখানে আরও বেশি অন্ধকার।

—তা অবশ্য ঠিক। এখানেই কাঠবেড়ালিকে পাখি ভাবলে, গভীর জঙ্গলে হয়তো বাদুড়কে হরিয়াল ভাববে।

—কী বললি? হনুমানের মতো দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল ভজাদা,

তুই বড়ো বাজে বকছিস হুলো।

—অন্যায় হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে। তুই একটা কথাও আর বলবি না। চুপ করে থাকবি। দেখবি শিকার কাকে বলে। এই গুলি দিয়ে একবার তাক করলে কোনো শালার পাখিই আর পালাতে পারবে না।

—তাই যদি হয় তা হলে কাঠবেড়ালির গায়ে না লেগে লেজে লাগল কেন?

—আবার ফ্যাচফ্যাচ করছিস? এত বকলে কি পাখি মারা যায়? তোকে চুপ করে থাকতে বলেছি না?

—ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না।

—চল, এগিয়ে যাই।

গভীর জঙ্গলের দিকে যেতে যেতে ভজাদার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম—আগের বারও তোমার খেল দেখেছি। এবারও দেখছি। তুমি যা পাখি মারবে সে তো বুঝেই গেছি। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। অযথা সারাটা দিন মাটি হয়ে গেল। তবে লাভের মধ্যে এইটুকু হল যে গুলির কেরামতিটা দেখতে পেলাম। গুলিতে কিছু একটা আছে। না হলে কাঠবেড়ালির লেজেও গুলি লাগাতে পারত না ভজাদা। কমসে কম দু-তিন হাত দূর দিয়ে যেত সেটা।

হঠাৎ ভজাদা দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও। ভজাদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল—এখানেই তো বেশ পরিষ্কার পাখিগুলোকে দেখা যাচ্ছে রে হুলো। দ্যাখ একটা হরিয়াল একেবারে সামনে বসে আছে।

—এই কথাই তো তোমাকে আমি তখন বলেছিলাম। তুমি তো খামোকা আমার উপর রেগে উঠলে।

—আরে, রাগব কেন? এ তো আমিও জানি। তোকে পরীক্ষা করছিলাম। এটাও বুঝলি না?

মনে মনে বললাম—বেশ ভালোই চালবাজি শিখেছ। মুখে অবশ্য অন্য কথা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় ভজাদার আবার চিৎকার—উঃ.

শালা ডেয়ো পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে রে।

ব্যস, হরিয়ালকে আর গুলি করা গেল না। সে উড়ে পালাল। বাকি পাখিরাও।

এবার আমি ভজাদাকে বললাম—জঙ্গল-টঙ্গল ছেড়ে বরং দীঘির দিকে যাওয়া যাক। ওখানে ডাহুক-পানকৌড়ি-তিতির-বেলেহাঁস—নানান রকমের পাখি পাওয়া যাবে।

ভজাদা বলল—তা মন্দ বলিসনি। চল।

দুজনে দীঘির কাছে এসে অবাক হয়ে গেলাম। প্রচুর পাখি। এই সব পাখি সাধারণত আমরা খাই। ভজাদা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। আমিও। প্রথমেই ভজাদার নজর পড়ল একটা ডাহুকের দিকে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে সেটা দীঘির পাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমরা দুজনও তার পিছন-পিছন যাচ্ছি। আগে ভজাদা—পরে আমি। ভজাদা দাঁড়িয়ে পড়ল। পাড় থেকে নীচের দিকে নেমে প্রায় জলের কাছে বসে ডাহুকটাকে তাক করছে। আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। হঠাৎ ঝপাস শব্দ। ভজাদা জলে পড়ে গেছে। ডাহুকটা হাওয়া। কোনোক্রমে ডাঙায় উঠে ভজাদা বলল—ডাহুকটা কী চালু রে হুলো। তাক করতে-না-করতেই হাওয়া।

—সাথে সাথে তোমারও হল কিছুটা জল খাওয়া।

—তা যা বলেছিস। বেশ কিছুটা জল গিলে ফেলেছি। তবে ওই নচ্ছার পাখিটা যে এই ভাবে পালিয়ে যাবে বুঝতেই পারিনি। না হলে...

—না হলে টের পেত তোমার গুলির কেরামতি।

—আলবাৎ।

হেসে বললাম—ভজাদা, এই ডাহুকটা তোমাকে থোড়াই কেয়ার করে। তোমার শিকারের দৌড় ও বুঝে গেছে।

—মানে? চোখ পাকিয়ে উঠল ভজাদা, তুই কী বলতে চাস?

—আমি আর কী বলব। ওই দ্যাখো না, তোমার পাশেই হেঁটে

বেড়াচ্ছে ডাহুকটা।

—সত্যিই তো! ডাহুকটার দিকে তাকিয়ে ভজাদা বলে উঠল, এবার তোকে কে বাঁচায় দেখব।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে গুলতি নিয়ে ভজাদা ডাহুকটার দিকে তাক করতেই সে আবার দে ছুট। ভজাদাও মরিয়া হয়ে তার পিছনে ছুটল। দেখতে দেখতে ডাহুকটা উধাও। ভজাদা চিৎপটাং।

ছুটে গিয়ে আমি ভজাদাকে তুলে ধরতেই কাতরে উঠল—উঃ, কোমরে জোর চোট লেগেছে রে! বাপরে, মরে গেলাম রে। কী শয়তান পাখি রে বাবা।

আমার পেটের ভিতর যেন হাসির সোডা-ওয়াটার বোতল খোলা হয়েছে। হাসি সামলানো দায়। তবুও সামলে নিয়ে বললাম—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।

ভজাদা বেজার মুখে কাতর স্বরে বলল—ব্যথায় আমি মরছি আর তুই এই কথা বলছিস! ছিঃ! তুই যে এত স্বার্থপর তা আমি জানতাম না।

—এতে স্বার্থপরতার কী হল? আমি বললাম, এ তো নিজেদের বাঁচার কথাই বললাম। আমরা তো পাখি শিকার করতে এসে অন্যায় করেছি। ধরা পড়লে কী অবস্থা হত বুঝতেই পারছ। পাখি শিকার বে-আইন না?

অত কষ্টের মধ্যেও ভজাদা মুখে একটু হাসি এনে বলল—এতক্ষণে একখানা কথার মতন কথা বলেছিস রে গুলো। একেবারে খাঁটি কথা। না, আর কখনও শিকারে বেরবো না। সত্যিই তো এটা অন্যায়।

হঠাৎ দূর থেকে অনেক মানুষের কথার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল—জঙ্গলে কারা... ধরো ওদের।

—সর্বনাশ করেছে! আমি বললাম, ভজাদা আর কথা নয়। আমাদের ধরতে পারলে সহজে ছাড়বে না। কেটে পড়ো।

আর দেরি না করে দুজনে দে ছুট